স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন

জন উদ্যোগের সমাহার গণ আন্দোলনের কণ্ঠস্বর

ISSN: 13660

পঞ্চদশ বর্ষ ● শারদ সংখ্যা ● আশ্বিন ১৪৩২ ● অক্টোবর ২০২৫

পৃষ্ঠপোষক : জ্ঞানব্রত শীল, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, রূপক ঘোষ, অনিতা মজুমদার, ষড়ানন পাণ্ডা, অরুণ সেন, বিজন ভট্টাচার্য, ফণিগোপাল ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু নাথ, কুমার রাণা, প্রবীর সিংহ রায়, দীপক দাঁ, হীরালাল কোনার, পুণ্যব্রত গুন, প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর পাল, রাহুল মুখোপাধ্যায়, বরুণ সাহা, সন্দীপ ঘোষ, সৈয়দ শাজাহান সিরাজ এবং অলকানন্দা রায়

উপদেষ্টামণ্ডলী : শুভেন্দু দাশগুপ্ত, জয়া মিত্র, তৃপ্তি সান্ত্রা, ভবানীপ্রসাদ সাহু, জাতিশ্বর ভারতী, কৌশিক সেন, সোমনাথ গুহ, সোমা সেনগুপ্ত, অর্ণব সেনগুপ্ত, অমিতাভ চক্রবর্তী, সোমেন চক্রবর্তী, শুভম ভট্টাচার্য, সুদেব সাহা, অমিতাভ সেনগুপ্ত, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, শমিত কর, অমিত পান, ধূর্জটিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী : গুণধর বাগদি, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ চৌধুরি, শুভময় দত্ত এবং অরণি সেন

সম্পাদকীয় সহযোগিতা : অভিজিৎ দাস, অনন্ত কর্মকার, রাজা রাউথ, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, পূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম শর্মা, উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা রায় এবং অরুণাভ বিশ্বাস

ব্যবস্থাপনা : দিলীপ সোম, দিলীপ সেন, অর্ঘ্য মিত্র, সুমন্ত বিশ্বাস এবং তপন দাস

যোগাযোগ : রামজীবন ভৌমিক (কোচবিহার), সুমন গোস্বামী (আলিপুরদুয়ার), গার্গী সিংহ (জলপাইগুড়ি), ধীরাজ লাখোটিয়া (শিলিগুড়ি), রূপক পাল (রায়গঞ্জ), সূরজ দাস (বালুরঘাট), মৃদুল কান্তি সরকার (মালদা), সুমনা সেনগুপ্ত (বহরমপুর), রঞ্জন আচার্য (পুরুলিয়া), সুনীল সোরেন (সিউড়ি), তুষার গলুই (দুর্গাপুর), মৃণাল বাগচী (চাকদা), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (চুঁচুড়া), নীলকণ্ঠ আচার্য (বারাসাত), আনোয়ার হোসেন (দঃ বারাসাত), লক্ষ্মী ভট্টাচার্য (বজবজ), সুশান্ত রায় (হাওড়া)

পরিবেশনা : অয়ন ঘোষ, প্রদীপন গাঙ্গুলী, বনানী ঘোষ, সুজয় পাল, স্বপন সামন্ত এবং স্বরূপ প্রামানিক

প্রচ্ছদ : অর্ক মিত্র; বর্ণসংস্থাপন : রাজু রায়

ই-মেল : ssunnayan@gmail.com ।। ওয়েবসাইট www.ssu2011.com

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিশিষ্ট-বিজ্ঞানী জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকর, রাজাগোপাল চিদাম্বরম; চিকিৎসক দেবেন্দ্র নাথ গুহ মজুমদার; বিজ্ঞান কিউরেটর সরোজ ঘোষ; কবি উইলিয়াম রাদিচে, হেলাল হাফিজ, দাউদ হায়দর, অরুণ চক্রবর্তী; কবি ও সাংবাদিক প্রীতীশ নন্দী; সাহিত্যিক মারিয়ো ভার্গাস য়োসা, এডনা ও'ব্রায়েন, এম. টি. বাসুদেবন নায়ার, গুগি ওয়াংথিয়ং, প্রফুল্ল রায়, ফ্রেডেরিক ফরসাইথ; সাহিত্য গবেষক গোলাম মুরশিদ; চিত্রপরিচালক শ্যাম বেনেগাল, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী; নাট্যকার মনোজ মিত্র, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, রতন থিয়াম; সঙ্গীত শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়, সনজীদা খাতুন; তবলিয়া জাকির হোসেন; সরোদিয়া আশিষ খাঁন; বাচিক শিল্পী ছন্দা সেন; অভিনেতা দেবরাজ রায়; পুতুল নাচ বিশেষজ্ঞ সুরেশ দত্ত; অর্থনীতিবিদ অমিয় কুমার বাগচী, বিবেক দেবরায়, মেঘনাদ দেশাই; সংবিধান বিশেষজ্ঞ এ. জি. নুরানি; নৃত্যশিল্পী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি; রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভি. এস. অচ্যুতানন্দন, সীতারাম ইয়েচুরি, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, আজিজুল হক; মানবাধিকার কর্মী এন. সাইবাবা; মানবাধিকার ও জনস্বাস্থ্য সংগঠক জিমি কার্টার; শিল্পপতি ওসামু সুজুকি, শশী রুইয়া; বক্সার জর্জ ফোরম্যান; ক্রিকেটার অংশুমান গাইকোয়াড, আবিদ আলি, পদ্মকর শিভলকার, মিলিন্দ রেগে, দিলীপ দোশি; দ্রোণাচার্য টেবল টেনিস কোচ জয়ন্ত পুশিলাল; পরিবেশ ও ব্যাঘ্র সংরক্ষক বল্মীক থাপার; উরুগুয়ের বিপ্লবী প্রেসিডেন্ট হোসে মুহিকা; ফুটবলার দিয়োগো জোটা; স্বাস্থ্য-অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ বরুণ কাঞ্জিলাল

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৩
- অপারেশন সিঁদুর: কার লাভ, কার ক্ষতি?

স্মরণিকা, তিলোত্তমা ৫
•জাগরণ/যশোধরা রায়চৌধুরী •ফুলকি ওড়ে, মহামায়া ব্রতকথা/মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া •বিষাদ-প্রতিমা/আর্যতীর্থ •খোঁজ/সুপ্তশ্রী সোম •প্রাচীন বিচারকথা/অরুণাচল দত্ত চৌধুরী

বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি ৭
•হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়•রেভারেন্ড লালবিহারী দে•ভারতপ্রেমী জিম করবেট

প্রধান রচনা ১০
- বাংলাদেশ: ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তন —মদন মোহন পাল
- বাংলাদেশের জুলাই অভ্যুত্থান: ভারতের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তের সঙ্গে পূর্ব সীমান্তেও সঙ্কট—শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়

ব্যক্তিত্ব ১৭
- মনমোহন সিংহ: এক নিরুচ্চার বর্ণাঢ্য কর্মজীবন
- রতন নাভাল টাটা : জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক উড়ান

বিশেষ ক্রোড়পত্র : ২৩
- শতবর্ষে পা-রাখা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি আই) —বরুণ দাস

•আরএসএস: একশো বছরের হিন্দুত্ব ও বিভাজনের রাজনীতির প্রাককথন —সোমনাথ গুহ

জনস্বাস্থ্য ৩৭
- অভয়া আন্দোলন - সাফল্য ও ব্যর্থতা—সুকান্ত চক্রবর্তী
- ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম অথবা আই বি এস—অরিজিৎ সিনহা
- অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স: আগামী দিনের বিপদ ও আমাদের কর্তব্য—আনোয়ার হোসেন
- যক্ষ্মা রোগ ও জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূলকরণ কর্মসূচি—নিতাই প্রামাণিক

প্রকৃতি ও পরিবেশ ৪৮
- চলে গেলেন অরণ্যের জীবন্ত বিশ্বকোষ তুলসী গৌড়া —সোমনাথ মুখোপাধ্যায়
- ভালোপাহাড় ভালো থেকো— অরণি সেন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৫০
- মেঘনাদ সাহা ও তাপীয় আয়নীভবন তত্ত্ব—অমিতাভ চক্রবর্ত্তী
- অর্ধপরিবাহী হাব : একটি আশার আলো—তপন দাস
- ইন্দ্রপতন—সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

অর্ধেক আকাশ ৫৭
- সাংস্কৃতিক সেনাপতি সনজীদা খাতুন ও ছায়ানট—সুমনা সেনগুপ্ত
- ধর্ষণ : মানসিক নয় সামাজিক ব্যাধি—মোহিত রণদীপ

উন্নয়ন প্রসঙ্গে ৫৯
- চা শিল্পে জমি, মজুরি ও মর্যাদার সঙ্কট—অভিজিৎ মজুমদার
- কুম্ভ নিকুম্ভ—বাপ্পাদিত্য রায়
- ওয়াকফ সংশোধনী আইন: বিভাজনই লক্ষ্য—অনুপম কাঞ্জিলাল
- কাশ্মীর: ভূস্বর্গ যখন কাঁটার মুকুট—সরফরাজ বুখারি
- অপারেশন কাগার: দেশের মধ্যে যুদ্ধ—শিমূল সোরেন
- Reminiscences of Kolkata Airport's Hundred Year Journey —Manash Kumar Das

শিক্ষা প্রসঙ্গে ৮১
- বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়লেই শিক্ষার কী উন্নয়ন?—বরুণ দাস
- চূড়ান্ত বেহাল অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা—সনাতন মুর্মু

অন্যভুবন ৮৭
- ইতিহাসের আলোয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়–সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক ৮৯
- ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন: মার্কিন সমাজ—অর্থনীতির প্রতিফলন —গ্যব্রিয়েল লোপেজ

অর্থনীতি ৯৩
- অবাধ বাণিজ্য বনাম ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধ—নির্মলেন্দু নাথ
- অর্থনীতির হালহকিকৎ—সংকলন : বুনো রামনাথ

ক্রীড়াজগৎ ৯৮
- গুকেশ ডোম্মারাজু ও দাবা—নিলয় সামন্ত

শিল্প ও সংস্কৃতি ১০১
- শতবর্ষে তৃপ্তি মিত্র (১৯২৫-১৯৮৯)—দেবাশিষ মুখোপাধ্যায়
- শ্যাম বেনেগাল (১৯৩৪-২০২৪)—প্রবীর সিংহ
- মনোজ মিত্র (১৯৩৮-২০২৪)—অবন শূর
- কমল এক ফেনোমেনন—ধূর্জটিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
- বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার
- সার্ধশতবর্ষের আলোকে আলিপুর চিড়িয়াখানা—সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প ১১৪
- প্রাচিত্তির/মূল হিন্দি রচনা: ভগবতী চরণ বর্মা —বাংলা রূপান্তর: দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

ভ্রমণ ১১৭
- অবহেলায় শশাঙ্কের কর্ণসুবর্ণ—অন্তরা ঘোষ

চিঠিপত্র, রিপোর্ট ১২০
- তিলোত্তমার প্রতি অত্যাচার ও হত্যার বিচার চাই: নাগরিক মঞ্চ
- DOCTORS FOR DEMOCRACY অভয়া আন্দোলন দৃঢ়ীকরণের উদ্দেশ্যে আহূত গণ-কনভেনশন
- A Concept Paper on 'Break The Nexus of Rampant Corruption and Crime.'

সম্পাদকীয়

অপারেশন সিঁন্দুর: কার লাভ, কার ক্ষতি?

২২ এপ্রিল পহেলগাঁও ঘটনার একমাস পূর্তি উপলক্ষে রাজস্থানের বিকানেরে একটি সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন তাঁর 'শিরায় শিরায় গরম সিঁন্দুর' এর উপস্থিতির পাশাপাশি পাকিস্তানের মাটিতে জঙ্গিদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার দাবি করছিলেন তখন সংবাদ আসছিল দক্ষিণ পূর্ব কাশ্মীরের কিশতওয়ারে জঙ্গিদের গুলিতে আবারও একজন সামরিক বাহিনীর জওয়ান মারা গেলেন। সংবাদ মাধ্যমে ত্রাল সহ বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অপারেশনের খবর আসছিল। এর থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে 'সফল' 'অপারেশন সিঁন্দুর' এর আগে ও পরেও জম্মু ও কাশ্মীরে অভ্যন্তরীণ জঙ্গি কার্যকলাপ ছিল ও রয়ে গেছে। পাহেলগাঁও এর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত। অভিযোগ পাকিস্তান থেকে নাকি আততায়ীরা এসেছিল। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা রয়েছে। এছাড়াও আর্মি, রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সি.এ.পি.এফ.স, জম্মু - কাশ্মীর পুলিশ এবং তাদের বিভিন্ন গোয়েন্দা দফতর এবং কমান্ডো বাহিনী, যাদের সংখ্যা বিপুল, কেন্দ্রের এই পাঁচ স্তর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্বেও পাকিস্তানী জঙ্গিরা কিভাবে পাকিস্তান সীমান্ত থেকে ১৫০ - ২০০ কিমি ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে, দিনের পর দিন রেকি করে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নির্বিঘ্নে এরকম হত্যাকাণ্ড করে, হওয়ায় মিলিয়ে গেল আমাদের এখন অবধি অজানা। যেমন জানা নেই 'অপারেশন সিঁন্দুরে' ঠিক কি ঘটেছিল কিংবা ব্ল্যাক বক্স ও ককপিট ভয়েস রেকর্ডার পাওয়া সত্ত্বেও ১২ জুন আমদাবাদ এয়ারপোর্ট থেকে টেক অফ করার সঙ্গে সঙ্গেই লণ্ডনগামী এয়ার ইণ্ডিয়ার ফ্লাইট ১৭১ বোয়িং নির্মিত ড্রিমলাইনার প্লেনটি ভেঙ্গে পড়ল কেন। পাহেলগাঁও গণহত্যার ক্ষেত্রে যেমন পাঁচস্তর নিরাপত্তা ব্যবস্থা, স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও কেন্দ্র সরকারের ব্যর্থতাকে আড়াল করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে দোষারোপ করা হয়েছে; সেরকমই বহুজাতিক বোয়িং নির্মাতা সংস্থা, বৃহৎ পুঁজির টাটার এয়ারইণ্ডিয়া বিমান সংস্থা, কেন্দ্র সরকারের অসামরিক বিমান পরিবহন দপ্তর এবং গুজরাট সরকারের অপরিকল্পিত নগরায়নের ব্যর্থতাকে আড়াল করে বিমান দুর্ঘটনার জন্য পাইলটদের উপর দোষারোপের চেষ্টা চলছে।

বর্তমান কেন্দ্র শাসিত কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী পর্যটকদের কাছে ক্ষমা চাইলেও এত বড় ব্যর্থতার পরেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোন ত্রুটি স্বীকার করলেন না। কিন্তু ঘৃণ্য পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের জেরে বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের ধাত্রীভূমি সৌদি আরব সফররত প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরে কাশ্মীরে না গিয়ে বিহারের নির্বাচনী সভা সহ বিভিন্ন স্থানে এবং তাঁর সভাসদরা ১৫ দিন ধরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নানারকম হম্বিতম্বি করার পর এবং সংবাদ মাধ্যমে জল, স্থল ও আকাশে বিস্তারিত যুদ্ধ প্রস্তুতি ও মহড়ার ছবি প্রচারের পর ভারত ৭ মের মধ্যরাতে পাকিস্তানের ভূমিতে 'অপারেশন সিঁন্দুর' সংঘটিত করল।

ফরাসি ও ইজরায়েলি মিসাইল ও ড্রোনের আঘাতে নয়টি জঙ্গিদের ডেরা ক্ষতিগ্রস্ত হল। কিন্তু বেশিরভাগ জঙ্গি ও নেতারা আগেই খবর পেয়ে ডেরা ছেড়ে চলে যাওয়ায় অল্প ক্ষয়ক্ষতি হল। পাকিস্তান প্রস্তুত ছিল। চিনা ফাইটার জেট ও মিসাইল দিয়ে ভারতীয় বায়ুসেনাকে কাশ্মীরের আকাশে প্রত্যাঘাত করল। তারা দাবি করল তিনটি রাফেল এবং একটি করে সুখোই, মিগ ও হেরন - ছটি ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইজরায়েলে প্রস্তুত ব্যয়বহুল যুদ্ধ বিমান ধ্বংস করে দিয়েছে। পরে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত সাংগ্রিলা বৈঠকের সময় এক বিদেশি সাংবাদিককে দেওয়া ভারতের সেনা প্রধানের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় ভারতের অন্তত একটি ফাইটার জেট ধ্বংস হয়েছিল। আবার ইন্দোনেশিয়ায় ভারতের সামরিক অট্যাশের বক্তব্যে জানা যায় যে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে ভারতের একাধিক ফাইটার জেট ধ্বংস হয়। একটি রাফেল যুদ্ধ বিমানের দাম কম বেশি ২,৪০০ কোটি টাকা। ৮ মে রাতে পাকিস্তান জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও গুজরাট এই পাঁচ রাজ্যের ১৫ টি ক্যান্টনমেন্ট শহরে মিসাইল ও ড্রোন আক্রমণ চালাল। এরপর ৮ মে সকালে ভারত পাকিস্তানের ১৫ টি ক্যান্টনমেন্ট শহরে মিসাইল ও ড্রোন আক্রমণ চালাল। ৯ মে রাত থেকে পাকিস্তান কাশ্মীরের কুপওয়ারা থেকে গুজরাতের ভুজ অবধি অসংখ্য চিনা ও তুর্কি ড্রোন ছুঁড়ে, তারসঙ্গে দূরপাল্লার কামানের গোলাবর্ষণ চালিয়ে ভারতের সীমান্ত গ্রাম ও শহরগুলির যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ঘটাল। এরপর ভারত ব্রহ্মস মিসাইল দিয়ে পাকিস্তানের ১১ টি বিমান ঘাঁটির রানওয়েতে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করল। পাকিস্তান ঘোষণা করল 'অপারেশন বুনিয়ান আল - মাসুস'। মিসাইল, ড্রোন ও দূরপাল্লার কামানের গোলা বর্ষণ বাড়িয়ে দিল। স্থল বাহিনী সীমান্তের কাছাকাছি চলে গেল। ১০ তারিখ হঠাৎ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করলেন। তারপর দুই সেনার ডি.জি.এম.ও. - র মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে পারমাণবিক শক্তিধর দুপক্ষই ১০ মে বিকেল থেকে সংঘর্ষ বিরতিতে চলে গেল।

আগের পাঁচটি ভারত-পাক যুদ্ধের বিপরীতে এই চারদিনের যুদ্ধে ভারত প্রথম আক্রমণকারী ছিল, দুপক্ষই নিজেদের সীমান্তের মধ্যে থেকে অপরপক্ষকে আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র ও গোলা ছুঁড়ে আক্রমণ করে গেছে এবং দুপক্ষই নিজেদের বিজয়ী ঘোষণা করেছে। আগের প্রতিটি যুদ্ধে পাকিস্তান প্রথমে আক্রমণ করেছে, তারপর ভারতীয় সেনা তাদের প্রতিরোধ করে তাদের জমির অনেক ভিতরে ঢুকে গিয়ে তাদের পর্যুদস্ত ও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছে এবং ফিরে এসেছে। আগের প্রতিটি যুদ্ধে পাকিস্তান আধুনিক মার্কিন অস্ত্রে

এবং ভারত তুলনামূলক কম দামী কিন্তু পরীক্ষিত রুশ অস্ত্রে যুদ্ধ করেছে। এইবার ভারত মূলত পশ্চিমা আধুনিক অস্ত্রে এবং পাকিস্তান অপেক্ষাকৃত কম দামী চিনা অস্ত্রে যুদ্ধ করেছে। বিপক্ষের সীমানায় ঢুকে বায়ুসেনা বোমা বর্ষণ এবং ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে স্থল বাহিনী বিপক্ষের জমিতে ঢুকে পড়ার বদলে এবার মানববিহীন যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে দুপক্ষ নিজেদের সীমানার মধ্যে থেকে যুদ্ধ করেছে।

যুদ্ধের পর দুই প্রতিবেশী দেশের সাংসদ ও আমলারা অপর দেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে বিদেশ সফরে বেরলেন। সেখানে পাঠাবেন না বলেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাংসদ ভ্রাতুষ্পুত্রকে পাঠালেন। দেখা গেল সক্রিয় দৌত্যের পরেও শিষ্টাচার বজায় রেখে আন্তর্জাতিক মহল ভারতকেই আক্রমণকারী দেশ হিসাবে দেখছে। সিন্ধুর জল বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টিও সমালোচিত হচ্ছে, যদিও ছয় উপনদী সহ সিন্ধুর সম্পূর্ণ জল আটকানোর পরিকাঠামো ভারতের আদৌ নেই। চিন, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মায়ানমার, মালদ্বীপ প্রতিবেশী বলয়ে ভারত যখন চিনের কাছে প্রায় এক ঘরে, কানাডার মত সহযোগী দেশের সঙ্গে যখন সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছেছে, সেই সময় তুরস্কর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের সঙ্গে ভারত সম্পর্ক ছেদ করল। বিপদের বন্ধু রাশিয়া যখন মহা বিপদে তখন মহা শক্তিধর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটল। চিনের সঙ্গে পাকিস্তানের অভিন্ন হৃদয় বন্ধুত্ব ছিলই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল, সেটির মেরামতি হল। অর্থকষ্টে ধুঁকতে থাকা পাকিস্তান আই.এম.এফ. এর বিপুল ঋণ পেয়ে গেল। রাষ্ট্রপুঞ্জের সন্ত্রাস দমন কমিটিতে পাকিস্তান ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা দিবসে পাকিস্তানের আসিম মুনির আমন্ত্রণ পেলেন। ট্রাম্পের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করলেন। ট্রাম্প পরিবার তাদের ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসায়ে পাকিস্তানকে যুক্ত করল। পাকিস্তানের নুর খান বায়ু সেনা ঘাঁটিতে আগামীদিনে মার্কিন সেনা ও যুদ্ধ বিমান রাখার ব্যবস্থা হল। যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার পর ট্রাম্প সাহেব এবার এতদিনকার দ্বিপাক্ষিক বিষয় কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে মধ্যস্থতার বার্তা দিলেন। বহু বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও অধিকৃত কাশ্মীরের এক ইঞ্চি জমিও পুনরুদ্ধার হল না। 'সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনে'র বৈঠকে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী একা হয়ে পড়লেন। 'ব্রিকস' বৈঠকে গিয়েও মোদী সুবিধা করতে পারলেন না।

পাকিস্তানে অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে দীর্ণ শাহাবাজ শরিফ সরকার দেশের সব সমস্যা আপাতত চাপা দিতে পারলেন সিন্ধুর জল আর সিঁদুরের আক্রমণ দেখিয়ে। মাঝে কিছুদিন অপরিপক্ক গণতান্ত্রিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আবার পাকিস্তানের চালকের আসনে নিরঙ্কুশ মার্কিন, মিলিটারি ও মোল্লারা। পাকিস্তানের ক্ষমতার মূল কেন্দ্র হয়ে উঠলেন পাকিস্তানের স্রষ্টা ও প্রাক্তন গভর্নর জেনারেল মহম্মদ আলি জিন্না এবং কট্টরপন্থী প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়া উল হকের অন্ধ ভক্ত প্রবল ভারত ও হিন্দু বিদ্বেষী ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। ভারতের ক্ষেত্রেও টানা তৃতীয় বারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত নির্বাচনে আশানুরূপ সাফল্য না পাওয়ায় কিছুটা ম্রিয়মাণ ছিলেন। নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমে বহুল প্রচারের ফলে অপারেশন সিঁদুরের শৌর্য বীর্যের দ্যুতি তাঁকে আবার স্বমহিমায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছে যে সারা দেশ জুড়ে এখন অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য ছাড়া আর কোন কথা নেই। তালে তাল মেলাতে না পারলে দেশদ্রোহী দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দ্রব্য মূল্যের আকাশ ছোঁয়া দাম, মণিপুরের গৃহযুদ্ধ, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিধন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আভিবাসী ভারতীয়দের বিতাড়ন, মহিলাদের উপর ক্রমবর্দ্ধমান আক্রমণ, ওয়াকফ বিতর্ক, চিনের সঙ্গে বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি, চিনের কাছে লাদাখের গালওয়ানে জমি হারানো, মার্কিনের শুল্ক চাপ, তিলোত্তমাদের বিচার না পাওয়া, যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি হারানো, ধুলিয়ান - সামসেরগঞ্জের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভাঙ্গড় ও মহেশতলার দাঙ্গা, বিভিন্ন রাজ্যে বন্যা সব ধামা চাপা পড়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী যে নিউ নর্মালের ফরমান জারি করেছেন তাতে উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবমানসে পাকিস্তানের যেন কোন রেহাই নেই। সব ভুলে ভারতীয়দের এক বৃহৎ অংশ কৃত্রিম জয়ের আনন্দে মশগুল। এর উপর গদি মিডিয়ার আখ্যানে পাকিস্তান ভেঙ্গে বালুচিস্তান ও খাইবার পাখতুনওয়ালা নাকি স্বাধীন হয়েই গেছে এবং আজাদ কাশ্মীর ভারতের মধ্যে প্রায় এসেই পড়েছে। আবার পাকিস্তানেও সামরিক জয় উদযাপন চলেছে। আগে এরকমটি কখনও দেখা যায়নি। যেন আই.পি.এল. এর ফিক্সড ম্যাচ। অতীতের পাঁচ বারের যুদ্ধে কিন্তু পরিষ্কার ভারতের জয় নির্ধারিত হয়েছিল। ১৯৭১ এ এর সঙ্গে ভারত পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করেছিল, পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। পরে ভারত সিয়াচেন হিমবাহের দখল নিতে পারে।

২০১৬ এর উরি সার্জিকাল স্ট্রাইক এবং ২০১৯ এর বালাকোট বোমাবর্ষণে পাকিস্তানের কোন ক্ষতি বা ভারতের কোন লাভ হয়েছিল কিনা সঠিক জানা যায় না, তবে শাসকদল যে নির্বাচনে খুবই লাভবান হয়েছিল সেটি ঘটনা। অপারেশন সিঁদুরের উদ্দেশ্য ও পরিণতি কি সেটাই? যদিও প্রধানমন্ত্রীর ভাষ্যে 'অপারেশন সিঁদুর' এখনও শেষ হয়নি। 'এস.আই.আর.' ইত্যাদির ত্রুটি ঢাকতে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'অপারেশন মহাদেব' ইত্যাদির প্রচার।

০১.০৮.২০২৫

জন্ম শতবর্ষে বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি

সলিল চৌধুরী, ইলা মিত্র, অম্লান দত্ত, হাবিব তনবীর, ঋত্বিক ঘটক, বাদল সরকার, তৃপ্তি মিত্র, তাপস সেন, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী, হিমানীশ গোস্বামী, জ্যোতিভূষণ চাকী।

জাগরণ

যশোধরা রায়চৌধুরী

মা এসেছেন, শিল্পী সনাতন দিন্দা

আকাশ জোড়া থমথমে মেঘ। কোথাও বাজছে রণডঙ্কা
বজ্র এবং বিদ্যুৎ দেয় ভুলিয়ে সব দ্বিধা-শঙ্কা

এমন সময়, তুমুল সময়। তবুও প্রেমে ভাসতে পারি।
কারণ এখন জাগার সময়। ঘুমিয়ে কি আর থাকতে পারি?
তোমার জন্য পাতলাম পথ সবুজ ঘাসের, আদরণীয়!
হে বিপ্লব, আমার হাতের অজস্র ফুল অর্ঘ্য নিও!

ফুল দিয়ে সব বন্দুকেদের একটু একটু নিভিয়ে দেব
শুশ্রুষাহীন যা কিছু স্বর, আত্মগর্বী দম্ভপ্রিয়
সমস্ত সেই কঠোর পরুষ ক্ষমতাময় অধীশ্বরের
বিচার হবে, আমরা সবাই এখন তাদের হিসেব নেব
নেব, কিন্তু হিংস্রতা নয়, নিরাপত্তার বিপুল দাবি
দিনের এবং রাতের দখল, মেয়েরা আর মানুষ পাবেই।

ফুলকি ওড়ে

মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়ার দুটি কবিতা

তোমরা যারা রোদের চাতাল ঘিরে
বুক পেতেছো তীব্র খরসানে
সত্যি যা তা জানবে বলে সবাই
ঝড়ের হাঁকে ডাক দিলে আশ্বিনে

পাহাড় দিয়ে দৌড়ে এল মেঘ
মেঘের থেকে লাফিয়ে নামে ঘোড়া
আগুন ঘোড়ার সওয়ার হলে যেই
হাওয়ার কেশর ঝাঁকাচ্ছে ডালপালা

এগোও যত সঙ্গে হাঁটে দিন
তোমরা জাগো রাত্রি জাগে তাই
নিদ নিদালির ঘোর ভেঙে আজকে
চলছে মানুষ অনেক তারার নীচে

তারার ভিড়ে সেই দুটি চোখ দূরে
রক্ত ফোঁটা গড়িয়ে আসা নয়ন
হাঁটবে বলে আগুন থেকে উঠে
ঢেউ এনেছে উদ্যত মিছিলে

ভাঙা হাতের শক্ত দৃঢ় মুঠি
বাজ বিজুরি চমকে ওঠে মেঘে
ফুলকি ওড়ে তোদের প্রতিরোধে
রাত্রি জুড়ে ঝর্না আসে ধেয়ে
চোখের আলোয় পথ দেখালো মেয়ে
সবার বুকে পথ কেটেছে মেয়ে...

মহামায়া ব্রতকথা

''ব্রত ভাসাও জলে কন্যা ব্রত ভাসাও জলে
তোমার মুখ আগুন কন্যা পাড়ার লোকে বলে...''
ব্রত থেকে উঠে এল মেয়েদের গান
সুর পোড়া আগুনে আগুনে
নদীমাতৃক দেশ ভেসে গেল অসংখ্য নুনে
গানের লবণ জানে কান্নায় নয়
রক্ত ঝরেছে তার চোখদুটি থেকে
আগমনী শব দেহ উল্লাসে ঢেকে
শুরু হলো উৎসব পশু কলোনিতে
রাতজাগা মেয়ে তারও আগে
জলস্রোতে ভাসালো জবান
শরতের মহাযানে মাথা নাড়ে কাশ
যেন সেই ঢেউয়ের শ্লোগান
ক্ষত থেকে শিউলি ফুটেছে যত ছায়াপথ জুড়ে
ঘাসের উঠোনে সেই তারা ফুল ঝরে
দেখে প্রলয় পয়োধি ফুঁড়ে
অন্ধকার গ্রহের সিথানে পিদিম জ্বেলেছে মেয়ে
ভাঙা হাত উঁচু করে আশ্বিন যেই
মূহুর্মূহু ডেকে ওঠে মহামায়া মেঘ
আলপনা গুয়াপান ব্রত থেকে উঠে হতমান
পৃথিবীর মেয়েরা বাড়িয়েছে জ্বলন্ত আঙুল
পয়ারে পয়ারে ম ম করে সেই পোড়া ঘ্রাণ
অলক্ষ্মী পাঁচালী তাদের
দ্রোহকালে হয়ে ওঠে আগুনসমান

বিষাদ-প্রতিমা

আর্যতীর্থ

শোকের আবহ নেই,
উৎসব ও ক্লাবে পাবে ভিড়,
রাজনীতি ধর্মের চেনা ঘৃণা বর্ষণে ফোন পরিপূর্ণ,
মেলা ও বিয়েবাড়িগুলোতে ঝলমলে সাজ পরা মানুষের সেল্ফির ঢল,
কপি পেস্ট আগেকার মতো সবকিছু অবিকল,
তবু,
বাতাসে ফুসফুস-খেকো ধুলোর দূষণের মতো
বিজ্ঞাপনের আড়ালে ঢাকা নদীর ফিকাল ব্যাকটেরিয়ার
ঘনত্বের মতো,
নগরোন্নয়নের ঢঙ্কানিনাদে নিঃসাড়ে খুন হওয়া গাছ পুকুরের মতো,
বিষাদটা মন ঘেঁষে পাশে বসে আছে।

মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর নারীদিবসের শুভেচ্ছা বার্তা,
বিরোধী নেত্রী-নেতার নারীদিবসের শুভেচ্ছা বার্তা
দেশের তাবত নেতা, ব্যবসায়ী,
খেলোয়াড়, অভিনেতা ও খ্যাতনামা ইউটিউবারদের শুভেচ্ছাবার্তারা
নারীদিবসে নারীকে প্রায় ঈশ্বরী বানাবে,
অতীতের খামতি আর বর্তমানের কমতি ভুলিয়ে
সোনার আগামীর প্রতিশ্রুতি দেবে,
অনেক খুঁজলেও সেইসব খুড়োর কলে তিনটে জিনিস পাবে না,
সেই কল্পিত 'এল ডোরাডো' যাওয়ার ম্যাপ,
নারীর 'স্বাধীনতা' কথার 'স্ব'তে নারীর অধিকার,
আর, আর… সেই বিষাদের উল্লেখ।

কিন্তু যে কিশোরী বহু চেষ্টাতেও রোজের ভিড়ে নোংরা ছোঁয়া থেকে
নিজেকে বাঁচাতে পারে না,
যে বালিকা 'কাকু' কোলে নিলে ভালো লাগে না বলে
মা'য়ের চাপা ধমক খায়
থিসিস শেষ করার আবশ্যক শর্ত হিসেবে যে মেধাবী মেয়েটি দুদিন
ডায়মন্ড হারবারের প্রস্তাব পেয়েছে,
বাড়ির এক মাত্র রোজগেরে যে গৃহবধূ বড়বাবুর অনধিকার স্পর্শ
বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে,
ধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে পুলিশের কাছে গিয়ে যে তরুণী ধমক খেয়ে
ফিরে এলো পুনরায় ধর্ষিত হতে…

আটই মার্চ তাদের প্রতিটি দীর্ঘশ্বাসে সেই বিষাদ অমাবস্যায়
অন্ধকারের মতো থিতু ও ধ্রুবক।

যে দেশে বিচারসভায় শিশুধর্ষকরা প্যারোল পেয়ে পুনরায় শিশুধর্ষণ
করতে পারে,
যে দেশে বিচারসভায় কর্মরত ডাক্তারের বিশ্বে প্রথমবার ধর্ষণ করে
খুন বিরলতম অপরাধ গণ্য হয় না,
যে দেশের বিচারসভা প্রাচীন বৈষম্যমূলক সামাজিক বিধান লেখা
'মনুস্মৃতি'কে ধর্মগ্রন্থ বিবেচনা করে,
যে দেশের বিচারসভা 'পায়ুধর্ষণে' মৃত স্ত্রীর খুনিকে মাফ করে দেন
স্রেফ 'বিয়ে' হয়েছিলো বলে…

সেই দেশে শুভেচ্ছাবার্তা পেরিয়ে, ঘরে ঘরে বাড়ে ও বাড়বে সেই
বিষাদের ছায়া,
ভালো করে দেখো চারিদিকে,
ক্রমশ সে গণ-বিষণ্ণতা পায় এক মুখহীন প্রতিমার কায়া।

আমি এই বিষাদকে ডাকি 'অভয়া'।

খোঁজ

সুপ্তশ্রী সোম

কবিতা খুঁজতে খুঁজতে আনমনে এসে দাঁড়ালো অস্থির সময়
দ্যাখে ফালাফালা হয়ে কাটা যন্ত্রণার দিন
বসে আছে ধর্মতলার অনশন মঞ্চে
অভুক্ত শরীরের তেজে সূর্য হার মানে

নিয়মের উল্টোদিকে কয়েনের ঝনঝন শব্দ
ঘোরের মধ্যে বাঁচতে বাঁচতে
মিছিল আর প্রতিবাদে মিশে যাই ভিড়ে
পা মেলাই রাস্তাদের নতুন উপকথায়

হাতের মুঠোয় মেলে ধরা মেয়েটির
রক্তমাখা লাল রুমালের ছায়া
উল্টোনো শরীরের নিচে ঘুমিয়ে থাকা
প্রমাণচিহ্নের নিরুদ্দেশে যাওয়া ঠিকানা

পুজোর আগেই স্বপ্ন গুলো অঞ্জলি দিয়ে
মেয়েটা উড়ে গেল ফিনিক্স পাখি হয়ে
মুঠো হাতে, মানব বন্ধনে
তাকেই খুঁজে চলেছে সমস্ত শহর

প্রাচীন বিচারকথা

অরুণাচল দত্ত চৌধুরী

এ গল্পটা বড়ই প্রাচীন, ঘটেছে সব কালে
কার কী তাতে? মা আর বাবার, অশ্রু শুকোয় গালে।

সবার মুখে কুলুপ…
অনেক কজন না জানলেও, অল্প কেউ তো জানে
কেউটে কখন ছোবল দিল, কন্যাকে কোনখানে।
সবার ঠোঁটে কুলুপ আঁটা, কেউ কাড়ে না রা।
রাষ্ট্র ধৃতরাষ্ট্র। প্রমাণ খুঁজেই পাচ্ছে না।

খুব তৈরি হিসেব…
কেন্দ্র রাজ্য এক সংসার … এক শয্যায় শয়ান।
খুনের গল্প খুব গোপনে পালটে নিচ্ছে বয়ান।
কী ঘটেছে ঠিক কতটা, বদলানো পাস-টেন্সে,
বিচার হবেই বানিয়ে লেখা নকল এভিডেন্সে।

এবং ক্যালেন্ডারে…
মোছার পরেও প্রচুর প্রমাণ যটুকু অভ্রান্ত
আসবে না কেউ সাক্ষী দিতে, যারা সে সব জানত।
লাভ খুঁজে পায় সন্ধানীরা, ভয় পেয়ে যায় কতক।
ডেটের পরে ডেট। চলে যায় দশক এবং শতক।

তখন ভবিষ্যতে…
হয়তো বেড়ে দেবেন কোনও প্রাজ্ঞ বিচারকর্তা
আইন-যজ্ঞের পান্তা ভাতে দগ্ধ বেগুনভর্তা।
একজিবিটে প্রমাণ হবে, হয়নি কোনওই খুন তো।
একশ উকিল শুধু শুধুই ফিজ্‌এর টাকা গুনতো।

এদের পুলিশ প্রমাণ মোছে ওদের পুলিশ সামলায়
বিচার লুকোয় আইন-আদালত-সুয়োমোটোয় মামলায়।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(১৮২৪—১৮৬১)

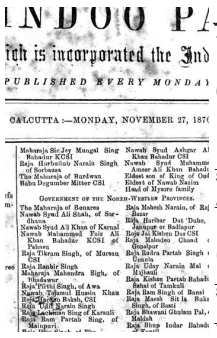

হিন্দু প্যাট্রিয়ট

বাংলা ও ভারতের বরেণ্য সন্তান হরিশচন্দ্রের জন্ম পূর্ব বর্ধমানের শ্রীধরপুরে। পিতা রামধন মুখোপাধ্যায়, মাতা রুক্মিনী দেবী। ভবানীপুরে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হরিশ মুখুজ্যে ইউনিয়ন স্কুলে ভর্তি হলেও অর্থাভাবে লেখাপড়া করার তেমন সুযোগ পাননি। তথাপি একটি প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মিলিটারি অডিটর জেনারেলের অফিসে কেরাণির পদ পান। সময়টা ছিল ১৮৪৮ সাল। তার আগে খসড়াকার, পত্র লেখক ও অনুবাদকের কাজ করে পরিবার প্রতিপালন করতেন। আর তার ঠিক চার বছর পরেই ১৮৫২র এ তাঁর ক্ষুরধার বিশ্লেষণী মেধার কারণে সহকারী মিলিটারি অডিটর পদে উন্নীত হন। ইতিমধ্যে তিনি ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য হন। ১৮৫৩তে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পুনঃসনদ প্রাপ্তির সময় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে যে আবেদনপত্রটি লেখা হয় সেই লেখাটির দায়িত্ব ভার তাঁকেই দেওয়া হয়। ওই সময়েই 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। পরে সম্পাদক হন। ইতিমধ্যে তিনি প্রবল অধ্যাবসায়ে ইতিহাস, রাজনীতি, আইন ও ইংরাজি সাহিত্যে এতটাই ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে সে সময় 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার', 'দ্য বেঙ্গল রের্কডার', 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় তাঁর ক্ষুরধার কলমে ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেশে তো বটেই এমন কি সাগর পারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সমালোচনার ঝড় তোলে। ১৮৫৩এ ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে'র লেখক থেকে ১৮৫৬তে সম্পাদক পদে উত্তীর্ণ হন এবং তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় অচিরেই এটি জাতীয় পত্রিকার মর্যাদা পায়। সেই সময়ে দেশে নীলচাষীদের বিরুদ্ধে নীলকর সাহেবদের ভয়ঙ্কর শোষণ তাকে এতটাই আন্দোলিত করে যে তিনি নির্ভীকভাবে সেইসব লিপিবদ্ধ করে একদিকে যেমন চরম অত্যাচারিত নীল চাষীদের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন অন্যদিকে নিজ ব্যয়ে রায়তদের পক্ষে ও নীলকরদের বিরুদ্ধে আদালতে মকোদ্দমা করেন। শোনা যায় যে সেসময় সাহেবদের ব্যঙ্গ করার জন্য তিনি বরের বেশে জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে আদালতে যেতেন রায়তদের হয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। প্রধানত তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৫৯-এ চব্বিশ পরগনার জেলাশাসক বলপূর্বক নীলচাষের বিরুদ্ধে আদেশ দেন এবং ১৮৬০-এ ইণ্ডিগো কমিশন গঠিত হয়। তিনি লর্ড ডালহৌসির রাজ্য দখলেরও বিরোধিতা করেন।

এসবের পাশাপাশি সমাজসংস্কারেও তিনি ছিলেন এক প্রধান মুখ। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বিধবা বিবাহের সমর্থনে তিনি অর্থব্যয় করতে দ্বিধা করতেন না। কিন্তু তিনি আয় যেমন ব্যয় করতেন তার থেকে কয়েক গুণ বেশি। ফলে প্রচুর ধার দেনায় জড়িয়ে যান। এছাড়াও পত্রিকার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করতেন। এসবের কারণে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়। নীলকররা তাঁকে বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পারিবারিক সম্পত্তি ক্রোক করে নেয়। তাঁর মৃত্যুতে গরিব চাষিরা দিশেহারা হয়ে পড়েন। তাঁদের হয়ে মামলা লড়ার আর কেউ ছিল না। নীলকর সাহেবরা প্রায় প্রতিটি মামলায় ডিক্রি পেয়ে যেতে থাকে। তাঁর মৃত্যুতে ভেঙ্গে পড়েন স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাই। তিনি তাঁর বিধবা স্ত্রী ও আশ্রিতা বিধবা ভগিনীর জন্য মাসোহারার ব্যবস্থা করেন। তাঁর অনুরোধে কালিপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' প্রেসটি কিনে তাঁর পরিবারকে দেনা মুক্ত করেন। এমন একজন বাঙালি অগ্নিপুরুষের দ্বিশতবর্ষের জন্মজয়ন্তীতে জানাই প্রণাম।

রেভারেন্ড লালবিহারী দে

(১৮২৪—১৮৯৪)

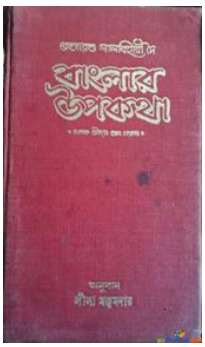

বাংলার উপকথা

প্রচলিত লোকগল্পের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন একটি ছড়া আমাদের ছেলেবেলার দিনগুলোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। ছড়াটির প্রথম কয়েকটি লাইন ছিল এরকম—আমার কথাটি ফুরাল নটে গাছটি মুড়াল। ''কেন রে নটে মুড়ালি?'' ''গরু-তে কেন খায়?'' ''কেন রে গরু খাস্?'' ''রাখাল কেন চরায় না?''... এইভাবে প্রশ্নে প্রতিপ্রশ্নে ছড়াটি দীর্ঘায়িত হয় শেষপর্যন্ত পিঁপড়ের বেশ করেছি গোছের মনোভাবে ছড়াটি শেষ হয় ও গল্পেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। এমনটা সেই দুশো বছর আগের ছেলেবেলাতেও ঘটতো। ঘটেছিল ছোট্ট লালবিহারীর গল্প শোনাতেও। বড় হয়ে তিনি খোঁজ পেতে চাইলেন এই ছড়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সামাজিক প্রকৃত চিত্রকে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করতে চাইলেন বাংলার একেবারে নিজস্ব লোককথাকে। সংগ্রহীত সম্পদে তিনি আবিষ্কার করলেন সেই সময়ের বাংলার চলমান জীবনকে। এইসব উপকথার বেশির ভাগটাই পল্লবিত হয়েছে বাংলার মা, পিসিমা, ঠাকুমা-দিদিমাদের মতো মহিলার মুখে মুখে। এই অমূল্য কথাসাহিত্য সম্পদকে তিনি ইংরাজিতে রূপান্তর করে প্রকাশ করলেন 'ফোক টেলস অব বেঙ্গল' নামে একটি বই। পশ্চিমি দুনিয়ায় হৈ-হৈ পড়ে গেল বাংলার এই বইটি নিয়ে।

তবে এতো অনেক পরের কথা। তাঁর পিতা বর্ধমানের সোনাপলাশীর বাসিন্দা রাধাকান্ত দে অত্যন্ত গোঁড়া বৈষ্ণব হয়েও পুত্রের প্রতিভা, বাস্তব বুদ্ধি ও পরিশ্রম দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নয় বছর

লাল বিহারী দে

বয়েসেই শিক্ষার জন্য কলিকাতায় নিয়ে এসে জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইনস্টিটিউশনে ভর্তি করিয়ে দেন। এরপর তিনি হিন্দু কলেজ, হেয়ার স্কুল, ডাফ স্কুল ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পড়াশুনা করেন। ১৮৪৩-এ লালবিহারী খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৫১ সালে খ্রিষ্টধর্মের প্রচারক হয়ে সারা ভারত ভ্রমণ করেন। ১৮৬০-এ সুরাটে তিনি একজন পার্সি খৃষ্টান কন্যাকে বিবাহ করে ফিরে আসেন কলিকাতায়। কিন্তু ধর্মপ্রচারের চাইতে শিক্ষা প্রচারের প্রতি তাঁর মনোযোগ ছিল বেশি। কৃষকদের দুর্দশায় তিনি সমব্যথী ছিলেন। তদানীন্তন বাংলার গ্রাম জীবনের জীবন্ত দলিল তাঁর সাড়া জাগানো উপন্যাস 'গোবিন্দ সামন্ত, অর দ্য হিস্ট্রি অব আ বেঙ্গল রায়ত'। ১৮৭৯ থেকে ১৯২৮ অবধি ১৮ বার মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর 'ভিলেজ পাঠশালা' লেখাটিও বহু পঠিত। বহরমপুর কলোজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষর দায়িত্ব এবং হুগলি কলেজে অধ্যপনার পাশাপাশি বিভিন্ন সংবাদ পত্রে সাংবাদিকতা ও সম্পাদনায় নিয়োজিত হন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ইণ্ডিয়ান রিফর্মার', 'ফ্রাইডে রিভিউ', 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন', 'অরুণোদয়' প্রভৃতি। ব্রিটিশ সরকার জমির ওপর অতিরিক্ত ট্যাক্স চাপিয়ে জনশিক্ষার খরচ তুলতে চাইলে তিনি তার তীব্র বিরোধিতা করেন। হিন্দু জাতিভেদ প্রথা তো বটেই, ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে বৈষম্য নীতিরও তীব্র বিরোধী ছিলেন তিনি। ১৮৭৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও বেথুন সোসাইটির অন্যতম সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। এই পর্বে তাঁর Primary Education of Bengal; Vernacular Education in Bengal; English Education in Bengal; Compulsory Education in Bengal ও Teaching of English Education in the College of Bengal প্রবন্ধগুলি সেই সময়ে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। আজ এই প্রজ্ঞাবান বিশিষ্ট মানুষের দ্বিশততম জন্মবর্ষে রইল আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

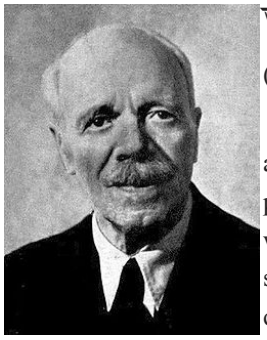

জিম করবেট

ভারতপ্রেমী জিম করবেট

(১৮৭৫-১৯৫৫)

'…The room was in darkness and the owner of it had just passed the hookah to his friend when it fell to the ground, scattering a shower of burning charcoal and tobacco. Telling his friend to be more careful or he would set the blanket on which they were sitting on fire, the man bent forward to gather up the embers and, as he did so, the door came into view. A young moon was near setting and, silhouetted against it, the man saw a leopard carrying his friend through the door….''—The 'Man-eating Leopard of Rudraprayag''। যাঁর কলমের ছত্রে ছত্রে উঠে আসে এমন রোমাঞ্চকর অরণ্যকথা তিনি হলেন বিশ্ব বিখ্যাত শিকারি এবং তার চাইতেও বেশি ভারতপ্রেমী প্রকৃতিপূজারি জিম করবেট। শিকার তিনি করতেন বটে তবে তা কেবল দায়ে পড়ে। বাঘ যখন অন্য শিকার ছেড়ে মানুষকেই তার স্বাভাবিক খাদ্য করে বা তাদের প্রতিপালিত গবাদি পশু যথেচ্ছ মেরে গরিব মানুষদের প্রভূত ক্ষতি করতো কেবল তখনই।

বাবা ক্রিস্টোফার উইলিয়াম ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে নৈনিতালে পোস্টমাস্টার রূপে নিযুক্ত হন। সেখানে তার অষ্টম সন্তানরূপে জিমের জন্ম। তার পুরো নাম এডওয়ার্ড জেমস্ করবেট। পরবর্তীকালে ভারতকে বিশেষত কুমায়ুন ও গাড়োয়াল হিমালয় সংলগ্ন ভারতকে ভালবেসে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সেখানকার ভূমিজ, প্রান্তিক মানুষদের একান্ত আপনজন। তাঁর লেখা 'My India' যেন সেকালের ভারতকে চেনার, সে সময়ের, মানুষকে জানার এক এবং অদ্বিতীয় Hand book। তাইতো তিনি সেই বইয়ের উৎসর্গ পত্রে অনায়াসে লিখতে পারেন—

''In my India, the India I know, there are four hundred million people, ninety per cent of whom are simple, honest, brave, loyal, hard working souls whose daily prayer to God… among whom I have lived and whom I love, that I shall endeavour to tell in the pages of this book, which I dedicated to my friends, the poor of India.'' (My India)

তাঁর লেখা বিখ্যাত বইগুলি The Jungle Stories (১৯৩৫); Man Eaters of Kumaon (১৯৪৪); The Man-eating Leopard of Rudraprayag (১৯৪৮); My India (১৯৫২); Jungle Lore (১৯৫৩); The Temple Tigers and More Man-eaters of Kumaon (১৯৫৪) এবং Tree Tops (১৯৫৫)। জীবিতাবস্থায় এটিই ছিল তাঁর শেষ প্রকাশিত বই। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বিভিন্ন অগ্রন্থিত লেখা সংগ্রহ করে আরো দুটি বই প্রকাশিত হয়। ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ করবেট গ্রেট ব্রিটেনের রাজকুমারী এলিজাবেথের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর দায়িত্ব নিয়ে কিনিয়ার নিয়েরির গহীন জঙ্গলে নির্মিত 'ট্রি টপ্‌স্' অতিথি নিবাসে উঠেছিলেন। পরদিন রাজা ষষ্ঠ জর্জের মৃত্যু সংবাদ সেখানে পৌঁছলে রানির সঙ্গে তিনিও নেমে আসেন। এলিজাবেথ তখন আর রাজকুমারী নন তিনি বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বড় উপনিবেশ সহ গ্রেট ব্রিটেনের রানি। চমৎকারভাবে সে কথা করবেট সাহেব উল্লেখ করেন অতিথি নিবাসের রেজিস্টারে।—'' For the first-time in the history of the world a young girl climbed into a tree one day a princess, and after having what she

described as her most thrilling experience she climbed down from the tree the next day a Queen—God bless her…'' (Tree Tops)

শুধু শিকারি বা সাহিত্যিক সত্তাতেই নয়। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত প্রকৃতিপ্রেমী। অরণ্য তথা আরণ্যক সবকিছুকেই তিনি ভালবাসতেন মনপ্রাণ দিয়ে। আবার তিনি ভারতনির্মাণ কর্মযজ্ঞের যাজ্ঞিকরূপেও ছিলেন সমান কুশলী। মোকামাঘাট ছিল উত্তর-পূর্ব রেলপথের একটি উল্লেখযোগ্য পণ্য বিনিময় স্টেশন। সেখানে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তত্ত্বাবধায়কের কাজ সম্পাদন করেন। তাঁর আমলে কোনোদিন সেখানে শ্রমিক অসন্তোষ, পণ্য অবণ্টন, হয়নি। পাশাপাশি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি কুমায়ুন অঞ্চলের পাঁচ হাজার যুবক নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন 70th Kumaon Labour Corps যারা ফ্রান্সের রণাঙ্গণে মিত্র বাহিনীর পক্ষে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সেনাদের জঙ্গলযুদ্ধে প্রশিক্ষিত করেছিলেন যারা বর্মা রণাঙ্গণে অত্যন্ত কুশলতার পরিচয় দেয়। ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ছিলেন তাঁর অত্যন্ত গুণগ্রাহী বন্ধু। জিম করবেট নিজেও সেনাবাহিনীর কর্নেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয়। তার পরপরই করবেটের প্রায় সব বন্ধু-বান্ধব ভারতভূমি ত্যাগ করে নিজদেশে ফিরে যান। কিন্তু তিনি কি করবেন, অকৃতদার তিনি এবং তাঁর বোন ম্যাগি! এ দেশ ছেড়ে যেতে তাঁর মন চায় না। কিন্তু তাঁর চেনা ভারত ক্রমশ বদলে যেতে লাগল। নতুন শাসননীতি, অর্থনীতি আর আধুনিকতার গ্রাসে বদলে যেতে লাগল এদেশ। তার মনে হতে লাগল এই যে বিশাল বিস্তৃত বনভূমি আর তার অরণ্যসম্পদ সব বুঝি হারিয়ে যাবে দ্রুত। নির্বিচারে চলছিল বন্যপ্রাণী নিধন, বিশেষ করে ব্যাঘ্রকূল। তিনি নতুন সরকারকে সাবধান করেছিলেন এ বিষয়ে। তারপর একদিন সত্যি সত্যিই পথে নামলেন এ দেশ ছেড়ে যেতে। তবে না সাগর পাড়ে লন্ডনের উদ্দেশ্যে নয়। আফ্রিকা মহাদেশের কিনিয়ায় ঘন জঙ্গলময় নিয়েরিতে ডেরা বাঁধলেন নতুন করে প্রকৃতিকে দেখবেন বলে। যাবার আগে তাঁর 'Man Eaters of Kumaon' বইটির রয়্যালটির অর্থ তিনি দান করে যান বিশ্বযুদ্ধে নিহত সকল ভারতীয় সেনানীদের পরিবারের জন্য। সে সময় তাঁর এই বইটি দীর্ঘদিন ধরে লন্ডন তথা অন্যান্য শহরে Book of the Month-এর শিরোপা ধরে রেখেছিল। বিশ্বের ২৭ টি ভাষায় অনুদিত এই বইটি একমাসে বিক্রি হয়েছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার কপি যা এক সর্বকালীন রেকর্ড।

যে সময় তিনি রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদকটিকে মেরেছিলেন সেটা ছিল ১৯২৫-২৬। তার ১৬ বছর বাদে মিরাট শহরে জিম করবেট নিয়োজিত ছিলেন যুদ্ধসংক্রান্ত কাজে। সালটা ছিল ১৯৪২, এক সন্ধ্যায় তিনি ও তাঁর বোন কর্নেল ফ্লে'র একটি গার্ডেন পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে সময় কাটিয়ে বার হবার মুহূর্তে দেখেন সাংঘাতিক ভাবে আহত ক্রাচে ভর দেওয়া এক গাড়োয়ালি যুবককে। যে তাঁকে দেখে দ্রুত এসে অতি কষ্টে তাঁর পায়ে মাথা ছুঁইয়েছিল। তাকে করবেট সাহেব তুলে ধরলে সে বলে ''সাহেব তুমি যখন নরখাদকটিকে মেরেছিলে তখন আমি বড় ছোট, দুর্ঘটনায় পা ভেঙ্গে যাওয়ায় আমি ঘর থেকে বার হতে পারতাম না, বাবা এসে বলেছিল যে সে সেই নরখাদকটির মৃতদেহ দেখেছে, তাকে যে মেরেছে সেই সাহেবকেও সে দেখেছে। সেদিন সেই ঘটনার খুশিতে সারা গ্রামে মিঠাই বিলি হয়েছিল, আমিও পেয়েছিলাম সেই মিঠাই। তারপর থেকে যেখানে তুমি বাঘটাকে মেরেছিলে প্রতিবছর সেখানে মেলা বসে। ওই ঘটনার স্মরণে। গ্রামে গ্রামে সবাই তোমাকে আজও দেবতা সমান মানে। আজ আমার হৃদয় আনন্দে ভরে গেছে। আমিও গ্রামে ফিরে গিয়ে সকলকে চিৎকার করে বলবো আমিও দেখা পেয়েছি আমাদের দেবতার।'' এমনই ছিল যাঁর পরিচিতি। তাঁকে চিরকালের মতো ছেড়ে দিতে সেইসব মানুষদেরও বড় কষ্ট হয়েছিল বৈকি।

ভারত ছেড়ে বেশিদিন বাঁচেন নি করবেট সাহেবও। ৮ বছরের মাথায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষবারের মতো চোখ বোঁজেন তিনি। জীবনের শেষবেলায় সূর্যাস্তের আলোয় কিনিয়ার ঘন জঙ্গলের ছায়ায় ঢাকা নিয়েরির বাড়িতে বসে ভাবতেন ফেলে আসা দেবতাত্মা হিমালয়ের কথা। সেই রানিক্ষেত, আলমোড়া, কুমায়ুন, চম্পাবত পিপলপানি, মোকামাঘাট আর অবশ্যই পাহাড় আর বুনোফুলের সুগন্ধে ঘেরা তাঁর নিজের গ্রাম কালাধুংগির কিংবা নৈনিতাল হ্রদ সংলগ্ন তাঁদের গ্রীষ্মাবাস গার্নি হাউসের চারপাশের জঙ্গলে বাল্যের রোমাঞ্চের কথা। মনে পড়তো কুনওয়ার সিং, মোথি, আরো কত প্রিয় মানুষ এবং পোষ্য রবিনের কথা। নিয়েরিতে তাঁর কবরটিকে ছায়া দিয়ে রেখেছে বিশাল এক বাওবাব গাছ। কে জানে হয়তো ভোরের আলোয় একটি ছোট্ট ছেলে সেখানে হাওয়া বন্দুক হাতে তাড়া করবে এক বনমোরগকে আর ঠিক তখনই পাশের ঝোপ থেকে বিশাল এক চিতাবাঘ বেরিয়ে এসে বলবে ''এসব কি হচ্ছে খোকা? বড় হও, জঙ্গলকে চেনো তবে না শিকার…''

১৯৩৪ এ তৈরি হওয়া ভারতের প্রথম অভয়ারণ্যটির নামকরণ করা হয় তাঁরই নামে 'জিম করবেট ন্যাশানাল পার্ক'। করবেট সাহেব ১৯২৮এ 'কাইজার-ই-হিন্দ' সম্মান ও ১৯৪৬-এ 'অর্ডার অফ দ্য ইন্ডিয়ান এ্যম্পেয়ার' সম্মানে ভূষিত হন। কিন্তু তার থেকেও বড় সম্মান পেয়েছেন মানুষের হৃদয়ের ভালবাসা। তাঁর সার্ধ শতবর্ষের জন্মজয়ন্তিতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই তাঁরই কলমে—

''… I am thankful that my men and I served India at a time when the interest of one was the interest of all, and when Hindu, Mohammedan, Depressed class, and Christian could live, work, and play together in perfect harmony. As could be done today if agitators were eliminated, for the poor of India have no enmity against each other.''

(Life of Mokamaghat)

(পত্রিকার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে দেবাশিস মুখোপাধ্যায়)

প্রধান রচনা

বাংলাদেশ: ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তন

মদন মোহন পাল

সমকালীন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এক অন্যতম পরিবর্তিত দেশ হল বাংলাদেশ। যেখানে ঘটে গেছে শাসক বিরোধী এক অভ্যুত্থান,দেশছাড়া হয়েছেন সে দেশটির প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু কীভাবে এই পরিবর্তনগুলি ঘটলো এর আছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরির পর থেকে সেদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের সেদেশের চাকরি তথা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে ৩০% কোটা দেওয়া হত শুধু তাই নয় যদি কোনো চাকরিতে ১০০ টি পদ থাকত তাতে ৩০ টি কোটা মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের তাছাড়া ১০% নারী, ১০% অনগ্রসর জেলা কোটা ৫% নৃগোষ্ঠী এবং ১% প্রতিবন্ধী কোটা অর্থাৎ মোট পদের ৫৬%। যেখানে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদ সুযোগের সমতা, অনুচ্ছেদ ২৮ বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদ সরকারি চাকরিতে সকলের সমান অধিকার এই সুযোগের কথা বলে সেখানে সেই দেশের শাসক এটাকে রাজনৈতিক সুবিধার ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করে। ২০২৪ সালের আন্দোলন প্রথম নয় ২০১৮ সালে 'বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ' এই আন্দোলন চালু করে কোটা ব্যবস্থার সংস্কার চেয়ে। সেবছরই ২০১৮ সালের ৪ঠা অক্টোবর বাদ যায় কোটা ব্যবস্থা। কিন্তু সমস্যার শুরু ২০২৪ সালের ৫ই জুন যখন সেদেশের হাইকোর্ট মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৮ সালের পরিপত্রটি বাতিল করে। এর মানে আবার ৩০% মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের চাকরিতে সংরক্ষণ যা আন্দোলনে ঘৃতাহুতি দেয়। ২-৬ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা 'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন' এর ব্যানারে ২০১৮ সালের পরিপত্রটি পুনঃবহালের দাবি করতে থাকে। ছাত্ররা নয় দফা দাবি নিয়ে আসে, রাষ্ট্র ও প্রশাসনকে দায়ী করে প্রধানমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানানো হয়। ছাত্ররা স্লোগান দেয় "কোটা একটি ভিক্ষা, মুক্তি পাক শিক্ষা", "কোটা না মেধা"? এই আন্দোলনে সরকারি বেসরকারি সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এগিয়ে আসে যেমন ঢাকা, জগন্নাথ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, শুরু হয় দেশজুড়ে বাংলা ব্লকেড আন্দোলন। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক পারভেজ করিম আব্বাসি বলেন যে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঊর্ধমান, খাদ্যদ্রব্যের দাম ১৪% ঊর্ধ্বমুখী, দেশের যুবকদের মধ্যে ১৬% বেকার এবং দেশের গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার মৃত্যু—হাসিনা সরকারকে পতনের দিকে ঠেলে দেয়। ২০২৪ সালের যে নির্বাচনে হাসিনা জেতেন সেইখানে কোনো বড় দল তথা দেশের সর্ববৃহৎ বিরোধী দল বি.এন.পি. সহ আরও অনেকে বর্জন করে। এছাড়া বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান মৌলবাদ এবং হাসিনা সরকারের পুলিশের গুলিতে অগণিত মৃত্যু সমাজের প্রতিটি শ্রেণিকে এই আন্দোলনের দিকে টেনে নিয়ে আসে। হাসিনা চিন সফরে থাকায় পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। ওয়াকিবহাল মহলের মতে হাসিনার উপর রুষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, পাকিস্তান, সৌদি আরব, কাতার, তুরস্ক প্রমুখ রাষ্ট্রও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৪ই জুলাই হাসিনার আন্দোলনকারীদের 'রাজাকারের' সাথে তুলনা এবং ছাত্ররা "আমরা কারা রাজাকার, কে বলেছে স্বৈরাচার'' এই স্লোগানে আন্দোলন সংঘবদ্ধ করে । ১৬ই জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদের মৃত্যু একটি রূপক হিসাবে কাজ করে আন্দোলন তীব্র হয়। ছাত্রদের এই আন্দোলনে পাশে দাঁড়ান শিক্ষকেরাও, যারা এই আন্দোলনে বলি হয়েছেন তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন – মীর মুগ্ধ, দীপ্ত দে, তাহমিদ তানিম, রিয়া গোপ আরও অনেকে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর মতে মৃত্যু হয়েছে ৭৫৭ জনের। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান রাজনীতির ইসলামিকরণে বাংলাদেশের জামায়েতে ইসলামি, হেফাজতে ইসলাম, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ—এই শক্তিগুলি এতদিন একটা সুযোগ খুঁজছিল। সরকারের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান (RAB), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (BGB), আনসার বাহিনী খুব হিংস্র হয়ে ওঠে, জায়গায় জায়গায় পেলেট গান ছোড়া হয়। ছাত্র লীগের সঙ্গে বিএনপির জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল এবং জামাতের ইসলামিক ছাত্র শিবিরের সংঘর্ষ বৃদ্ধি পায়। আওয়ামী লীগের ছাত্র ও যুব সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সদস্যরা এবং আহমদিয়া, বাউলফকির, শিল্পী, প্রতিবাদী, সাংবাদিক, সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, জনজাতিরা আক্রান্ত হন। দেশজুড়ে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। দেশটির সেনাপ্রধান বিবৃতি দেন আর বাংলাদেশ এমন দেশ যে বহুবার সামরিক অভ্যুত্থান দেখেছে। ২১ শে জুলাই দেশটির সুপ্রিম কোর্ট ৫% কোটা রেখে সব কোটা তুলে

দেয়, কিন্তু আন্দোলন এতে থামে না। ৩রা আগস্ট ছাত্ররা একদফা দাবি পেশ করে সমন্বয়ক মো. নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে তা হল— প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ। ৫ই আগস্ট উত্তেজিত জনতা গণভবন, আসলে দেশটির প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে যাত্রা করে, ছাত্র জনতার দ্বারা পুলিশ আক্রান্ত হয়ে পিছু হটে, সেনাবাহিনী নিষ্ক্রিয় থাকে এবং সেনা প্রধানের নির্দেশে তৎক্ষণাৎ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন।

এবার ছাত্র আন্দোলনের চরিত্র পাল্টায়। দেশটির প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবন লুঠ করা হয়। পুলিশ প্রশাসন ভেঙে পড়ে মৌলবাদী উন্মাদনা দেখা দেয়, পুলিশকর্মীদের মেরে ঝুলিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের সদস্যদের খুন করা হয়। প্রতিবাদী ও সংখ্যালঘু, শিল্পী-সাংবাদিকদের উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ আসে। নয় দফা দাবির বদলে কোর্ট যখন সংরক্ষণের দাবি মেনে নেয় তখন হঠাৎ একদফা দাবি এবং হাসিনার পদত্যাগের পেছনে কোনো বিদেশি শক্তির যোগ দেখছে দেশটির এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী।

হাসিনার পতনের পর দেশটিতে একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় যার প্রধান বিদেশ থেকে আসা উপদেষ্টা ড. ইউনুস যদিও এটি কোনো নির্বাচিত সরকার নয়। এর সাথে যুক্ত রয়েছেন বিভিন্ন ছাত্রনেতা। দেশটির প্রশাসনে ব্যর্থতা নেমে এসেছে বারবার – সংখ্যালঘু, নারী, এদের উপর নেমে এসেছে অত্যাচার যদিও কিছু ব্যতিক্রমও দেখা গেছে। মন্দির পাহারা দিচ্ছেন মুসলিম যুবকরা এই চিত্রও মিলেছে। মুজিবের মূর্তি ভাঙ্গা তথা তাঁকে অস্বীকার, সংবিধান পরিবর্তন ছাত্র আন্দোলনের এক অন্যরকম বার্তা দেয়। দেশটিতে প্রথমে জুনের মধ্যে তারপর ডিসেম্বরে নির্বাচনের কথা আলোচনার মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা নতুন দল গড়েছে 'জাতীয় নাগরিক পার্টি' যাতে স্লোগান উঠেছে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' তারা ডাক দিয়েছেন Second Republic গড়ার। এক দিকে পাক-ইউনুস-জামাত-উপদেষ্টা ও ছাত্রনেতা অক্ষ, অন্যদিকে দেশটির সেনা প্রধানের বিবৃতি ভাবাচ্ছে এক নতুন রাজনীতির সমীকরণের দিকে। যদিও হাসিনা সরকারের পতন কোন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে হয়নি তাই এই পশ্চিমা ধারণা ছাত্র রাজনীতিকে কীভাবে প্রভাবিত করে এবং বিএনপি, হেফাজত, জামাত কীভাবে এই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ভারসাম্য রাখে সেটি দেখার। প্রথমে ২০২৫এর এপ্রিলের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন হবে জানিয়ে ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী বিএনপি, জামাত হেফাজতের ও ছাত্র নেতাদের মধ্যে ভারসাম্য ও সমন্বয় রাখার চেষ্টা করছিলেন ইউনুস এবং তাঁর সহযোগীরা। ক্রমে পেছিয়ে সেটি জুন '২৬এ নিয়ে গেছেন। ভারতের চোখে চোখ রেখে কথা বলে মার্কিন, চীন, পাকিস্তান, তুরস্ক ও আরব দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে নতুন ভূ রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইছেন তিনি।

তবে এই আন্দোলনে একটি বিশেষ স্বরূপ হিসাবে দেখা গেছে ভারত বিরোধিতা, দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে দেখানো হয়েছে ভারতের হাতের পুতুল রূপে। আর ভারত শত্রু রাষ্ট্র যে ভারত দেশটি স্বাধীনতাতে সাহায্য করেছে, যে ভারত ব্যবসা – বাণিজ্য – চিকিৎসার জন্য জরুরি সেই ভারত বিরোধিতা আন্দোলনকে নিয়ে গেছে অন্য পথে যা আমাদের ভূ রাজনৈতিক রাজনীতি সম্পর্কে আরো ভাবায়। আবার অন্যদিকে এই ভারত বিরোধী অভ্যুত্থানে ভারতের নীরবতা আরেকটি বিষয়। এর সঙ্গে অনেক বিশেষজ্ঞ হাসিনা ও ভারত বিরোধী রাষ্ট্রগুলির এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিপ স্টেটের ভূমিকা দেখছেন।

সবশেষে বলতে পারি যে আন্দোলন বৈষম্য বিরোধী নাম দিয়ে শুরু হয়েছে তা কি বৈষম্য দুর করতে পারবে? দেশটির হিন্দু তথা বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আদিবাসী, আওয়ামী লীগের ছাত্র ও যুব সংগঠনদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ বোঝাচ্ছে আন্দোলন আসলে বিশেষ কিছুই করতে পারেনি। সমাজের পরিবর্তনে আসলে দরকার সামাজিক পরিবর্তনের আন্দোলনের যা উঠে আসবে নিচুতলা থেকে। কিন্তু সামাজিক সংস্কারের এই আন্দোলন একাজ করতে ব্যর্থ শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে এই আন্দোলন তথা দলগুলি এখন ব্যস্ত। আর মহম্মদ ইউনুস, তার সহযোগী মাহফুজ আলম, জামাত, হেফাজতে প্রমুখেরা ব্যস্ত দেশটির খালিফা ও তালিবানিকরণে। দেশটিতে এই ছাত্র সংগঠিত সরকারের বিরুদ্ধেও আবার ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলনের ডাক দিয়েছে সে দেশেরই আরেক শ্রেণির ছাত্র। নারীর অধিকার খর্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় নারীরা আক্রান্ত। তবে যে কোনো আন্দোলনই ব্যর্থ হয় না তার দাগ থাকে সুদূরপ্রসারী যদি সেটা সামাজিক ক্ষেত্র থেকে পরিবর্তন হিসাবে উঠে আসে। যে দল এরা তৈরি করেছে তা আসলে রাজার দল বলেও কেউ কেউ কটাক্ষ করেছেন, তবে এই রাজার দল প্রজার দল হয়ে সব ক্ষেত্রের মানুষ সঙ্গে নিয়ে শান্তি, শৃঙ্খলা, সুশাসন বজায় রেখে দেশ ও দেশবাসীর যাবতীয় প্রকট সমস্যা নিয়ে এগিয়ে আসলে আন্দোলনটি আরো গভীর ছাপ রাখতে পারতো। গত একবছর দেখা গেল ইউনুস সরকার কোন সুশাসন দিতে পারেনি। যা কিছুর সঙ্গে ভারত, মুজিবর রহমান ও হিন্দু তিনটি বিষয়ের যোগ আছে সেগুলি উপড়ে ফেলাই তাদের প্রধান কাজ হিসাবে দেখা গেছে। ১৯৭১এর স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হয়েছে।

বাংলাদেশের জুলাই অভ্যুত্থান: ভারতের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তের সঙ্গে পূর্ব সীমান্তেও সঙ্কট

শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়

ভারতের কূটনৈতিক ব্যর্থতা: বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে এত বড় কূটনৈতিক এবং গোয়েন্দা ব্যর্থতার মুখে পড়েনি নয়াদিল্লি। মাত্র পাঁচ সপ্তাহের জুলাই বিপ্লবেই পতন ঘটল বাংলাদেশের প্রবল দোর্দণ্ডপ্রতাপ শেখ হাসিনার সরকারের। এটা ঠিক প্রথম দফায় ভোট জিতে এলেও বাকি দুটো দফায় ভোট করতেই দেননি শেখ হাসিনা। তলায় তলায় যে হাসিনার বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে তা বুঝতেই পারেনি দিল্লি। হয়তো বা বুঝতে চায়ও নি। ভারতের ভরসা ছিল বাংলাদেশে শেষ পর্যন্ত অভ্যুত্থান হবে না। হাসিনা ঠিক সামলে নেবেন। মোদী সরকারের বিদেশনীতি এবং গোয়েন্দা নীতির ব্যর্থতা এখানেই। শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে বাংলাদেশের সেনাপ্রধানকে বলে শেষ মুহূর্তে শেখ হাসিনাকে সেফ প্যাসেজে করে ভারতে নিরাপদ স্থানে উড়িয়ে নিয়ে এলেও ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। ভারত যত শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের দিকে ঝুঁকেছে ততই বাংলাদেশে, ভারত বিদ্বেষ মাথা চাড়া দিয়েছে পাল্লা দিয়ে। আর তাতে ইন্ধন দিয়েছে পাকিস্তান, চিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অন্যান্য ইসলামি রাষ্ট্র এবং উগ্র মৌলবাদী সংগঠন জামাত, হেফাজত ও তাদের সহযোগীরা। বাংলাদেশে বেশ কয়েক বার যাওয়া আসা এবং ওপারের বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করে ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু ধারণা হয়েছে তা হল বাংলাদেশে সমান্তরালভাবে দুটি শক্তি চলেছে। এক, বাংলা ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সঞ্জাত উদারমনস্ক বাঙালি জাতীয়তাবাদ। আরেকটি কট্টর ইসলামি ধর্মীয় মৌলবাদ। যাদের লক্ষ্য ফের বাংলাদেশকে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার আগের পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। তাদের দাবি বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করতে হবে আর উর্দুকে করতে হবে জাতীয় ভাষা, বাংলাদেশে চালু করতে হবে খিলাফত এবং শরিয়ত আইন। একথা ঠিক পরস্পর বিরোধী দুটি শক্তি কখনোই নির্মূল হয়নি বাংলাদেশের মাটি থেকে। দুটো ধারাই রয়ে গেছে বাংলাদেশের মাটিতে। কখনো ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালী জাতীয়তাবাদী শক্তি জয় লাভ করেছে, কখনো আবার সামরিক অভ্যুত্থান, দাঙ্গা, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকে ঘিরে বারে বারে ফিরে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী রাজাকার শক্তি। আর এই দুই শক্তির সমীকরণে স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রধান রাজনৈতিক প্রতিনিধি আওয়ামী লীগের পক্ষে থেকেছে ভারত। কিন্তু প্রধান বিরোধীদল বিএনপির সঙ্গে নয়াদিল্লি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রায় ৫৪ বছর পরও গড়ে তুলতে পারেনি একটা কাজ চালানোর মত সম্পর্ক। বৈদেশিক কূটনীতিতে তা ব্যর্থতা বৈকি? কিন্তু এখন সব বুঝেও কিছু করার নেই ভারতের। ওপার বাংলায় গণতান্ত্রিক সরকার না ফেরা পর্যন্ত কিছুই করার নেই ভারতের। সুতরাং চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈরিতা, আফগানিস্তানে প্রভাব হাতছাড়া হয়ে যাওয়া, জোটনিরপেক্ষ তারপর সোভিয়েতমুখী বিদেশনীতি থেকে সরে মার্কিনমুখী হওয়ার পরও বারবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গলাধাক্কা খাওয়া এবং উপমহাদেশে নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির পর 'বিশ্বগুরু' নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের কানাডার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের পর বাংলাদেশে বিরাট ধাক্কা।

বাংলাদেশের 'জুলাই অভ্যুত্থান':

২০২৪-র 'জুলাই অভ্যুত্থানের' মাধ্যমে তথাকথিত ছাত্র-জনতাকে সামনে রেখে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিল ভারত বিরোধী পাকপন্থী পুরনো রাজাকার-আল বদরদের সংগঠন কট্টর ইসলামি নিষিদ্ধ থাকা 'জামাত-ই-ইসলামি'। তার সঙ্গে সামনের সারিতে হেফাজত-ই-ইসলামি, তৌহিদি জনতা, হিজবুল তাহরির প্রমুখ কট্টর ইসলামি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি এবং পাকপন্থী প্রধান বিরোধী দল বিএনপি।

এরপর শুরু হল সারা বাংলাদেশ জুড়ে লুঠপাট, খুন, ধর্ষণ, ধ্বংসের বহুৎসব। হিন্দু সম্পত্তি, নারী ও দেবস্থান প্রবলভাবে আক্রান্ত হল। তার সঙ্গে বৌদ্ধ, জনজাতি, আহমদিয়া, বাউল-ফকির সম্প্রদায়। তাছাড়াও আওয়ামী লীগ এবং তাদের সহযোগী বাম ও অন্য দলগুলির নেতা কর্মীরা। তারসঙ্গে মুক্তমনা, শিল্পী, সাংবাদিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রতিবাদী ব্যক্তিরা। ভারত ও মুজিব পরিবারের চিহ্নসম্পন্ন সবকিছুই ভেঙ্গে, পুড়িয়ে তছনছ করে দেওয়া হল। নৃশংস প্রতিশোধ নেওয়া হল ১৯৭১ এর ভারত সহায়ক স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের মুক্তিযুদ্ধের পরাজয়ের।

হাসিনার সময়ের যে স্থিতি, অর্থনৈতিক ও পরিকাঠামোগত উন্নতি, বাংলাদেশের স্বাধীন আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং ভারত-বাংলাদেশ অক্ষকে ভাঙ্গতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, পাকিস্তান, সৌদি আরব, কাতার, তুরস্ক প্রমুখ মদত ও পরিকল্পনার সঙ্গে অর্থ ও

অস্ত্রের ভাণ্ডার উপুড় করে দিল। সামরিক বাহিনীকেও পক্ষে নিল। থানা জ্বালিয়ে পুলিশ মেরে চারিদিকে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জেল ভেঙ্গে জঙ্গীদের মুক্ত করা হল। সন্ত্রাসীদের এক অন্তবর্তী সরকার গঠন করা হল যার প্রধান উপদেষ্টা করা হল পাশ্চাত্যের বৃহৎ পুঁজির প্রতিনিধি, হাসিনার প্রতিদ্বন্দ্বী, একদা 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্ত বিদেশে বসবাসকারী মহম্মদ ইউনুসকে। আর এই সরকারের কাজ হয়ে দাঁড়াল প্রবল ভারত বিরোধিতা, পাক ও চিন ভজনা, হিন্দু ও আওয়ামী লীগদের শেষ করা, ছাত্র-জনতার লুঠপাট গুণ্ডামি নৈরাজ্যের সহযোগিতা এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাওয়া। ভারতের মোদী সরকারের নিষ্ক্রিয়তায় এর গতি বেড়ে গেল। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ এবং তাদের শক্ত ঘাঁটি ফরিদপুরের গোপালগঞ্জকে তছনছ করে দেওয়া হয়।

'অভ্যুত্থানে'র অন্তরালে:

কিন্তু বাংলাদেশে কেন এমন হল? কোন কিছুই হঠাৎ করে হয়না। প্রবন্ধের প্রথমে আমরা হাসিনা কর্তৃক বাংলাদেশকে বিরোধীশূন্য করা ও শেষ দুটি নির্বাচন সম্পূর্ণ রিগ করা এবং হাসিনা-নির্ভর ভারত সরকারের গোয়েন্দা ও কূটনৈতিক ব্যর্থতার কারণ গুলি উল্লেখ করেছি। এবার আমরা অন্যান্য কারণগুলি খুঁজব।

১) শেখ হাসিনা ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০০৯ থেকে ২০২৪ অবধি পাঁচবারে (শেষবার টানা তিনবারের) ২১ বছর ধরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং ১৯৮১ থেকে এখন অবধি বিগত ৪৫ বছর ধরে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও সর্বেসর্বা। এই দীর্ঘ শাসন ও কর্তৃত্বে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত ছাড়াও কর্তৃত্ববাদ ও স্বৈরাচার প্রস্ফুটিত হয়েছিল। আর তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এক চাটুকার, সুবিধাবাদী, দুর্নীতিগ্রস্ত, সাধারণ মানুষকে শোষণ ও অত্যাচার এবং সরকারি সম্পদ লুঠপাট করে অতিধনী হওয়া এক অভিজাততন্ত্র (Oligarchy)।

২) দেশজুড়ে ব্যাপক আর্থিক বৈষম্য, কর্মসংস্থানের অভাব ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সাধারণের সঙ্কট। অন্যদিকে দল, সরকার ও সর্বোচ্চ নেত্রীর মদতে বিদেশি কর্পোরেট ও দেশি পারিবারিক পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, দালাল ও মাফিয়ারা দেশের অর্থনীতিকে ফোঁপরা করে দিয়ে বিদেশে টাকা সরাচ্ছিল।

৩) নেত্রী, দল ও কর্মীদের সাধারণের থেকে বিচ্ছিন্নতা। দলীয় নেতা কর্মীদের একংশের সাধারণ মানুষের উপর জুলুমবাজি।

৪) দুই প্রধান বৃহৎশক্তি মার্কিন ও চিনের মুঠো থেকে বেরিয়ে হাসিনা সরকারের স্বাধীনচেতা অবস্থান ও কর্মসূচি।

৫) ভারতীয় সীমান্ত দিয়ে ঘেরা, ভারত নির্ভরতা এবং একমুখী ভারতীয় বাণিজ্য ছাড়াও পদ্মা, তিস্তা, মনু, মুহুরি, খোয়াই, গোমতী, ধরলা, দুধকুমার ও কুশিয়ারা নদীর জল কম ছাড়া নিয়ে ভারত ও হাসিনা বিদ্বেষ বৃদ্ধি।

৬) কোভিড পরবর্তী বস্ত্র শিল্পে মন্দা, বিপুল বিদেশি ঋণের বোঝা সহ অর্থনৈতিক মন্দা, সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি ও কালোবাজারি।

৭) রোহিঙ্গা শরণার্থীর চাপ।

৮) ক্ষমতা ধরে রাখতে হাসিনা কর্তৃক হেফাজতই ইসলাম সহ ইসলামি মৌলবাদীশক্তির একাংশের সঙ্গে বোঝাপড়া, ছাড় ও প্রশয় যা বিষাক্ত মৌলবাদী পরিবেশ গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ।

৯) এলাকাভিত্তিক দাপুটে অপরাধী ও মৌলবাদীদের শাসক দলে গ্রহণ এবং তাদের অনেকের পুরসভার চেয়ারম্যান, সাংসদ, নেতা, মন্ত্রী হয়ে ওঠা।

১০) ভারতে বিজেপির হিন্দুত্ববাদী শাসনের প্রতিক্রিয়া।

১১) শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে পরিচালিত 'ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি'র 'শাহবাগ আন্দোলনে'র মত জনপ্রিয় গণ আন্দোলনের দীর্ঘ অনুপস্থিতি।

১২) প্রতিবাদী ও মুক্তমনাদের হত্যা; 'ছায়ানট' সহ সুস্থ শিল্প সংস্কৃতির উপর হামলা; সংখ্যালঘুদের আক্রমণকারী 'ছাত্র শিবির', 'জে এম বি', 'আনসারুল্লা বাংলা টিম' প্রভৃতি ইসলামি সন্ত্রাসী সংগঠনের রমরমা এবং হাসিনা সরকারের তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা।

১৩) হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে অন্তর্জালে, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে, মসজিদ-মাদ্রাসা-ধর্মীয় সমাবেশ, জনসভায় যেভাবে অভিযোগ ও অপপ্রচারের বিদ্বেষ ছড়িয়ে মানুষের মন বিষাক্ত করা হচ্ছিল তার মোকাবিলা করতে না পারা।

১৪) গণ অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রশমনের বদলে পুলিশ-র‍্যাব-দলীয় কর্মীদের মাধ্যমে দমন-পীড়ন, অত্যাচার পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করে দিয়েছিল।

এরপর আমরা আসব মায়নমার সীমান্তে মণিপুরে মেইতেই বনাম কুকি-জো দের হিংসাত্মক গৃহযুদ্ধের পর বাংলাদেশ রাতারাতি শত্রু রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় দেশের পূর্ব সীমান্তে অস্থিরতা, বিশেষত চিনের দিক থেকে ঝুঁকি বৃদ্ধি বিষয়ে।

চিকেন নেক ও প্রাককথন: অতীতের ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে ভারতকে

ভুল হয়েছিল সেই জন্মলগ্নেই। আর বিধাতা বোধ হয় তখনই অলক্ষ্যে হেসে উঠেছিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট দুটি রাষ্ট্র হিসেবে ভাগ হয়ে গেল ভারত ও পাকিস্তান। পাকিস্তান আবার হল

পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান এই নিয়ে। দেশ ভাগের মাত্র কয়েকমাস আগে জিন্নার পৃথক রাষ্ট্রের দাবি মেনে রাডক্লিফ এলেন দিল্লিতে। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ক্লিফ সাহেবের অখণ্ড ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোনও ধ্যানধারণাই ছিল না। মাত্র দু'মাসে টেবিলের উপর ম্যাপ বিছিয়ে তিনি ইচ্ছা মতো টেনে দিলেন রেখা। আর তাতেই পড়ে গেল শিলমোহর। বাংলা ভাগের ব্যাপারে তখন টু শব্দ খরচ করলেন না নেহরু সহ তাবড় কংগ্রেস নেতৃত্ব। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে উত্তর পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে ভারতকে দেওয়া হল একটি সরু ছোট্ট ভূখণ্ড। এই শিলিগুড়ি করিডোর দৈর্ঘে যা ৬০ কিলোমিটার আর চওড়ায় ১৭ থেকে ২২ কিলোমিটার মাত্র। অথচ যে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলো অদ্ভুত ব্যাপার হল অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার সেই ঠাকুরগাঁ, রংপুর, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়েও কিন্তু তখন মুসলিমদের থেকে হিন্দুদের সংখ্যা কম নয়। অর্থাৎ মোদ্দা কথা হল দেশভাগের সময়ই যদি অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার দাবি জানাতো ভারত তাহলে এই চিকেন নেক সমস্যার প্রশ্নই উঠতো না। সমস্যা সমাধানের বার বার সুযোগ পেয়েছিল ভারত, কিন্তু সুযোগ পেয়েও সে তা করেনি। আর তারজন্যই এখন হাতের আঙ্গুল কামড়াতে হচ্ছে তাকে। প্রথম সুযোগ এসেছিল ১৯৭১ সালে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে সেই সময় চুক্তির মাধ্যমে ওই জমিটুকু হস্তান্তরের সুযোগ এসেছিল ইন্দিরা গান্ধির কাছে, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধি সেই পথে হাঁটেননি। দ্বিতীয় সুযোগও এসেছিল অতি সম্প্রতি মোদীর জামানায়। ছিট মহল হস্তান্তরের মাধ্যমে নিজেদের সীমানা জট মিটিয়েছিল বলে দাবি করেছিল নয়া দিল্লি এবং ঢাকা। স্থল সীমান্ত চুক্তিতে বাংলাদেশের কাছে প্রায় ৪০ বর্গ কিলোমিটার জমি হারায় ভারত। প্রতিবেশি দেশটির সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রাখতে সে সময়ও শেখ হাসিনার কাছে চিকেন নেকের সন্নিকটের সম পরিমাণ জমির দাবি জানায় নি ভারত। অথচ এতটা প্রকট না হলেও ততদিনে চিকেন নেকের গুরুত্ব বুঝে গেছে নয়া দিল্লি। বিশেষ করে চিকেন নেকের উপর চিনের নজর হঠাৎ আজকের ঘটনা নয়। বরং ১৯৪৯ সালে স্বাধীন হওয়া দেশটি যখন ১৯৫১ সালে তিব্বত দখল করে ভারতের গায়ের কাছে নিশ্বাস ফেলতে শুরু করেছিল তখন থেকেই চিকেন নেক ভারতের কাছে মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভারত তার ফল হাতেনাতে টের পেয়েছিল ১৯৬২ সালের ইন্দো-চিন যুদ্ধে। যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ৬২ সালের ২০ অক্টোবর। ঠিক এক মাস পর ২১ নভেম্বর একতরফা ভাবে চিন যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে। হিন্দি চিনি ভাই ভাইয়ের স্লোগান দেওয়া নেহরুকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুতে ফেলে চিনা সেনা ভারত সীমান্তের মধ্যে ৩৫০ কিমি ঢুকে অসমের তেজপুর পর্যন্ত চলে এসেছিল। অন্যদিকে জোজি-লা পাস থেকে চিকেন নেকের দূরত্ব মাত্র ১৩০ কিমি। বিতর্কিত ডোকলাম থেকে আরও কম। শেষবার সুযোগ এসেছিল গত বছর। জুলাই '২৪-র পরও যেভাবে ভারতীয় পতাকার অমর্যাদা সহ ভারত বিরোধিতা, সংখ্যালঘু হিন্দু হত্যা ও নিপীড়ন, বাংলাদেশের ভারতমিত্র সরকারের উপর আক্রমণ, সীমান্ত পেরিয়ে শরণার্থীদের আসার চেষ্টা, ভারত সীমান্তে উগ্রবাদী কার্যকলাপ এবং কেন্দ্র সরকারের প্রতি রাজ্য বিজেপির আবেদন-এর কোন একটি বিষয় নিয়েও ভারত হস্তক্ষেপ করতে পারত। কিন্তু মোদি সরকার সেই রাস্তায় হাঁটে নি। এরপর ইউনুস, অন্যান্য উপদেষ্টারা, জামাত ও 'গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (জিসিএস)' নেতারা যেভাবে ঘন ঘন চিন সফরে গেলেন; চিনা দূতাবাস বাংলাদেশে সক্রিয় হয়ে উঠল; চিনের সাহায্যে চিকেন নেকের গায়ে লালমণির হাট সামরিক বিমান ঘাঁটিকে ও সুন্দরবনের মংলা নৌবন্দরকে পুনর্গঠিত করার পরিকল্পনা হল। আইএসআই এর কর্তারা যেভাবে ঘন ঘন বাংলাদেশ সফরে আসছেন এবং পাক জাহাজ থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে বড় বড় কন্টেনার নামানো হচ্ছে তাতে নয়া দিল্লির চিন্তা উর্ধমুখী। তার উপর ইউনুসের ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে নিয়ে অনভিপ্রেত মন্তব্য।

ডোকলাম ও তারপর:

টনকটা আসলে নড়ে ২০১৭ সালে ডোকলাম বিবাদের সময়। ভারত-ভূটান-চিন-সীমান্তের ট্রাই জংশনে পাহাড় ঘেরা ছবির মতন জায়গা ভূটানের ডোকলাম। অত্যুৎসাহী পর্যটকেরা ওল্ড সিল্ক রুট ভ্রমণের সময় গ্যাংটক থেকে ছাঙ্গু লেক, পুরনো বাবা মন্দির, হয়ে ডোকলাম ছুঁয়ে আসতেন। আবার লাভা, রংলি, পদমচেন, জুলুখ, নাথাং ভ্যালি হয়েও গাড়িতে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টার জার্নি ডোকলাম। পাহাড়ি পথে দূরত্ব বেশি হয়। আকাশ পথে সামান্য। এহেন ট্রাই অ্যাঙ্গেলে অবস্থিত ডোকলামের ছোট্ট এক ভূমিখণ্ডই উঠে এল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের প্রথম পাতায় মাসের পর মাস। জনমানবহীন ভূটানের এই পাথুরে রুক্ষ জমিতেই সবার নজর এড়িয়ে চুপিসারে রাস্তা এবং সেনাদের থাকার জন্য বাঙ্কার করছিল চিন। ঘটনার কথা জানতে পেরে চিনা সেনাদের বাধা দিতে যায় ভূটান রয়াল আর্মির জনা পঞ্চাশেক সেনা। কিন্তু তাঁদের মাছি তাড়ানোর মতন তাড়িয়ে দেয় চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মির জওয়ানরা। চিনা সেনাদের সঙ্গে না পেরে ভূটান দ্বারস্থ হয় ভারতের। ভারতের সঙ্গে ভূটানের প্রতিরক্ষা চুক্তি আছে। মানে কোনও দেশ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে অপর দেশ তার পাশে দাঁড়াতে বাধ্য। নেহাতই বাধ্য হয়ে এবং নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে থিম্পুর আবেদনে সাড়া দেয় নয়া দিল্লি। ভারতীয় সেনারা গিয়ে ডোকলামে চিনা সেনার কাজ বন্ধ করে দেয়। তাদের নির্মাণ কর্মীদের হটিয়ে দিয়ে তাঁদের গাড়ি, মেশিনগুলোরও দখল নিয়ে নেয়। ছোটখাট বিবাদের ঘটনা স্থানীয়

কমান্ডার স্তরে ফ্লাগ মিটিংয়ের ফলেই সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু হল না। সেদিনের মতন চিনা সেনারা ফিরে গেলেও পরদিন তাঁরা ফিরে এল দ্বিগুণ শক্তিতে। গায়ের জোরে তাঁরা ডোকলামে রাস্তা করবেই। অথচ ম্যাপে ডোকলাম আন্তর্জাতিকভাবেই ভূটানের ভূখণ্ড বলে স্বীকৃত। কিন্তু গায়ের জোরে চিনা সেনা কোনও কথা শুনতেই নারাজ। ফলে শুরু হল দু দেশের সেনার মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ। ভারতীয় সেনা জওয়ানদের হাতে বেদম মার খেয়ে তারা ফিরে গেল বটে কিন্তু নিয়ে এল বিশাল সেনা দল। তারা ডোকলাম ট্রাই জংশন থেকে ঢিল ছোড়া দুরত্বে চিনা সীমান্তে তাঁবু খাটিয়ে বসে থাকল মাসের পর মাস। ভারতও অতিরিক্ত ৫০ হাজার সেনা মোতায়েন করে দিল ডোকলাম সীমান্তে। তিন মাস সামনা সামনি দাঁড়িয়ে থাকার পর কূটনৈতিক এবং সামরিক কর্তাদের মধ্যে আলোচনায় জট কাটল বটে কিন্তু পুরোটা মিটল না। চিন ডোকলামের উঁচু পাহাড়ের চুড়োর কাছাকাছি সামরিক চৌকি বানালো। ভূটানের জায়গার মধ্যে ঢুকে আধুনিক গ্রাম বানালো।

এখানে চিনের তৎপরতার উদ্দেশ্য শিলিগুড়ি করিডোরের উপর নজরদারি এবং কখনো যুদ্ধ বাঁধলে তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে দখল নিয়ে সমগ্র ভারতের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। ভারত পাল্টা ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। এখানকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়। শিলিগুড়ি করিডোরের সুরক্ষার মূল দায়িত্ব সশস্ত্র সীমা বলের হাত থেকে নিয়ে তুলে দেওয়া হয় সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কর্পসের হাতে। শিলিগুড়িতেই যে বাহিনীর হেড কোয়ার্টার। সঙ্গে মোতায়েন করা হয় পাহাড়ি যুদ্ধে পটু মাউন্টেন স্ট্রাইক ফোর্সকে। ডোকলাম থেকে শিলিগুড়ি অবধি সড়ক প্রশস্ত করে ভারতীয় কামান, সাঁজোয়া গাড়ি ও ট্যাঙ্কের আসার ব্যবস্থা রাখা হয়। বাগডোগরা ও হাসিমারায় বিমানবাহিনীকে শক্তিশালী করা হয়। একই সঙ্গে চিকেন নেকের কাঁটা সামলাতে আন্দামানে ভারতীয় নৌসেনা ঘাঁটিকেও আধুনিক এবং শক্তিশালী করে গড়ে তোলার কাজে হাত দেয় কেন্দ্র সরকার। যাতে চিকেন নেক আক্রান্ত হলে তৎক্ষণাৎ ভারতীয় নৌবাহিনী মালাক্কা প্রণালী অবরুদ্ধ করে দিতে পারবে। মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার মাঝখানের এই প্রণালী হয়েই চিন সাগর থেকে বঙ্গোপসাগরে ও ভারত মহাসাগরে আসে চিনের বাণিজ্য এবং রণ তরীগুলি।

অশান্ত বাংলাদেশের নেপথ্যে কি ড্রাগনের নিঃশ্বাস?

আমেরিকা, রাশিয়া, চিনের পর ভারত সামরিক দিক দিয়ে বিশ্বের চতুর্থ পরাক্রমশালী শক্তি। সেখানে বাংলাদেশের গ্লোবাল ফায়ার ইন্ডেক্সে স্থান ৩৭ নম্বরে। বাংলাদেশের থেকে দুই ধাপ এগিয়ে ৩৫ নম্বর স্থানে রয়েছে মায়ানমারও। গ্লোবাল ফায়ার ইন্ডেক্স হল সেই দেশটির যুদ্ধ করার ক্ষমতার মাপকাঠি। কেবল সেনার সংখ্যা বা গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এই গ্লোবাল ইন্ডেক্সের পরিমাপ হয়না। দেশটির অর্থনীতির পরিমাপ, দেশের অর্থনীতি যুদ্ধের খরচ কতটা বহনে সক্ষম, দেশটির কূটনীতি কতটা প্রভাবশালী, দেশটার বন্ধুই বা কারা তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য বিশ্লেষণ করেই তৈরি হয় এই তালিকা।

হাসিনা বিদায়ের পর এমনিতেই বাংলাদেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশ ছোঁয়া মূল্যে জনগণের প্রাণ ওষ্ঠাগত। রিপোর্ট বলছে দেশটির তিন চতুর্থাংশ মানুষই দৈনন্দিন রুটি রুজি জোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছেন, এই অবস্থায় ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলে ভারতকে কামান, বোমা, ফাইটার জেট কিছুই ব্যবহার করতে হবে না। স্রেফ না খেতে পেয়েই মারা পড়বেন লাখোলাখো বাংলাদেশী। তাহলে এই তথ্য কি অন্তবর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুস জানেন না। আলবাৎ জানেন তিনি। কিন্তু তাঁর হাতে উগ্র ভারত বিরোধিতা ছাড়া আর কোনো তাস নেই। দেশটির উগ্র মৌলবাদী জনতা আর ভারত বিরোধিতাকে সম্বল করেই ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছেন তিনি। তাই তার সরকারি উপদেষ্টারা বা তাঁর সরকারের ব্যক্তিরা কখনো চার দিনের মধ্যে কলকাতা দখলের ডাক দিচ্ছেন তো কখনও চিকেন নেক কেটে উত্তর পূর্ব ভারতের সেভেন সিস্টার্সকে গোটা ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দিচ্ছেন। আর তাতেই পিছন থেকে চুপ করে থেকে ইন্ধন দিচ্ছেন ইউনুস। সঙ্গে কখনো শেষ হাসিনাকে ভারতের থেকে প্রত্যার্পণ চেয়ে দিল্লিকে চিঠি দিচ্ছেন কখনো আবার হিন্দুদের বিরুদ্ধে ইসলামি মৌলবাদীদের লেলিয়ে দিয়ে তাদের খুন, ধর্ষণের ঘটনায় মদত দিচ্ছেন, চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মতন হিন্দু সন্ন্যাসীদের জেলে পুরছেন। তাঁর লক্ষ্য মুখ্য উপদেষ্টার কুর্শিতে যতদিন সম্ভব টিকে থাকা। আর সে জন্যই তাঁর গলাতে উগ্র মৌলবাদীদের খুশি করতে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুর। চিনের সঙ্গে দহরম মহরম। ইউনুস ও জামাত চায় নির্বাচন পেছিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে, অন্যদিকে বিএনপি চায় আগমী ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন করে দ্রুত ক্ষমতায় আসতে। কিন্তু দুপক্ষই আওয়ামী লীগকে দূরে রাখতে চায়। তাই তাঁদের নিষিদ্ধ করেছে। দেউলিয়া হবার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা পাকিস্তানকে নিয়ে তত মাথা ব্যথা ছিল না নয়া দিল্লির। কিন্তু অপারেশন সিঁদুরের পর দেখা গেল চিন, তুরস্ক প্রমুখ পাকিস্তানকে সর্বতো সাহায্য করেছে ও করছে। নতুন করে সাহায্য করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আইএমএফের তরফে ১৩০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মার্কিন পাকিস্তানের একটি বিমান ঘাঁটি নিজের অধীনে রাখতে চাইছে। যেমন বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে বানাতে চাইছে একটি নৌঘাঁটি। কিন্তু চিনের ভূমিকা নিয়ে নয়া দিল্লি খুবই উদ্বিগ্ন। আকসাই চিন দখলের পর লাদাখের বেশ কিছু এলাকা এখনও দখল করে রেখেছে চিন। অধিকৃত কাশ্মীর দিয়ে কারাকোরাম সড়ক বানিয়ে আরব সাগরের গ্বদর বন্দর অবধি পৌঁছে গেছে চিন। শাকসগাম উপত্যকা পাকিস্তানের থেকে নিয়ে নিয়েছে। তাজিকিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ওয়াখান করিডোর দিয়ে আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে। আগেই কাঠমাণ্ডু আর মালে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এরপর জিবুতি, হামারতোতা (শ্রীলঙ্কা) ও কোকো দ্বীপে (মায়ানমার) নৌঘাঁটি বানিয়ে ভারতকে দক্ষিণেও তিনদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে। এছাড়া অরুণাচল, উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলেও লাল ফৌজ মাঝেমাঝেই সীমান্ত অতিক্রম করে ঢুকে পড়ে। এবার

ইউনুসকে ধরে বাংলাদেশের শিল্প, পরিকাঠামো ও অর্থনীতি কব্জা করে লালমণিরহাটের পুরনো বিমানঘাঁটি, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর সম্প্রসারণ প্রভৃতির আড়ালে ভারতের একদম ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলার আয়োজন শুরু হয়েছে।

গোদের উপর বিষ ফোড়া অন্তর্ঘাত:

সাম্প্রতিক অতীতে পশ্চিমবঙ্গের বুকে বিশেষত শিলিগুড়ি করিডোরে বেশ কিছু অন্তর্ঘাতের ঘটনা ঘটেছে। আবার অন্তর্ঘাতের অভিযোগে হরকত উল মুজাহিদিন, লস্কর ই তৈবা, জে এম বি প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বেশ কিছু স্লিপার সেল ধরা পড়েছে। এদের মূল ঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গ ও নমানি অসম হলেও সারা ভারতে তারা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিদিন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ফাঁকফোকর দিয়ে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে যেমন বহু হিন্দু প্রাণ হাতে ভারতে চলে আসছেন সেরকম অর্থনৈতিক কারণে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগের জন্য রোহিঙ্গা সহ প্রচুর বাংলাদেশী মুসলমান ভারতে চলে আসছেন। আবার এদের সঙ্গে মিশে ঢুকে পড়েছে ইসলামি সন্ত্রাসীরা। আই এস আই ও জামাতের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এরা ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিরাট বিপদ। গাইসাল অন্তর্ঘাত ও খাগরাগড় বিস্ফোরণে যার নমুনা আমরা পেয়েছি। ভোটের রাজনীতির কারণে এরা পশ্চিমবঙ্গে প্রশ্রয় পাচ্ছে। বাংলাদেশের জেহাদি প্রাধান্যযুক্ত চাঁপাই নবাবগঞ্জ সংলগ্ন মালদার কালিয়াচক সহ সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী, অপরাধী ও চোরাকারবারীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিবর্তন এই সন্ত্রাসবাদকে আরও শক্তিশালী করেছে। উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমান্ত সহ চিন ও পাকিস্তানের এই পঞ্চম বাহিনীর সঙ্গেও ভারতকে যুঝতে হচ্ছে। কলকাতার বুকেও লুকিয়ে থাকা পাক নাগরিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর সঙ্গে রয়েছে মায়ানমারের গৃহযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট উত্তর-পূর্বের সন্ত্রাসবাদ কবলিত পূর্ব সীমান্ত। সব মিলিয়ে শক্তিশালী সামরিক, গোয়েন্দা ও পুলিশি ব্যবস্থা ছাড়াও দেশের আভ্যন্তরীণ সুশাসন ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে উত্তেজনা হ্রাস সময়ের দাবি।

রাখাইন স্টেট : বাংলাদেশের পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর সমীপে রাখাইন প্রদেশে দীর্ঘ সংঘর্ষের পর আরাকান আর্মি মায়ানমারের সামরিক জুন্তার কাছ থেকে রাখাইন প্রদেশ প্রায় স্বাধীন করে ফেলেছে। আবার তাঁদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির। সংশ্লিষ্ট সকলে মনে করেন এই অশান্তিতে দুপক্ষকে মদত দিচ্ছে দিচ্ছে মার্কিন ও চিন। এই রাখাইন করিডোর নিয়েও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অভিবাসনের প্রভাব ভারতের উপরও পড়ছে।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫

সময়	ক্ষমতাসীন দল	মুখ্যমন্ত্রী
১৯৫২-১৯৫৬	জাতীয় কংগ্রেস	ব্রহ্ম প্রকাশ ও গুরমুখ নিহাল সিং
১৯৯৩-১৯৯৮	বিজেপি	মদনলাল খুরানা, সাহেব সিং ভার্মা ও সুষমা স্বরাজ
১৯৯৮-২০১৩	জাতীয় কংগ্রেস	শীলা দীক্ষিত (তিনবার)
২০১৩-২০১৪	আপ	অরবিন্দ কেজরিয়াল
২০১৫-২০২৪	আপ	অরবিন্দ কেজরিয়াল (তিনবার)
২০২৪-২০২৫	আপ	অতিশি মারলেনা
২০২৫	বিজেপি	রেখা গুপ্তা

২০২৫ নির্বাচন

মোট আসন ৭০ সংখ্যা গরিষ্ঠতা ৩৬

বিজেপি : ৪৮ আসন (৪৫.৮৯%)	এন.সি.পি : (০.০৬%)
আপ : ২২ আসন (৪৩.৫৭%)	নোটা : (০.৫৭%)
জাতীয় কংগ্রেস : ০ (৬.৩৪%)	বিএসপি : (০.৫৮%)
অন্যান্য : ০ (৪.০২%)	এলজেপিআরভি : (০.৫৩%)
জনতা দল : (১.০৬%)	সিপিআই : (০.০২%)
এ আই এম আই এম : (০.৭৭%)	সিপিআইএম : (০.০১%)

ব্যক্তিত্ব

ডঃ মনমোহন সিংহ: এক নিরুচ্চার বর্ণাঢ্য কর্মজীবন (১৯৩২-২০২৪)

[ডঃ মনমোহন সিংহের নাম শুনলে অনেকেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ভরিয়ে দেন। আবার কেউ কেউ তাঁর অর্থনীতিক নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, অটলবিহারী বাজপেয়ীদের মত প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী এবং নরেন্দ্র মোদীর উচ্চকিত প্রচারের মাঝে ঢাকা পড়ে যাওয়া প্রয়াত প্রচারবিমুখ ডঃ মনমোহন সিংহের রয়েছে এক বিশাল ও সুদূরপ্রসারী কর্মকাণ্ড।]

ভারতের সাড়া জাগানো প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, চর্তুদশ ও দুটি সম্পূর্ণ টার্ম অর্থাৎ ১০ বছরের প্রধানমন্ত্রী এবং দেশের একমাত্র সংখ্যালঘু ও শিখ প্রধানমন্ত্রী, ডঃ মনমোহন সিংহ ছিলেন মেধাবী ছাত্র, বিশিষ্ট অর্থনীতিক, শিক্ষাবিদ এবং কৃতবিদ্য আমলা। তাঁর রাজনীতিতে আসা, অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হওয়া তিনটিই ঘটনাচক্রে। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের শেষ পর্বে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নীতিপঙ্গুত্বের অভিযোগ থাকলেও সর্বত্র তিনি বিদ্বান, মিতবাক, মৃদুভাষী, নম্র, ভদ্র, নীতিনিষ্ঠ, নিয়মানুবর্তী, কাজ অন্ত প্রাণ, সজ্জন ব্যক্তি হিসাবে এবং সাদাসিধা জীবন যাপনের জন্য সমাদৃত। বিভিন্ন দল ও বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক নেতাদের সামলে ঐক্যমতের ভিত্তিতে দু দুটি মোর্চা সরকার চালানো ও সম্পূর্ণ করার বিরল কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর। তিনি পদ্মবিভূষণ, ইউরো মানি অ্যাওয়ার্ড, এশিয়া মানি অ্যাওয়ার্ড সহ বহু সম্মাননা পান।

মনমোহন সিংহ

চিত্তাকর্ষক সংগ্রামী জীবন (Interesting Struggling Life): অবিভক্ত ভারতের অবিভক্ত পাঞ্জাবের (বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের চকওয়াল জেলা) গাহ গ্রামে এক ক্ষত্রী শিখ সাধারণ ব্যবসায়ী পরিবারে মনমোহন সিংহের জন্ম। বাবার ছিল শুকনো ফলের ব্যবসা। অল্পবয়সে মাতৃহারা হয়ে ঠাকুমার কাছে মানুষ। তাঁর যখন ১০ বছর বয়স তাঁদের পরিবার উত্তর – পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ারে চলে যায়। তিনি প্রথমে গ্রামের সরকারি উর্দু মিডিয়াম স্কুলে ও পরে পেশোয়ারে খালসা স্কুলে পড়াশোনা করেন। সেই কারণেই মাতৃভাষা পাঞ্জাবির সঙ্গে উর্দু ভাষা এবং গুরমুখির সঙ্গে উর্দু লিপিতে তিনি স্বচ্ছন্দ ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই কষ্ট করে পড়াশোনা করতে হয়েছিল। বিদ্যুতের অভাবে সেইসময় হ্যারিকেনের আলোয় পড়াশোনা করতে হত।

তিনি যখন কিশোর তখন টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, খুন ও রক্তপাতের আবহে ১৯৪৭ এর দেশভাগ এবং দেশভাগের আবর্তে তাঁদের পরিবার উৎপাটিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তিনি কোনরকমে একটি উদ্বাস্তু বোঝাই ট্রেনে ভারতে চলে আসতে পারেন। অবশেষে তদানীন্তন সংযুক্ত প্রদেশের হলদয়ানিতে উদ্বাস্তু শিবিরে তাঁদের পরিবারের সংযোগ ঘটে। এরপর তাঁদের পরিবার পাঞ্জাবের অমৃতসরে স্থানান্তরিত হলে তিনি সেখানকার কটন কলেজে ভর্তি হন। প্রবল অর্থাভাবের মধ্যে মনমোহন সিংহকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়।

এরপর হোশিয়ারপুরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'বারই পরীক্ষায় প্রথম হয়ে অর্থনীতিতে বিএ (১৯৫২) ও এমএ (১৯৫৪) পাশ করেন। তারপর যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট জনস কলেজ থেকে অর্থনীতিতে ট্রাইপস হন (১৯৫৭) এবং অ্যাডাম স্মিথ পুরস্কার অর্জন করেন। তারপর দেশে ফিরে চণ্ডীগড়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের নবগঠিত ক্যাম্পাসে কয়েক বছর অধ্যাপনা করে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নাফিড কলেজ থেকে অর্থনীতিতে ডিফিল (১৯৬০ – '৬২) করেন। কেমব্রিজে থাকাকালীন স্বনামধন্য অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসন ও অধ্যাপক নিকোলাস কালডর এবং তাঁদের কেইনসীয় অর্থনীতির বামপন্থী ব্যাখ্যা মনমোহন সিংহের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবন (Illustrious Career) :

* ১৯৫৯ ও ১৯৬৩: রিডার, অর্থনীতি বিভাগ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়
* ১৯৬৩ – ১৯৬৫: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়
* ১৯৬৬ – ১৯৬৯: সুইজারল্যান্ডের জেনিভাতে রাষ্ট্রপুঞ্জের United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) এ কর্মরত
* ১৯৬৯ – ১৯৭১: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিকস
* ১৯৭১: কেন্দ্র সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উপদেষ্টা
* ১৯৭২ – ১৯৭৬: কেন্দ্র সরকারের অর্থ দপ্তরের প্রধান উপদেষ্টা
* ১৯৭৬ – ১৯৮১: কেন্দ্র সরকারের অর্থ দপ্তরের সচিব
* ১৯৮২ – ১৯৮৫: রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর
* ১৯৮৫ – ১৯৮৭: যোজনা কমিশনের (Planning

Commission) ভাইস চেয়ারম্যান

* ১৯৮৭ - ১৯৯০: সেক্রেটারি জেনারেল, সাউথ কমিশন, জেনিভা, সুইজারল্যান্ডে
* ১৯৯০: প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের বিদেশ নীতি সংক্রান্ত উপদেষ্টা
* ১৯৯১: চেয়ারম্যান, ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন (UGC)
* ১৯৯১ - ১৯৯৬: কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের অর্থমন্ত্রী
* ১৯৯১ – ২০১৯: অসম থেকে কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ
* ১৯৯৮ – ২০০৪: রাজ্যসভার বিরোধী নেতা
* ২০০৪ – ২০১৪: দু দুটি পর্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন 'ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়ান্স' (UPA) জোট সরকারের সফল পরিচালনা
* ২০১৯ – ২০২৪ এপ্রিল (অবসৃত): রাজস্থান থেকে কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ

১৯৯১, ভারতীয় অর্থনীতির জলবিভাজিকা (1991, The Watershed of Indian Economy): তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে ১৯৯১-তে হত্যার পর জুনে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ২৪৪ টি আসন পেয়ে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়েও বৃহত্তম দল হিসাবে কয়েকটি দলের সমর্থন নিয়ে সরকার গড়ে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কারণে বানপ্রস্থে চলে যাওয়া পিভি নরসীমা রাওকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। দেশের অর্থনীতির হাল যথেষ্ট খারাপ ছিল। পিভি রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর আইজি প্যাটেলকে অর্থমন্ত্রী করতে চাইলে তিনি রাজি হলেন না। এরপর ভরাডুবির সম্মুখে পৌঁছনো ভারতীয় অর্থনীতিকে বাঁচাতে রাজনীতির বৃত্তের বাইরে থাকা অর্থনীতিবিদ ডঃ মনমোহন সিংহকে এই গুরুভার দেওয়া হয়।

মনমোহন সিংহ যখন দেশের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন তখন ভারতের রাজস্ব ঘাটতি (Fiscal Deficit) জিডিপির ৮.৫%, পরিশোধের বাকি (Balance of Payment) বিপুল, চলতি হিসাবের ঘাটতি (Current Account Deficit) জিডিপির ৩.৫%। বিদেশি মুদ্রার (Foreign Reserve) ভাণ্ডার মাত্র ১০০ কোটি ডলার অর্থাৎ খনিজ তেল, ইস্পাত, ইলেক্ট্রনিক, ইলেক্ট্রিক্যাল ও কম্পিউটারের যন্ত্রপাতি, সার, ওষুধ, ভোজ্য তেল, ডাল ইত্যাদি আমদানির উপর নির্ভরশীল ভারতের মাত্র দু'সপ্তাহ আমদানি করার ক্ষমতা ছিল। এমতাবস্থায় ভারতের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির এক প্রভাবশালী রূপকার তিনি পুঁজিবাদের পথ ধরে দেশের অর্থনীতির বিনিয়ন্ত্রণের (Deregulation) দাওয়াই বাতলালেন। তাঁকে সমর্থন জানালেন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত বাণিজ্যমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম। কিন্তু কংগ্রেসের বাদবাকি নেতৃত্বের মধ্যে দ্বিধা এবং / অথবা বিরোধিতা ছিল। শেষমেশ প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসীমা রাও অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংহকে প্রয়োজনীয় অনুমতি দেন। বাকিটা ইতিহাস।

২৪ জুলাই ১৯৯১ এবং পরবর্তী বছরগুলিতে মনমোহন সিংহ যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেন তাতে অর্থনীতিতে বিনিয়ন্ত্রণ ও উদারীকরণ (Liberalization) ঘটিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে বিশ্ব অর্থনীতির কাছে উন্মুক্ত (Open) করেন এবং বিশ্বায়িত পুঁজিবাদী নব উদার অর্থনীতির (Globalized Capitalist Neo Liberal Economy) প্রবাহে সামিল করেন। অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে আনেন, এতদিনকার লাইসেন্স ও পারমিট রাজের বিলোপ ঘটান, অর্থ ব্যবস্থার মধ্যেকার লাল ফিতের ফাঁস ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে আঘাত হানেন, আমদানি শুল্ক কমিয়ে দেন, অলাভজনক পাবলিক সেক্টর সংস্থার বিলোপ (Liquidation) ও বেসরকারিকরণের (Privatization) পথ খুলে দেন, সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment or FDI) কে উৎসাহিত করেন। এরফলে ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, ব্যাক্তি উদ্যোগ বৃদ্ধি পায়, শেয়ার বাজার চাঙ্গা হয়, সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নতি ঘটে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। মুম্বাইয়ের দুর্নীতিগ্রস্ত দালালদের নিয়ন্ত্রিত বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের একের পর এক কেলেঙ্কারি থেকে শেয়ার বাজারকে মুক্ত করতে স্বয়ংক্রিয় ও বিশেষজ্ঞ নির্ভর, সরকার পরিচালিত 'ন্যাশালাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এন.এস.ই.)' প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৯২-তে। চালু করেন —ডি'ম্যাট অ্যাকাউন্ট এবং সমস্ত লেনদেন স্বচ্ছভাবে কম্পিউটারের পর্দায়। মধ্যবিত্তের কাছেও শেয়ার বাজার উন্মুক্ত হয়।

আর্থিক বৃদ্ধির (Economic Growth) হার ৭ – ৯% এ পৌঁছয়। ঘাটতি সামলাতে বিক্রি করে দেওয়া রিজার্ভ ব্যাংকের সোনা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়, বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়, শিল্পে প্রতিযোগিতা বাড়ে, বাড়ে বিদেশি লগ্নি ও প্রযুক্তি। জাতীয় কংগ্রেস দাবি করে যে মনমোহন সিংহ অর্থ ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার আগে ভারত ছিল বিশ্বের ১০ম বৃহত্তম অর্থনীতি যা তাঁর সময়ে হয়ে ওঠে প্রায় দুই লক্ষ কোটি ডলারের (Trillion Dollars) বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। তাঁর ১০ বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে গড় আর্থিক বৃদ্ধি ছিল ৭.৭% যা সর্বকালীন রেকর্ড। ২০০৭-'০৮ এর বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকটের সময়ে ভারতীয় অর্থনীতি যথেষ্ট মজবুত ছিল। আবার ১৯৯২-তে সরকারি নিয়মনীতির ফাঁক গলে একটি বড় আর্থিক দুর্নীতি প্রকাশিত হলে মনমোহন সিংহ পদত্যাগ করতে চান। প্রধানমন্ত্রী পিভি তাঁকে নিরস্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রিত্ব এবং আর্থিক সংস্কার (Prime Ministership and Economic Reforms): তাঁর অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন উদার আর্থিক সংস্কার, পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী বিজেপির অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময়কার পুঁজিবাদী শিল্পপতিকেন্দ্রিক 'ইন্ডিয়া সাইনিং' পুঁজিবাদী আর্থিক নীতি এবং দেশব্যাপী বাজার অর্থনীতিকে (Market Economy) আরও সহজে ছড়িয়ে দিতে 'সোনালী চতুর্ভুজ (Golden Quadrilateral)' নির্মাণ এবং সড়ক সহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি অক্ষুণ্ণ রাখেন। এরপর তিনি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির সংস্কারের কাজে হাত দেন। শিল্প বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। কৃষকদের ঋণ ভার মকুবের এবং ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (Minimum Support Price or MSP) নির্ধারণে উদ্যোগ নেন। সেলস ট্যাক্সের

পরিবর্তে সমস্ত দেশে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স (VAT) প্রবর্তন করেন।

প্রধানমন্ত্রিত্ব এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি (Prime Ministership and Welfare Programmes): এক্ষেত্রে ইউপিএ চেয়ারপার্সন সনিয়া গান্ধী এবং অভিজিৎ সেন, জা দ্রেঁজ, অরুণা রায়, মাধব গ্যাডগিল, রামদয়াল মুন্ডা প্রমুখ যোজনা কমিশন সদস্য এবং 'ন্যাশনাল অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলে'র পরামর্শদাতাদের অবদান অনস্বীকার্য। ২০০৫-এ এল একই সঙ্গে গ্রামীণ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণের অভিনব প্রকল্প National Rural Employment Guarantee Act (NREGA, পরবর্তীতে MGNREGA)। সাধারণের ভাষায় ১০০ দিনের কাজের কর্মসূচি। একই বছর পাঁচ লক্ষ গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মী Accredited Social Health Activists (ASHA) দের সন্নিবেশিত করে লাগু হল সার্বিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের National Rural Health Mission (NRHM, পরবর্তীতে NHM) কর্মসূচি। এল জনগণের অধিকার অর্জনের Right to Information Act (RTI)। ২০০৬-এ এল জনজাতি ও বনবাসীদের অধিকার রক্ষায় Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act। ২০০৬ এই AIIMS, IITs, IIMs প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে ২৭% ওবিসি সংরক্ষণ আনা হল। ২০০৯ এ 'সর্ব শিক্ষা অভিযান' কর্মসূচিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি Right to Education Act (RTE), Right of Children to Free and Compulsory Education Act প্রবর্তন করে শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হল। Midday Meal Scheme কে প্রসারিত করা হল। নতুন আটটি IIT তৈরি হল।

২০০৯-এ Unique Identification Authority of India (UIDAI) স্থাপন করে প্রতিটি নাগরিকের জন্য Unique Identification Number এবং সর্বত্র ব্যবহারের জন্য Aadhaar (Multi Utility Card) এর প্রবর্তন। ২০১৩-তে খাদ্য ও জমি সুরক্ষার ক্ষেত্রে National Food Security Act (NFSA) এবং Right to Fair Compensation & Transparency & Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act।

জম্মু ও কাশ্মীরের পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়। উত্তর পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদকে প্রশমিত করা হয়। ২০০৮-এ মুম্বাই বিস্ফোরণের পর জাতীয় স্বার্থে National Intelligence Agency (NIA) গঠন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রিত্ব ও নতুন বিদেশ নীতি (Prime Ministership and New Foreign Policy): নতুন বিদেশ নীতিতে খুবই উল্লেখযোগ্য তাঁর ভূমিকা পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ জিগির বন্ধ করে শান্তি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা। চিনের সঙ্গে সম্পর্কেরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। চিনা প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে আসেন। নাথু লা সীমান্ত বাণিজ্যের জন্য খুলে দেওয়া হয়। আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কেরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক অটুট রেখে ইজরায়েল এর সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করা হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ২০০৯ এ রাশিয়া, চিন, ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা কে নিয়ে BRICS গঠিত হয়। ন্যাটো কর্তৃক লিবিয়ায় হানার বিরোধিতা করা হয়।

সোভিয়েতের ভাঙ্গনের পর বিশ্ব জুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এক বিশ্ব (Unipolar World) গঠনের পর নেহরুর আমল থেকে এতদিন চলে আসা নির্জোট (Non – Aligned Movement or NAM) বিদেশ নীতি থেকে সরে এসে ভারত বর্তমান দুনিয়ার একমেবাদ্বিতীয়ম কর্তৃত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝোঁকে। যার চূড়ান্ত রূপ পায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি (US – India Civil Nuclear Agreement)। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ভারতের অসামরিক ও সামরিক পারমাণবিক কেন্দ্রগুলির পৃথকীরণ, অসামরিক ক্ষেত্রে International Atomic Energy Agency (IAEA) সংস্থার নজরদারি ও নিরাপত্তা এবং মার্কিন সংস্থাগুলির থেকে পারমাণবিক জ্বালানি সহ সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি ক্রয়ের বিষয়গুলি থাকে। ২০০৫ থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পর ২০০৮-এ চুক্তি চূড়ান্ত হয়। বামপন্থী দলগুলি প্রথম থেকেই এই চুক্তির বিরোধিতা করে। মনমোহন সিংহ একসময় পদত্যাগ করতে চান। অন্যরা নিরস্ত করেন। চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে বামপন্থীরা ইউপিএ সরকারের থেকে সমর্থন তুলে নেন। মনমোহন সিংহ তা সত্ত্বেও ওই চুক্তিতে স্থির থাকেন। সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবের মুখে তাঁর সরকার টিকে যায়। ২০০৯-এ লোক সভা নির্বাচনে (কংগ্রেস ২০৬ আসন, জোট ২৬২ আসন) কংগ্রেস ২০০৪-এ লোকসভা নির্বাচনের (কংগ্রেস ১৪৫ আসন, জোট ২১৮ আসন) থেকে বেশি আসন পেয়ে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার গঠন করে।

প্রদীপের নিচে অন্ধকার (Darkness under the Lamp): ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটলেও তাদেরই কেবল সুযোগ থাকায় উন্নতি ঘটে ধনী ও শিল্পপতিদের। মুলত ভারতীয় বড় ব্যবসায়ী - দালাল এবং কর্পোরেট শিল্প – বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটলেও নিজস্ব শিল্প, কৃষি ও কর্মস্থানের বিকাশ এবং বুনিয়াদি অর্থনীতি ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর উন্নতি না ঘটায় বিপুল সংখ্যক নিম্নবিত্ত ও দরিদ্রদের কষ্ট লাঘব হয়নি। দেশে বিদেশে লগ্নি, যাতায়াত ও ব্যবসা করার সুযোগ ইত্যদির সুফল সীমিত সংখ্যক ধনী ও উচ্চবিত্তর করায়ত্ব থেকেছে। সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি হ্রাসের সুযোগ নিয়ে ক্রমশ দেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে পারিবারিক (Crony) ফাটকা পুঁজির (Lumpen Capital) অধীশ্বররা। ফলে একের পর এক তহবিল তছরুপ (Money Laundering) ও বিদেশে অবৈধ অর্থ পাচার (Ilegal Fund Transfer), নিত্য নতুন আর্থিক কেলেঙ্কারি (Financial Scam), শেয়ার বাজার প্রথমে ফাঁপিয়ে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করে তারপর ধ্বস নামিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, ব্যাংক থেকে বিপুল ঋণ নিয়ে শোধ না করা, সাইবার প্রতারণা ও জালিয়াতি, বিভিন্ন রকম আর্থিক দুর্নীতি ও কারচুপির জন্ম হয় যা পরবর্তী মোদী – শাহ জমানায় চূড়ান্ত রূপ পায় এবং জনসাধারণকে সর্বস্বান্ত করে দিতে থাকে।

নেহরুর মিশ্র অর্থনীতির (Nehruvian Mixed Economy) যুগের রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তারকারী কতিপয় বৃহৎ শিল্পপতি, বিদেশি বহুজাতিক ও কর্পোরেট সংস্থাগুলি এবার রাষ্ট্রের পরিচালক হয়ে ওঠে। ফলে তাদের লুঠ, মুনাফা, শোষণ ও শ্রমিক বিরোধিতা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। দ্রব্যমূল্য বেড়েই চলে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে। আর্থিক বৈষম্য প্রকট হয়। বহু লাভজনক সরকারি সংস্থাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। বহু মানুষ কাজ হারান। যে দ্রব্য দেশেই উৎপন্ন হত তার উৎপাদন বন্ধ করে অনেক বেশি দামে বিদেশ থেকে আমদানি করা হতে থাকে।

নতুন অর্থনীতি প্রয়োগের এক বছরের মধ্যে ১৯৯২-তেই ঘটে ১৮০ কোটি ডলারের একটি বড় আর্থিক কেলেঙ্কারি। এরপর এই সরণী বেয়ে টু জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি, কমনওয়েলথ গেম কেলেঙ্কারি, কয়লার ব্লক বণ্টন নিয়ে বড়সড় দুর্নীতি .....। তাই বোধহয় ইতিহাসের পরিহাস এই যে নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম পর্বের সবচাইতে বড় আর্থিক কেলেঙ্কারি নোটবন্দী (Demonetization) নিয়ে তাঁকে বলতে হয়ঃ "An organized loot and legalized plunder, a monumental mismanagement and disaster, an underestimate not an overestimate. The ordinary people have suffered as a result of this imposition on the country overnight by the PM."

অন্যদিকে তিনি নকশাল মতবাদকে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রধান বিপদ হিসাবে আভিহিত করে মাওবাদী কার্যকলাপ দমনের উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালে মধ্য, দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের ৯৫ টি জেলায় আধা-সামরিক বাহিনীর সম্মিলিত অভিযান Operation Greenhunt কে সম্মতি দেন। তার আগেই ২০০৫-এ সেখানে চালু হয়ে গেছে 'সালওয়া জুডুম' এর তাণ্ডব। তাঁর সময়েই উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসবাদকে সামাল দিতে কালা কানুন Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) কে আরও কঠোর (UAP Amendment Act 2004) করা হয়।

রতন নাভাল টাটা : জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক উড়ান (১৯৩৭ – ২০২৪)

টাটা শিল্প – বাণিজ্য গোষ্ঠীর উত্থান: ইতিহাস জানাচ্ছে সপ্তম শতাব্দীতে পারস্যে আরব ইসলামি বিজয়ের পর ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে জোরাস্ট্রান ধর্মাবলম্বীদের একটি অংশ ভারতের গুজরাত ও বোম্বাইতে আশ্রয় নেন এবং পার্সি নামে পরিচিত হন। ক্ষুদ্র জনসংখ্যা হলেও তারা শিল্প বাণিজ্যে সফল হন এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ বিভিন্ন জনহিতকর ও উন্নয়নমূলক কাজে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। একইসময়ে বাংলার ব্রিটিশ সহযোগী মুৎসুদ্দি বানিয়া, মহাজন, জমিদার ও বিশিষ্ট শিল্পপতি দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪ – ১৮৪৬) যখন চিনে আফিম রপ্তানি করে ফুলে ফেঁপে উঠে উত্তর কলকাতায় একের পর এক গণিকালয় প্রতিষ্ঠা করছেন এবং বেলগাছিয়ার বাগান বাড়িতে জাঁকজমকপূর্ণ নৈশ মেহফিলে ও পরে বিলেতের হোটেলে ব্যয়বহুল পার্টি ইত্যাদির আয়োজন করে সমস্ত অর্থ উড়িয়ে দিচ্ছেন, তখন একইভাবে চিনে আফিম রপ্তানি করে বিপুল মুনাফা করা পার্সি ব্যবসায়ী জামশেদজী জিজিবয় (১৭৮৩ – ১৮৫৯) ও তাঁর স্ত্রী বোম্বাই তে হাসপাতাল নির্মাণ ও পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য তখনকার মূল্যের এক কোটি টাকা দান করেন।

পরবর্তী প্রজন্মের আরেক পার্সি ব্যাবসায়ী, শিল্পপতি ও দাতা জামশেদজী টাটা (১৮৩৯ – ১৯০৪) বস্ত্র কারখানা, হোটেল ও চিনে রপ্তানি ব্যবসায় সফল হয়ে বিখ্যাত ভুতাত্বিক প্রমথনাথ বসুর (১৮৫৫ – ১৯৩৪) পরামর্শে সিংভুমের বিশাল খনিজ ভাণ্ডারের উপর নির্ভর করে সাকচিতে প্রথম স্বদেশী ইস্পাত কারখানা গড়ার উদ্যোগ নেন। জামশেদজী ছিলেন টাটা শিল্প – বাণিজ্য গোষ্ঠীর প্রথম চেয়ারম্যান (১৮৬৮ – ১৯০৪)। গোষ্ঠীর পরবর্তী চেয়ারম্যান জামশেদজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র দোরাবজী টাটার সময়ে (১৯০৪ – '৩৪) ১৯০৭-এ টাটার ইস্পাত কারখানাটি (টিসকো, ২০০৫ থেকে টাটা স্টিল) গড়ে ওঠে এবং ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন বাধার মধ্যে ১৯১১ থেকে পিগ আয়রন এবং ১৯১২ থেকে ইস্পাত উৎপাদন শুরু হয়। ১৯১৯-এ সাকচির ইস্পাত কারখানাটিকে ঘিরে উদীয়মান নগরীর নাম হয় জামশেদপুর। দোরাবজীর পর চেয়ারম্যান হন তাঁর পিসতুতো ভাই নাওরজি সাকতাওয়ালা (১৯৩২ – '৩৮), তারপর দোরাবজীর খুড়তুতো ভাই জে আর ডি টাটা (১৯৩৮ – '৯১)।

দক্ষ পাইলট জে আর ডি – র হাত ধরে ১৯৩২-এ প্রথম স্বদেশী টাটা এয়ারলাইনসের সুচনা। ১৯৪৬-এ এটির নামকরণ হয় এয়ার ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল। পরে ১৯৫৩-তে ভারত সরকার এটি অধিগ্রহণ করে। নাম হয় এয়ার ইন্ডিয়া। ১৯৪৫-এ জামশেদপুরে প্রথম স্বদেশী লোকোমোটিভ ইঞ্জিন তৈরি করে টেলকো। ১৯৫৪ থেকে সেখানে মার্সিডিজ – বেঞ্জের সাহায্যে প্রথম স্বদেশী ভারী ট্রাক তৈরি শুরু হয়। ২০০৩ থেকে টেলকোর নাম হয় টাটা মোটরস। এরপর জামশেদপুর ছাড়াও পন্থনগর, লখনউ, সানন্দ, ধাড়ওয়াড় ও পুনেতে এবং বিদেশে ইউরোপ সহ ছটি দেশের কারখানায় ট্রাক ছাড়াও বাস, ভ্যান, এস ইউ ভি, যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি উৎপাদন হতে থাকে। ততদিনে খাদ্যের অঙ্গাঙ্গী লবণ থেকে গৃহ আচ্ছাদনের মেটালিক শিট, নিত্য প্রয়োজনীয় কোদাল – বেলচা – বালতি থেকে পর্দা – ঘড়ি – গয়না প্রয়োজনীয় প্রতিটি দ্রব্যের সঙ্গে টাটা ব্র্যান্ডের নাম, উৎকর্ষ ও বিশ্বাসযোগ্যতা তামাম ভারতীয়র মননের গভীরে পৌঁছে গেছে। এর সঙ্গে টাটা সংস্থায় কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা এবং

বিভিন্ন সমাজকল্যাণ প্রকল্পে উদার দাতা হিসাবে পুঁজিবাদী শিল্প - বাণিজ্য গোষ্ঠীগুলির মধ্যে টাটা শিল্প - বাণিজ্য গোষ্ঠী এক ব্যতিক্রমী সুনাম, ঐতিহ্য ও পরম্পরার জন্ম দিল। এর সঙ্গে সঙ্গে টাটাদের উদ্যোগে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স (**IISc**), টাটা মেমোরিয়াল সেন্টার (**TMC**), টাটা ইন্সটিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (**TIFR**) প্রভৃতি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গবেষণার উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলিও গড়ে ওঠে।

টাটা শিল্প - বাণিজ্য গোষ্ঠীর রতন: জামশেদজী টাটার কনিষ্ঠ পুত্র রতনজী টাটা নিঃসন্তান ছিলেন। বৃহৎ পরিবারের মধ্যে থেকে নাভাল টাটাকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। নাভাল টাটা ও সুনি কমিশারিয়েটের সন্তান রতন নাভাল টাটা। রতনের পর জন্মায় তাঁর ভাই জিমি টাটা। রতনের যখন ১০ বছর বয়স তখন তাঁর পিতা মাতার বিচ্ছেদ হয়। এটি বালকের মধ্যে এমনই ক্ষত সৃষ্টি করেছিল যে তিনি সারাজীবন অকৃতদার রইলেন। রতনের সৎমাতা সিমোনে নাভাল (টাটা)-র একটি পুত্র হয় - নোয়েল টাটা। বম্বেতে জন্মানো রতনকে কার্যত মানুষ করেন তাঁর ঠাকুমা রতনজী টাটার স্ত্রী নভজভাই শেট (টাটা)। রতনের শিক্ষা বম্বের ক্যাম্পিয়ন এবং ক্যাথেড্রাল অ্যান্ড জন কোনান স্কুলে, তারপর সিমলার বিশপ কটন স্কুলে। স্নাতক হন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যু ইয়র্কের রিভারডেল কাউন্টি স্কুল থেকে ১৯৫৫-তে। তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক হয়ে ১৯৬২ তে পারিবারিক টাটা গ্রুপে কর্মজীবন শুরু করেন।

রতন টাটা

টিসকোর জামশেদপুর কারখানার একদম শপ ফ্লোর স্তর থেকে উঠে এসে তিনি ১৯৭০-এ টাটা গ্রুপের নেলকোর ম্যানেজার হন। নেলকোর উন্নতি ঘটান, যদিও পরবর্তীতে নেলকোকে সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। এখন নেলকো একটি শীর্ষস্থানীয় স্যাটেলাইট পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা। এরপর রতন টাটা হাভারড ম্যানেজমেন্ট স্কুল থেকে অ্যাডভান্সড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম করে জোন্স অ্যান্ড এমন্স আরকিটেকচার সংস্থায় যোগ দিয়ে লস এঞ্জেলসে থিতু হন। কিন্তু তাঁর ঠাকুমার ডাকে দেশে ফিরে এসে টাটা গ্রুপের কাজে যুক্ত হন। ১৯৯১-তে টাটা শিল্প - বাণিজ্য গোষ্ঠীর মূল দুটি সংস্থা টাটা গ্রুপ ও টাটা সন্স এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পরবর্তী চেয়ারম্যান সাইরাস মিস্ত্রির অপসারণের পর্যায়ে তিনি পুনরায় টাটা গ্রুপ ও টাটা সন্স - র চেয়ারম্যান (অন্তর্বর্তী)এর দায়িত্ব পালন করেন। তারপর নির্বাচিত চেয়ারম্যান নটরাজন চন্দ্রশেখরকে দায়িত্ব অর্পণ করেন। আমৃত্যু টাটা গ্রুপ ও টাটা সন্স-র এমেরিটাস চেয়ারম্যান এবং স্যার দোরাবজী টাটা ট্রাষ্ট এবং স্যার রতনজী টাটা ট্রাষ্ট - টাটাদের দুটি প্রধান দাতা সংস্থার চেয়ারম্যান ছিলেন।

১৯৯১-তে রতন টাটা যখন টাটা গোষ্ঠীর দায়িত্বভার নেন তখন টাটার অধীনস্থ স্বায়ত্বশাসন পাওয়া সংস্থাগুলির প্রধানদের তরফ থেকে জোরালো বাধা আসে। কারণ রতন টাটা অধীনস্থ সমস্ত সংস্থাগুলির কর্তাদের মূল গ্রুপ অফিসে ব্যবসার অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত রাখা, সংস্থাগুলির মুনাফার একটা অংশ টাটা ব্র্যান্ডিং ও সমাজ কল্যাণে ব্যয় করা, সব পদে অবসরের বয়স নির্দিষ্ট করা প্রভৃতি সংস্কারগুলির সঙ্গে প্রতিভাবান তরুণদের তুলে আনা, নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছিলেন। নিজে সংস্থাগুলির জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন; সারাক্ষণ কাজের মধ্যে থাকতেন; পরিস্থিতি বুঝতে ও কর্মীদের উৎসাহ দিতে শপ ফ্লোর অবধি চলে যেতেন। প্রচার বিমুখ ছিলেন। মুম্বাই এর একটি মাঝারি মানের ফ্ল্যাটে অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। অন্যদিকে ১৯৯১-তে তিনি যখন টাটা শিল্প - বাণিজ্য গোষ্ঠীর হাল ধরলেন তখন ভারতীয় অর্থনীতি উদারীকরণ ঘটিয়ে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির অঙ্গে সংপৃক্ত হতে শুরু করায় ব্যবসার সমূহ পতনের বিপদ ছিল। পাশাপাশি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বজুড়ে ব্যবসাকে বাড়ানোর সুযোগও ছিল। আমরা দেখতে পেলাম সমস্ত বাধাবিপত্তি পেরিয়ে রতন টাটা এমন এক শিল্প - বাণিজ্য সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন যা রূপকথাকে হার মানায়।

রতন টাটার শিল্প - বাণিজ্য সাম্রাজ্য: একটি পরিসংখ্যান বলছে তিনি যখন ১৯৯১-তে সংস্থার চেয়ারম্যান হন তখন টাটা শিল্প - বাণিজ্য গোষ্ঠীর মূল্য ছিল চার বিলিয়ন বা ৪০০ কোটি ডলার। ২০১২ তে তিনি চেয়ারম্যানের পদ ছাড়ার সময় মূল্যায়ন দাঁড়ায় ৭৭ বিলিয়ন বা ৭৭০০ কোটি ডলার। ২০২৪-এ এমেরিটাস চেয়ারম্যান হিসাবে চলে যাওয়ার সময় দাঁড়ায় ৪০০ বিলিয়ন বা ৪০ হাজার কোটি ডলার। তাঁর নেতৃত্বে ১০০ - র বেশি সংস্থা ১০০ - র বেশি দেশে ব্যবসা করছিল। ২০২৩ - '২৪ আর্থিক বর্ষে সংস্থার আয় ছিল ১৬৫ বিলিয়ন বা ১৬৫০০ কোটি ডলার। তাঁর সময়ে ইউরোপ, ভারত ও দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়ার উৎপাদন কেন্দ্রগুলি মিলিয়ে টাটা স্টিল বিশ্বের সবচাইতে বৃহৎ ইস্পাত নির্মাণ সংস্থা। তাঁর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিযোগিতায় নেমেও টাটা সফল। বর্তমানে টাটা গ্রুপের লাভ্যাংশের অর্ধেকের বেশি আসে টাটা কনসাল্টিং সার্ভিস (**TCS**) থেকে। ভারতের স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত হয়েছে টাটার ২৭ টিরও বেশি বড় সংস্থাঃ (১) **Tata Steel,** (২) **Indian Hotels,** (৩)**Tata Chemicals,** (৪) **Tata Motors,** (৫) **Tata Power,** (৬) **TCS,** (৭) **Tata Elxsi,** (৮) **Tata Energy,** (৯) **Tata Communication,** (১০) **Tata Consumer Products,** (১১)**Titan,** (১২) **Voltas,** (১৩) **Tata Coffee,** (১৪) **Tata Investment,** (১৫) **Jaguar Land Rover,** (১৬) **Tata Autocomp Systems Ltd.,** (১৭)

Trent, (১৮) **Nelco,** (১৯) **Tata Advanced System,** (২০) **Tata Dawoo,** (২১) **Tata Hispana,** (২২) **Tata Hitachi Construction Machinery,** (২৩) **Tata Housing,** (২৪) **Tata Metaliks,** (২৫) **Rallis India,** (২৬) **Tata Housing,** (২৭) **Tata Capital** ইত্যাদি। এছাড়াও বিনিয়োগ করেছিলেন **Snapdeal, Tata CLiQ, Tata Neu, Teabox, CashKaro, Ola Electrics, Xiaomi, Nestaway, Zenify, Paytm, CarDekho, Urban Company, FirstCry, Zivame, Urban Ladder, Abra, Lenskart** প্রভৃতি ৪০ টির বেশি স্টার্ট আপ কোম্পানিতে। তাঁর সময়ে টাটা শিল্প - বাণিজ্য গোষ্ঠী বৃহৎ ভারতীয় শিল্প - বাণিজ্য গোষ্ঠী থেকে হয়ে গেল বিশ্বময় শিল্প ও বাণিজ্য করা একটি বৃহৎ ভারতীয় শিল্প - বাণিজ্য গোষ্ঠী।

তাঁর নেতৃত্বে ১৯৯৮-এ টাটা মোটরস তৈরি করল প্রথম স্বদেশে তৈরি ডিজেল চালিত গাড়ি টাটা ইন্ডিকা এবং ২০০৮-এ সাধারণের সাধ্যের মধ্যে মাত্র এক লাখ টাকা মূল্যের স্বপ্নের গাড়ি টাটা ন্যানো তৈরির কাজ শুরু হল। এই দুটি প্রকল্প যথাক্রমে প্রযুক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে ধাক্কা খেলেও পরবর্তীতে টাটা - সুমো, সাফারি, স্করপিও, পাঞ্চ, নেক্সন, হ্যারিয়ার প্রভৃতি এস ইউ ভি সেক্টরে টাটা সফল। টাটা - তিয়াগো ও অ্যালট্রজ হ্যাচব্যাক মডেল; টাটা টাইগর সাব কম্প্যাক্ট সেডান জনপ্রিয়তা পায়। এরপর টাটা মোটরস ২০১৯ থেকে প্রস্তুত করতে শুরু করে প্রথম স্বদেশে প্রস্তুত ইলেকট্রিক গাড়ি নেক্সন ইভি, পাঞ্চ ইভি, টাইগর ইভি সিরিজ। এছাড়াও যৌথভাবে তৈরি করতে থাকে Tata Dawoo ট্রাক; Tata Marcopolo Bus; Tata Hispana, Tata Fiat, Tata Hundai গাড়ি। ইতিমধ্যে ২০০৮ এর মহামন্দায় মার্কিন বৃহৎ অটোমোবাইল সংস্থা ফোর্ডের দেউলিয়া হওয়ার মুখে ২.৩ বিলিয়ন ডলারে রতন টাটা কিনলেন ফোর্ডের ব্রিটেন কেন্দ্রিক দুটি আইকনিক ব্র্যান্ড - জাগুয়ার এবং ল্যান্ড রোভার। ২০০০-এ অধিগ্রহণ করেছিলেন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম চা উৎপাদন কোম্পানি টেটলি-কে। ২০০৭ এ অধিগ্রহণ করেছিলেন ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্রিটিশ - ডাচ ইস্পাত সংস্থা কোরাসকে ১৩ বিলিয়ন ডলারে। তার এরকম প্রায় ৬০ টি অধিগ্রহণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেয়ু, সেন্ট জেমস কোর্ট, ব্রিটিশ সল্ট, এইট ও ক্লক, ন্যাটস্টিল, টাইকো। ব্রিটেনের সবচাইতে বেশি সংখ্যক কর্মী কাজ করেন টাটার সংস্থাগুলিতে। দেশ বিদেশে সব মিলিয়ে কর্মীর সংখ্যা ১০ লক্ষের বেশি। ভিস্তারা ও এয়ার এশিয়া ইন্ডিয়া আগেই নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়েছিল, এরপর ২০২২ সালে ১৮০০০ কোটি টাকায় ভারত সরকারের থেকে কিনে নেওয়া হল ধুঁকতে থাকা এয়ার ইন্ডিয়াকে। গুজরাতের ভদোদরায় এয়ারবাসের সঙ্গে টি এ এস এল **Air - 295** মালবাহী যুদ্ধ বিমান তৈরির এবং অসমের মরিগাঁওতে টি ই পি এল এর সেমিকন্ডাক্টার চিপ তৈরির কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়।

দেশহিতৈষী দানশীল রতন টাটা: রতন টাটা দিল্লির শিখ বিরোধী দাঙ্গা, মুম্বাই এর তাজমহল হোটেল হামলা, কোভিড অতিমারি বিভিন্ন সংকটের সময় আক্রান্ত এবং সাধারণ মানুষের পাশে উদার হাতে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রামীণ উন্নয়নে বিপুল পরিমাণ দান করেন। দরাজ হাতে দান করেন দেশ বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়কেই দিয়েছিলেন ৫০ মিলিয়ন বা পাঁচ কোটি ডলার এবং সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন **Tata Innovation Center**। আই আই টি মুম্বাইকে দিয়েছিলেন ৯৫ কোটি টাকা এবং সেখানে গড়ে তুলেছিলেন **Tata Centre for Technology & Design (TCTD)**। ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতেও স্থাপন করেন TCTD। IISc তে প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্ব মানের **Indian Centre for Neuro Sciences। Tata Memorial Hospital, Mumbai (TMH)** এর উন্নত মানের ক্যানসারের চিকিৎসাকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেন। পশুদের কল্যাণে **Dog Spot** এবং বয়স্কদের জন্য **Good Fellows** পোর্টাল নির্মাণ করেন। দেশ বিদেশের বহু নামী প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত বোর্ড সদস্য ছিলেন। পেয়েছেন পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ সহ দেশ বিদেশের বহু সম্মাননা। তাঁর যা কিছু ব্যক্তিগত সম্পদ উইল করে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দান করে গেছেন। {সংকলন : অরণি সেন]

অভিনন্দন

- কন্নড লেখিকা বানু মুস্তাককে তাঁর 'হার্টল্যাম্প' বইটি ইন্টারন্যাশনাল বুকারপ্রাইজ ২০২৫ প্রাপ্তির জন্য
- ২০২৫-র 'হিউম্যানিটিজের নোবেল' নরওয়ের 'হোলবার্গ প্রাইজ' পেলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং তুলনামূলক সাহিত্য, নারীবাদী দর্শন, নিম্নবর্গের ইতিহাস এবং রাজনৈতিক দর্শনের বিশেষজ্ঞ গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক
- ২০২৪ এর জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেলেন হিন্দি ভাষার সাহিত্যিক ছত্তিশগড়ের বিনোদকুমার শুক্লা। তিনি ছত্তিশগড়ের প্রথম এবং হিন্দি ভাষার দ্বাদশতম জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপক
- দার্জিলিং এর সাহিত্যিক ডঃ সাংমু লেপচা ও সুবাস ঠাকুরি ২০২৫এ সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার পেলেন
- বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ান হলেন ভারতের গুকেশ ডোম্বারাজু; দাবা বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান হলেন ভারতের দিব্যা দেশমুখ
- নয় মাস মহাকাশে কাটিয়ে ফিরে এলেন নভোচর সুনীতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোর
- ভারতীয় নভচর রাকেশ শর্মার ৪১ বছর পর মহাকাশে পাড়ি দিলেন ভারতীয় নভচর শুভাংশু শুক্লা
- অনুর্ধ ১৯ ক্রিকেটের বিশ্বকাপে বিজয়ী হল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল
- ইণ্ডিয়ান সুপার লিগ শিল্ড ট্রফি বিজয়ী মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট
- আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়ন ২০২৩-'২৫ হল দক্ষিণ আফ্রিকা
- ২০২৫ উয়েফা চ্যাম্পিয়ন'স লীগ বিজয়ী হল ফ্রান্সের প্যারী সেন্ট-জারমঁ; • ২০২৫ উয়েফা নেশনস' লীগ বিজয়ী হল পর্তুগাল
- ফিফা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ান হল চেলসি এফ. সি.

বিশেষ ক্রোড়পত্র

শতবর্ষে পা-রাখা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি আই)

বরুণ দাস

অনেকে কাজের নিরিখে সবকিছু বিচার-বিবেচনা করেন। অনেকে আবার সময়ের নিরিখে। কেউ-ই হয়তো ভুল নন। যুক্তি অবশ্য উভয়ের পক্ষেই আছে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনের অভিজ্ঞতা বাড়ে। এমন কি, দূরদর্শিতাও জন্মায়। এটাই হয়তো স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতাকে কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায়না। যদি অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয় তো সত্যকেই অস্বীকার করা হবে।

চলতি বছরে (২০২৫) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) একশো বছর পূর্ণ হচ্ছে। যদিও অনেকে মনে করে, গত ২০২০ সালেই এদেশের কমিউনিস্ট পার্টির একশো বছর পার হয়েছে। আসলে এদেশে কমিউনিস্ট পার্টির জন্মসাল নিয়ে বরাবরই মতভেদ আছে এবং এই মতভেদের পিছনে যথেষ্ট যুক্তি বা কারণও আছে একথাও কোনভাবে অস্বীকার করা যায়না। এই যুক্তি বা কারণও আশা করি অনেকেই কমবেশি জানেন। কী সেই যুক্তি বা কারণ?

কমিউনিস্ট পার্টি সাবেকি ইতিহাস বলে, ১৯২০-এর ১৭ অক্টোবর খোদ সোভিয়েত রাশিয়ার উজবেকিস্তানের তাসখন্দে এন. এন. রায় (আসল নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য), ইভেলিন রায় ট্রেন্ট, মহম্মদ শফিক সিদ্দিকি, মহম্মদ আলি, অবনী মুখার্জী, এম. পি. বি. টি. আচার্য, এবং রোজা ফিটিনগোভ—এই সাতজনকে নিয়ে প্রথম প্রবাসে ইণ্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি (আই সি পি) গঠিত হয়। যে দলের প্রথম সম্পাদক ছিলেন মহম্মদ শফিক সিদ্দিকি এবং চেয়ারম্যান আচার্য। তাঁদের দু'জন ও রায়কে নিয়ে তৈরি হয় এক্সিকিউটিভ কমিটি।

ইভেলিন ট্রেন্ট রয়

(১৮৯২-১৯৭০)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়কে ঘিরে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের গোষ্ঠীতে যোগদান। সেখানে পলাতক বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ, তাঁকে আশ্রয়দান, প্রেম ও বিবাহ। উভয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জার্মান সাহায্যের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করেন, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষিত হন এবং ন্যুইয়র্কে লালা লাজপত রাইয়ের সঙ্গে দেখা করেন। মার্কিন পুলিশের গ্রেফতার এড়াতে মেক্সিকো চলে যান, সেখানে সোসালিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন এবং মেক্সিকোর বিপ্লবে অংশ নেন। ১৯২০-তে রুশ কমিউনিস্ট নেতা বোরোদিনের আমন্ত্রণে তিনি ও রায় ছদ্মনামে জার্মানি হয়ে মস্কো যান এবং কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে অংশ নেন। তিনি এক প্রতিভাময়ী লেখিকা ছিলেন। মেক্সিকো থাকাকালীনই তাঁর লেখাগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, এরপর শান্তিদেবী নামে একের-পর-এক তাত্ত্বিক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। এরপর কমিনটার্নের নির্দ্দেশে উজবেকিস্তানে যান এবং সেখানকার বিপ্লবে অংশ নেন। ১৯২০-তেই তাসখন্দে প্রবাসী বিপ্লবীদের নিয়ে যে 'ইণ্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি' (ICP) গঠিত হয় তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও কার্যকারী সমিতির সদস্য এবং পার্টির মিলিটারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। পরে মস্কোর 'কমিউনিস্ট ইউনিভার্সিটি অফ দ্য টয়লার্স অফ দ্য ইস্টে' (KUTV) অধ্যাপনা করেন। হো চি মিন, শওকত ওসমানি সহ বহু নামী বিপ্লবী তাঁর ছাত্র ছিলেন। এরপর কমিনটার্নের কাজে সারা ইউরোপ ছুটে বেড়িয়েছেন, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং 'ভ্যানগার্ড' প্রমুখ পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ঔপনিবেশিকতা বিরোধী নারীবাদ বিষয়ে তিনি একজন পথিকৃত।

যদিও কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর 'স্বীকৃতি' পায়নি এই পার্টি। কেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের স্বীকৃতি পায়নি বিদেশের মাটিতে (পড়ুন খোদ লেনিন-স্ট্যালিনের কর্মধন্য কমিউনিস্ট-ভূমি সোভিয়েত রাশিয়ায়) অঙ্কুরিত এই কমিউনিস্ট পার্টি? আসলে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক একে 'নিষ্ক্রিয়-কার্যকারিতার প্রচেষ্টা' হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সে কারণেই 'একটি পূর্ণাবয়ব কমিউনিস্ট পার্টি' হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে ওই সদ্য গঠিত দলকে।

পরে ১৯২১-এ কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল অবশ্য ওই পার্টিকে স্বীকৃতি দিয়েছিল বলে জানা যায়। সেই সময় মুজঃফর আমেদের নেতৃত্বে কলকাতা গোষ্ঠী, সিঙ্গারাভেলুর নেতৃত্বে মাদ্রাজ গ্রুপ, পেশোয়ার গ্রুপ, বম্বে গ্রুপ, অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, আত্মশক্তি, ধুমকেতু, নব যুগ (গুন্টুর) প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কমিউনিষ্টরা কাজ শুরু করেন। আই.সি.পির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ রাখতেন নলিনী গুপ্ত, শওকত ওসমানি প্রমুখ। এরপরে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে নানাভাবে ছড়িয়ে থাকা বিপ্লবীদের ১৯১৭-র বলশেভিক বিপ্লব কমিউনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষিত করে। এরই ফল বোম্বাই (মুম্বই), কলকাতা, মাদ্রাজ (চেন্নাই), সংযুক্ত পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা ছোটো ছোটো কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলি ১৯২৫-এ কানপুরে একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে দেশ জুড়ে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপকে একটা সংহত রূপ দেয়। এর আহ্বায়ক ছিলেন

সত্যভক্ত। সভাপতিত্ব করেন সিঙ্গারাভেলু। পার্টির নামকরণ হয় কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া (সিপিআই)। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন শচ্চীদানন্দ ঘাটে। গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী, হজরত মোহানি প্রমুখরা সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। স্থির হয় বোম্বাইতে গঠিত হবে পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং কানপুর, কলকাতা, মাদ্রাজে হবে পার্টির পৃথক কার্যালয়।

এখানে উল্লেখ্য, পেশোয়ার (১৯২২), কানপুর (১৯২৪) ও মিরাট (১৯২৯) ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানো হয় কমিউনিস্ট পার্টিকে। নেতারা সব কারাবন্দী হন। নিষিদ্ধ থাকে এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৩৪-এর ২৮ জুলাই থেকে ১৯৪২-এর ২৩ জুলাই পর্যন্ত। পার্টির নেতৃত্বে তেভাগা, তেলেঙ্গানা, কায়ুর, পুন্নাপ্পা ভায়লার প্রমুখ বড় বড় কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৫১-৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে এবং পরবর্তী '৫৭ ও '৬২-র নির্বাচনে লোকসভায় ২য় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তারা। এরপর '৫৭-তে কেরালায় ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে এদেশে প্রথম এবং বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় (সান মারিনোয় ১৯৪২-'৫৭) গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু বিধি বাম। ১৯৫৯-এ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সরকার তা ভেঙে দেন। 'গণতন্ত্রপ্রিয়' মানুষটির এই অগণতান্ত্রিক আচরণ বিদ্ধ করে গোটা দেশকে। সিপিআই ২০২৫ এবং সিপিআইএম ২০২০ বর্ষকে পার্টির জন্ম সালের মান্যতা দেয়।

এই নিবন্ধে শতবর্ষে পা রাখা এই প্রাচীন দলটি কিভাবে চলেছে তা নিয়ে কিছু সদর্থক আলোচনা করা যাক। ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের পর কমিউনিস্ট পার্টিই দ্বিতীয় প্রাচীন রাজনৈতিক দল।

অন্যধারার দ্বিতীয় প্রাচীন রাজনৈতিক দল হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি ছিল। কারণ জাতীয় কংগ্রেসের বুর্জোয়া চরিত্র সম্বন্ধে দেশের সিংহভাগ মানুষই সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন। কংগ্রেস দেশীয় পুঁজিপতিদের তল্পিবাহক একথার প্রমাণ পেয়েছেন মানুষ। তাই সাধারণ মানুষের ন্যূনতম আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার সদিচ্ছা তাদের মধ্যে না থাকারই কথা এবং বলা বাহুল্য ছিলও না।

এই তিক্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই কমিউনিস্টদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছেন এদেশের সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ। এই দলটির প্রতি তাদের আস্থা ও ভরসার অন্যতম প্রধান স্থল বলে বিশ্বাস করেছেন। কারণ সামাজিক ন্যায়, সামাজিক সংহতি, সামাজিক সম্প্রীতি এবং সুস্থ ও গণমুখি সংস্কৃতির প্রতি কমিউনিস্ট পার্টি দায়বদ্ধতার প্রমাণ রেখেছে। একই সঙ্গে তাঁরা শ্রমিক-কর্মচারিদের ন্যায্য অধিকার নিয়েও আন্দোলনে শামিল হয়েছেন।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতার লক্ষ্যে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও উল্লেখ করার দাবি রাখে। কারণ শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন থেকে নৌবিদ্রোহ আন্দোলনে তাঁদের অবদানও বিশেষভাবে স্মরণীয়। আর এভাবেই তাঁরা দেশের সাধারণ প্রান্তিক মানুষের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই বাড়িয়েছিলেন। যা শিল্পপতিদের স্বার্থ দেখা কোনও দক্ষিণপন্থি দলের কাছ থেকে আশা করা যায়না। এখানেই জাতীয় কংগ্রেস আর কমিউনিস্ট দলের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। সুস্থ ও গণমুখি সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। বিশেষ করে সেসময়ের সংস্কৃতি-মনস্ক পার্টি-প্রধান পি সি যোশী (পূরণচাঁদ যোশী)র আন্তরিক প্রয়াস ও নেতৃত্বে একদল প্রতিভাবান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব যোগ দিয়েছিলেন আইপিটিএ-তে। চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটক থেকে সংগীতজ্ঞ সলিল চৌধুরী-হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতা উৎপল দত্ত থেকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সমৃদ্ধ তালিকায় ছিলেন নাট্যাচার্য শম্ভু মিত্র-বিজন ভট্টাচার্য থেকে সবিতাব্রত দত্ত, চিত্তশিল্পী সোমনাথ হোড় থেকে দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, কবি বিষ্ণু দে থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সমরেশ বসু (কালকুট), ডঃ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় থেকে গোপাল হালদার, বিবেক-ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে চিন্মোহন সেহানবিশ, মণিকুন্তলা সেন থেকে জলি কাউল সহ আরও অনেক নামিদামি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

যাঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে এক-একজন দিকপাল বলা যায়। কমিউনিস্ট পার্টির লাল শামিয়ানার নিচে বাস্তবিক অর্থেই একেবারে 'চাঁদের হাঁট বসিয়েছিলেন তৎকালীন অভিজ্ঞ পার্টি-প্রধান পি সি যোশী। কিন্তু এইসব উজ্জ্বল নক্ষত্রদের বেশিদিন পার্টির গণ-সংগঠনে ধরে রাখতে পারেননি যোশীজির উত্তরসূরিরা—যাঁরা পার্টির ওপরতলার 'নাক-

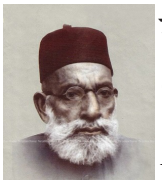

হজরত মোহানি

(১৮৭৫-১৯৫১)

''ইনকিলাব জিন্দাবাদ'' শ্লোগান, ''চুপকে চুপকে রাতদিন...'' প্রভৃতি জনপ্রিয় গজলের স্রষ্টা বিশিষ্ট উর্দু কবি ও গীতিকার সৈয়দ ফজল উল হাসান ছদ্মনাম নিয়েছিলেন হজরত মোহানি। ১৯২১-এ আমদাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি এবং স্বামী কুমারানন্দ প্রথম 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র দাবি তোলেন। সংযুক্ত প্রদেশের উন্নাও-এর মোহনে জন্ম ও বেড়ে ওঠা। উচ্চশিক্ষা লক্ষ্ণৌ ও আলিগড়ে। ছাত্র অবস্থায় স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হন এবং ১৯০৪-এ জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হন। ১৯০৩-এ ও পরে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বারবার কারাবন্দী করে। ১৯২১-এ অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের সম্মেলনে তিনি সভাপতি ছিলেন। রুশ বিপ্লবে উদ্দীপ্ত হয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন, কানপুর সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন এবং তার পরপরই আবার গ্রেফতার হন। দেশভাগের প্রবল বিরোধী ছিলেন, ভারতকে সোভিয়েতের মত ফেডারেল করতে চেয়েছিলেন। ভারতের সংবিধান রচনাকারী কমিটির তিনি সভ্য ছিলেন। কোন সরকারি সাহায্য নিতেন না। খুব সহজ জীবনযাপন করতেন। বহু গ্রন্থ লিখে গেছেন।

উঁচু' কমরেড হিসেবেই পরিচিত। 'বামপন্থী ছুঁৎমার্গিতা'য় এঁরা তখন আদ্যন্ত নিমজ্জিত।

যেসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ হাস্যকর 'অভিযোগ' এঁদের বিরুদ্ধে তোলা হয়, তা কোনও প্রাজ্ঞ পার্টিজনের কাছে কোনওভাবেই আশা করা যায়না। শিক্ষিত, সচেতন ও বিচক্ষণ মানুষ উপলব্ধি করতে পারেন, এদেশের কমিউনিস্টরা আর যাই হোন, মোটেও সাবালক-প্রাপ্ত হননি। ফলে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে প্রস্থান ঘটে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ওইসব উজ্জ্বল সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্বদের।

দিকপালদের প্রস্থানের পিছনে দুটো-চারটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। নোয়াখালি দাঙ্গার সময় বিজন ভট্টাচার্য গান্ধীজির সঙ্গে একসঙ্গে 'সাময়িক চলা'র প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ব্যস। এতেই পার্টি ও তার সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দের কাছে ভয়ঙ্করভাবে তিরস্কৃত হন বিজন ভট্টাচার্য। আর হেমাঙ্গ বিশ্বাস? না, তিনি পার্টি-বিরোধী কোনও আচরণ করেননি। তবে? তিনি তাঁর নিজের বিশ্বাসমতো ক্ষমতাবানদের শিবির ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

শম্ভু মিত্র? পার্ক সার্কাস ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলন-সভায় তিনি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। আর আইপিটিএ-র ব্যানারে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (তিনি তখন আইপিটিএ-র অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি) রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। ফলে পার্টি-নেতৃত্বের কাছে তাঁরা চূড়ান্তভাবে হেনস্থা হয়েছিলেন। 'প্রতিক্রিয়াশীল' হিসেবে তাঁদের দেগে দেওয়া হয়েছিল। এ ঘটনায় প্রচন্ডভাবে মানসিক কষ্ট পেয়েছিলেন অজিতেশ।

আসলে 'বামপন্থী বাঁক'-এ ঘুরপাক খেতে চাননি সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের ওইসব স্বাধীনচেতা উজ্জ্বল নক্ষত্ররা। তাঁরা একে একে 'কমিউনিস্ট বেড়ি' টপকে নিজেদের জগতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে শুরু করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁরা কতোটা উচ্চতায় নিজেদেরকে নিয়ে গিয়েছিলেন তা তো আমাদের সবারই কমবেশি জানা। পার্টির মোসাহেবি করা আর বশ্যতা মেনে চলা মধ্যমেধার কমরেডরা পড়ে রইলেন বামপন্থীদের নড়বড়ে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে।

কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসু সম্বন্ধে কী বালখিল্য আচরণটাই না করেছেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব। বি টি রণদিকে তখন পার্টির কাণ্ডারি। আদাব, নয়নপুরের মাটি, উত্তরঙ্গ, জগদ্দল, বি টি রোডের ধারে গল্প-উপন্যাস খ্যাত এই কথা সাহিত্যিককে নিয়ে পার্টির অনাবশ্যক টানাপোড়েনের কথা আমাদের সবারই কমবেশি জানা। 'বিবর' আর 'প্রজাপতি' উপন্যাসই তাঁকে রাতারাতি 'প্রতিক্রিয়াশীল' করে দিল। এমন ছেলেমানুষি আচরণ ভাবা যায়!

সমরেশ বসুর যে 'বিবর' এবং 'প্রজাপতি' নিয়ে বামপন্থীদের মধ্যে এতো বিতর্ক, এতো নিন্দামন্দ, এতো সমালোচনা—তা নিয়ে নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার (বিবর-এর নাট্যরূপ দেন), সাহিত্য সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় কী ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন—আমাদের আবার ফিরে পড়া প্রয়োজন। কিংবা বাম আন্দোলনে সক্রিয় থাকা অধ্যাপক-লেখক অশ্রুকুমার শিকদারের প্রবন্ধ-পুস্তক 'কিল মারার গোঁসাই।'

সিপিআই-এর প্রথমদিকের প্রধান সংগঠকরা ছিলেন ডাঙ্গে (বোম্বাই), সিঙ্গারাভেলু (মাদ্রাজ), শাওকত ওসমানি (সংযুক্ত প্রদেশ), গুলাম হোসেন (পাঞ্জাব ও সিন্ধ), ভগবতী পাণিগ্রাহী (উড়িষ্যা), মুজঃফর আমেদ (বাংলা)। ব্রিটিশ দমন ও নিষিদ্ধ অবস্থায় কমিউনিস্টরা 'ওয়ার্কাস অ্যাণ্ড পিজেন্ট পার্টি' (ডব্লিউ পিপি), জাতীয় কংগ্রেস, স্বরাজপার্টি, কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি (সিএসপি) এবং সোসালিষ্ট লেবার পার্টির মধ্যে কাজ করতেন এবং সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন। পরে, ১৯৩৬-এ স্বামী সহজানন্দ, বাবা রামচন্দ্র, এন. রঙ্গ প্রমুখের নেতৃত্বে 'অল ইণ্ডিয়া কিষাণ সভা' গড়ে তুলে বিভিন্ন প্রদেশে গড়ে ওঠা শক্তিশালী কৃষক আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেন। সাকেতওয়ালা প্রমুখের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি অফ গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সংযোগ হয়। লেবার কিসান পার্টি, কীর্তি কিশান পার্টি প্রভৃতি বাম বিপ্লবী সংগঠন সিপিআইতে যুক্ত হয়। ১৯৩৫এ আন্দামান সেলুলার জেলে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন প্রতিষ্ঠা করা শিব ভার্মা, হরেকৃষ্ণ কোঙার, ধ্রুবেশ চট্টোপাধ্যায়, অনন্ত চক্রবর্তী প্রমুখ বিপ্লবীরাও জেল থেকে বেরিয়ে সিপিআইতে যোগ দেন। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, কল্পনা দত্ত প্রমুখ

ইলা মিত্র

(১৯২৫-২০০২)

গোলাম কুদ্দুস বর্ণিত 'স্তালিন নন্দিনী', জীবনানন্দের মায়াময় 'বনলতা সেন' ইলা সেনের জন্ম অবিভক্ত বাংলার ঝিনাইদহে। উচ্চশিক্ষা কলকাতার বেথুন স্কুলে। খুব ভালো অ্যাথলিট ছিলেন। রাজশাহী জেলার চাপাই নবাবগঞ্জ অঞ্চলের নাচোলের রাজপরিবার সন্তান রমেন্দ্র মিত্রকে বিবাহ। উভয়ে সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সিপিআইতে যোগ দেন এবং গ্রামে কৃষকদের মধ্যে কাজ শুরু করেন। জোতদারদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীদের সংগঠিত করেন। রানিমার নেতৃত্বে সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয় যার আগুন জ্বলে ১৯৪৯-৫০ জুড়ে। অনেক চেষ্টায় প্রবল অত্যাচার করে পাকিস্তান সরকার পুলিশ, মিলিটারি ও আনসার বাহিনী দিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করে। ইলা মিত্র ধরা পড়লে তার উপর প্রবল শারীরিক অত্যাচার করা হয়, গণধর্ষণ করা হয় এবং রাজশাহী জেলে বন্দি রাখা হয়। স্বাস্থ্যের অবনতি হলে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে ১৯৫৪ সালে কলকাতায় চলে আসেন। পরবর্তীতে কমিউনিস্ট ও সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৫ সালে দাঙ্গা বন্ধ করতে উদ্যোগ নেন, ১৯৭১-র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেন। ১৯৬২-'৭১ এবং ১৯৭২-'৭৭ মানিকতলা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন। দক্ষিণ কলকাতায় অবস্থিত শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেছেন।

‘হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মি’র বিপ্লবীরা, ‘হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন’ এর বিপ্লবীরা; ‘সোসালিষ্ট লেবার পার্টি’ প্রভৃতি বামপন্থীদল কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৩৪-এ কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল বা কমিনটার্ন স্বীকৃতি দেয়। জাতীয় কমিউনিজম, প্রলেতারিয় পথ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, স্বাধীনতা সংগ্রাম বিভিন্ন বিতর্ক ও বাঁক নিয়ে সংগঠন এগোতে থাকে। বম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজ, কানপুর প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ প্রসারিত হয়। লালা লাজপত রাই এর নেতৃত্বে আগেই ১৯২০তে শ্রমিক সংগঠন এ আই টি ইউ সি গড়ে ওঠে। রাজেশ্বর রাও, সুন্দরায়া প্রমুখের নেতৃত্বে ১৯৪৬-’৫১ অবধি যে ঐতিহাসিক তেলেঙ্গানা গণ কৃষক সংগ্রাম গড়ে ওঠে নেহরু সরকারের নিষ্ঠুর সামরিক দমন, নিজামের রাজাকারদের ভয়ানক অত্যাচার এবং পার্টি নেতৃত্বের ক্ষমতাসীন অংশের বিশ্বাসঘাতকতায় সেটির অবসান ঘটে। নাৎসি আক্রমণ থেকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতকে রক্ষা করতে ফ্যাসিবাদ বিরোধিতাকে প্রাধান্য দিয়ে সিপিআই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের সহযোগিতার লাইন নিয়ে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে অংশ নেয় না এবং গঙ্গাধর অধিকারিরা দেশভাগকেও সমর্থন করে বসেন। যদিও অচিরে দেশভাগের বিরোধিতা করা হয় ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলি থামানোর চেষ্টা করা হয়। এই পর্বে রাসমণি হাজং, মণি সিং প্রমুখের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গে এবং কাংশারি হালদার প্রমুখের নেতৃত্বে দক্ষিণবঙ্গে বড় বড় কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয়। ১৯৪৩এ প্রথম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬-র সাধারণ নির্বাচনে সিপিআই বাংলার তিনটি সহ মোট আটটি আসনে জয়লাভ করে।

স্বাধীনতার পরপর ১৯৪৮-র কলকাতা কংগ্রেসে সিপিআই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইন নিলেও পরবর্তীতে ১৯৫১-র কংগ্রেসে সেটি জনগণের গণতন্ত্র, পরে জাতীয় গণতন্ত্রের লাইনে পরিণত হয়। মণিপুরে ইরাবত সিংহের নেতৃত্বে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। দাদরা-নাগর-হাভেলি এবং গোয়া সংযুক্তিকরণ আন্দোলনে সিপিআই যোগ দেয়। আর. বি. মোরে ও শ্যামরাও পারুলেকারের নেতৃত্বে সিপিআই এবং আম্বেদকরের রিপাবলিকান পার্টি মহারাষ্ট্রে বিশাল কৃষক ও শ্রমিক সমাবেশ ঘটায়। চীন-ভারত যুদ্ধের পর মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে ১৯৬৪-তে বড় অংশটি পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়ে ১৯৬৪-তে সিপিআইএম গড়ে তোলে। পার্টি ক্রমশ সংসদসর্বস্ব ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মুখাপেক্ষী হয়ে ওঠে। ১৯৭০-’৭৭ অবধি কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত ও রাজ্যে মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়। ১৯৭৭ থেকে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল-এ বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় এবং পরে ১৯৯৬-’৯৮-র কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়।

কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর নেতা ও কর্মীদের ক্ষেত্রেও বহু নিষ্ঠুর আচরণ করে। ঘাটে, অধিকারী, সোমনাথ লাহিড়ি পরপর তিনজন সাধারণ সম্পাদক যখন গ্রেফতার হয়ে কারাবন্দী হন তখন স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য পাঁচ বছর আন্দামানের সেলুলর জেলে বন্দী থেকে মুক্তি পাওয়া ২৮ বছরের যোশীর উপর পার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব বর্তায় ১৯৩৫এ। অত্যন্ত গুরুতর সময়ে যোশী পার্টিকে নেতৃত্ব দিয়ে অগ্রগতি ঘটালেও তাঁকে অপবাদ দিয়ে ১৯৪৮এ বিতাড়িত করা হয়। ১৯৫১তে আবার গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী সম্পাদক বিটি রণদিভেকে ’৫০ বিতাড়িত করে ’৫৫তে গ্রহণ করা হয়। এরপর সম্পাদক রাজেশ্বর রাওকেও ’৫১তে সরিয়ে দিয়ে আবার ’৬৪তে সম্পাদক করা হয়।

অনেকেরই হয়তো স্মরণে আছে, বাঙালি তথা ভারতের প্রিয়তম জননেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে ‘তেজোর কুকুর’ বলে উল্লেখ করে বিবৃতি দিয়েছিলেন পার্টির সেসময়ের প্রধান কমরেড বি টি রণদিভে। দলের মুখপত্র ‘পিপলস ওয়র’-এ তিনি নেতাজিকে বৃটিশীয় ভাষায় ‘যুদ্ধোপরাধী’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাঁকে কড়া শাস্তির

রামচন্দ্র বাবাজী মোরে

(১৯০৩-১৯৭২)

মহারাষ্ট্রের মাহাদ অঞ্চলের দরিদ্র দলিত কৃষক পরিবারে জন্ম। জাতি শোষণ ও অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে বড় হয়ে ওঠা এবং অত্যন্ত সংগ্রাম করে শিক্ষালাভ। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ১৯২৪-এ বিরাট দলিত সম্মেলন করেন। ১৯২৭এ ডঃ আম্বেদকরের নেতত্বে রায়গড় জেলার ছাবদার হ্রদের জলের দলিতদের অধিকারের যে ঐতিহাসিক মাহাদ সত্যাগ্রহ হয় এবং একই বছর যে মনুস্মৃতি পোড়ানোর কর্মসূচী সংঘটিত হয় তিনি ছিলেন তাঁর প্রধান সংগঠক। তিনি ছিলেন বাবা সাহেব আম্বেদকরের বিশ্বস্ত সহযোগী এবং বাবা সাহেবের মৃত্যু পর্যন্ত এই সম্পর্ক অটুট ছিল। ইতিমধ্যে সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ১৯৩০ সালে সিপিআইতে যোগ দেন। এরপর অগুন্তি কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নেন। তিনি ছিলেন ১৯৩৬ লক্ষ্ণৌতে প্রতিষ্ঠিত এআইকেএস এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। কোঙ্কন অঞ্চলে জমিদারি ও বেগার খোট্টি প্রথার বিরুদ্ধে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৩৮-এ সিপিআই ও ইণ্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি মিলে হাজার হাজার কৃষককে সমাবেশিত করে বম্বে শহর অচল করে দিয়েছিল। তারও অন্যতম সংগঠক ছিলেন। মহারাষ্ট্রের ‘গিরনি কামগর ইউনিয়ন’এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ছিলেন রেল ও সাফাই কর্মীদের সংগঠনের নেতা। বম্বের বস্ত্র শিল্প ধর্মঘটে বিরাট ভূমিকা ছিল। সারাজীবন অস্পৃশ্যতা নিবারণে এবং জাতি পীড়ন অবসানের জন্য কাজ করেছেন। ছিলেন দলিত ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সেতু। স্বাধীনতার আগে বহুবার কারাবরণ করেন, আবার স্বাধীনতার পর ১৯৫৯ ও ৬৪ সালে কৃষিমজুর আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কারাবরণ করেন। ছিলেন শক্তিশালী লেখক। আহ্বান, জীবামার্ক প্রমুখ পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

জন্য প্রস্তুত থাকতে বৈপ্লবিক হুঙ্কার দিয়েছিলেন।

আর নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে সেই বিখ্যাত (আসলে কুখ্যাত) কার্টুনের কথা কে না জানেন। শুধুই কী নেতাজি? কে 'ছাড়' পেয়েছেন বামপন্থী-সমালোচনা থেকে? 'জাতির জনক' মহাত্মা গান্ধীজি থেকে 'বিতর্কিত' রাজনীতিক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সমাজসংস্কারক তথা আঠেরো শতকের রেনেসাঁর অন্যতম প্রধান ঋত্বিক রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর, মানব-কল্যাণে নিবেদিত দানবীর দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই বিতর্কিত বামপন্থী তালিকায় আছেন আধ্যাত্মিক জগতের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে কর্মযোগী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ, আন্তর্জাতিকস্তরের সেবাপ্রতিষ্ঠান ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ থেকে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যাঁরা দেশ ও দশের সামগ্রিক কল্যাণে নিজেদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

পরবর্তীকালে অবশ্য তাঁদের 'ঐতিহাসিক ভুল' থেকে অনেকটাই সরে এসেছেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব। কিন্তু ততোদিনে যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে। বাকি ক্ষতিটুকু সম্পন্ন করে দিয়েছেন 'অতি বামপন্থী'রা। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা থেকে ব্যক্তিহত্যার ভয়ঙ্কর রাজনীতি। আর এভাবেই দেশের সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন তাঁরা। তবু শেষ হয়েও বোধহয় শেষ হয়না। সাতাত্তরে ক্ষমতায় এসে যোলকলা পূর্ণ করে দিয়েছে সিপিআই(এম)।

কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের নামেও তো শুধু সমালোচনা নয়-ভয়ংকর কুৎসা রটানো হয়েছে। যে মানুষটির (রাজনৈতিক সন্ন্যাসী বলা যায়) মৃত্যুর পর তাঁর দাহকার্য করার মতো সামান্য অর্থটুকুও ছিল না—তাঁকে 'স্টিফেন হাউসের মালিক' বলে কম (অপ)প্রচার করা হয়নি। বামপন্থী সমালোচনার হাত থেকে বাদ পড়েননি স্বয়ং ডা. বিধানচন্দ্র রায়ও। এই অকৃতদার মানুষটি পশ্চিমবঙ্গের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়াও নিজের বিষয়-আশয় অকাতরে দান করে গেছেন দেশের জন্য।

শ্রেণি সংগ্রাম পরিত্যাগ করে, কেন্দ্র ও রাজ্য মন্ত্রীসভায় যুক্ত হয়ে ক্ষমতাসীন ও পুঁজির ওকালতি করে, অন্ধ সোভিয়েত সমর্থন করে, সংসদ সর্বস্ব এবং কাজের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হয়ে ক্রমশ তাঁরা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। যার টাটকা প্রমাণ বাংলা থেকে বিধানসভা ও লোকসভায় বামপন্থীদের নির্লজ্জ শূন্যতা। আর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সব মিলিয়ে সাবেকি সাংসদ সংখ্যা ৬২ থেকে মাত্র ৫-এ পৌঁছনো। আবার চৌত্রিশ বছরে সরকার চালিয়ে তাঁরা হাতে-কলমে প্রমাণ করেছেন যে, অন্যান্য বুর্জোয়াদলের মতোই যেকোনও উপায়ে শাসনক্ষমতায় টিকে থাকাটাই এদেশের কমিউনিস্ট পার্টির একমাত্র উদ্দেশ্য। এজন্য যেকোনরকম অসৎ-উপায়ই অবলম্বন করা যায়। ভোট-সর্বস্ব রাজনীতির সুবাদে সেটি আরও নগ্ন হয়ে পড়ে।

শুধু সাঁইবাড়ির মতো নৃশংসতম হত্যাকান্ডই নয়, মরিচঝাঁপি, ছোটো আঙ্গাড়িয়া, সূচপুর, কেশপুর, বিজনসেতু, বিরাটি, বানতলা, নন্দীগ্রাম-এর মতো জঘন্য নারকীয় হত্যাকান্ড ('গণহত্যা') ঘটানো তাঁদের কালিমালিপ্ত করে। এর সঙ্গে বিভিন্ন দুর্নীতি, প্রমোটিং ও এলাকা দখলের বড় শরিক সিপিআই(এম)-র কর্মকাণ্ড তাঁদের ভাবমূর্তিকে ম্লান করে। কৃষকদের কাছ থেকে সিঙ্গুর, রাজারহাট প্রভৃতি অঞ্চলে বলপূর্বক জমি দখল ক্ষোভের জন্ম দেয়। মানুষ পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা থেকে তাঁদের সরিয়ে দেয়।

এখন তো মূলধারার (পড়ুন ভোট-পন্থী) কমিউনিস্ট পার্টি বলতে সিপিআই(এম), সিপিআই, সিপিআই(এমএল) লিবারেশন এবং এসইউসিআই(সি)। সিপিআই (মাওবাদি) অবশ্য এখনও সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী।

বাকি ২২টি ছোট দলের সাইনবোর্ডই ভরসা। এছাড়াও বিশেষত নকশালপন্থীদের অজস্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গোষ্ঠী। দেশের মানুষ আর তাঁদের প্রতি আস্থাশীল নন। কেন মানুষ তাঁদের প্রতি আস্থাশীল নন—তা নিয়ে তাঁদের বিশেষ হেলদোল চোখে পড়ে না। এখন প্রশ্ন হল, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে কেন এতো বিভাজন? এই অবাঞ্ছিত বিভাজন নিয়ে তাত্ত্বিকেরা যাই বলুন না কেন, আসলে 'আমি ঠিক, তুমি ভুল'—এই নীতিকে প্রাধান্য দেওয়াটাই পার্টি ও তাঁর নেতৃত্বকে জনগণ থেকে দূরে ছিটকে দিয়েছে।

গোদাবরী পারুলেকর

(১৯০৭-১৯৯৬)

নামী আইনজীবীর সন্তান গোদাবরী গোখলের জন্ম পুনেতে। ফার্গুসন কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে তারপর আইনের স্নাতক হন। মহারাষ্ট্রের প্রথম মহিলা আইনের স্নাতক। ১৯৩২-এ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য জেল। জেল থেকে বেরিয়ে বম্বেতে চলে গিয়ে 'সার্ভেন্টস অফ দ্য সোসাইটি'তে যোগদান করে সমাজসেবামূলক কাজ। সেই সময় সারা রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজ করেন। বম্বের গৃহসহায়িকাদের সংগঠিত করে ১৯৩৭-'৩৯ শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই সময় তার কর্মসহযোগী ও স্বামী বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা শ্যামরাও পারুলেকারের সঙ্গে সিপিআইতে যোগদান করে গ্রামে চলে যান আদিবাসী কৃষকদের সংগঠিত করতে। কৃষকসভার জাতীয় ও রাজ্য নেত্রী হয়ে ওঠেন। যুদ্ধ বিরোধিতা ও শ্রমিক ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ১৯৪০-'৪২ কারাবরণ। থানে জেলার ওরলিতে ১৯৪৫-'৪৭ সালে গড়ে তোলেন ঐতিহাসিক আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ। ১৯৬১তে গড়ে তোলেন 'আদিবাসী প্রগতি মণ্ডল'। আবার কারাবরণ করেন। আমৃত্যু কমিউনিস্ট নেত্রীর ভূমিকা পালন করেছেন। ভাল লেখিকা ছিলেন। বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রয়েছে। 'যেওয়া মানুষ জাগা হোতো' গ্রন্থটির জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান।

অন্যদিকে শতবর্ষে পা-রাখা বিপরীত মত ও পথের ধারক-বাহক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (যারা ভাজপা-র রাজনৈতিক চালিকাশক্তি) বাড়বাড়ন্ত দেখে তাজ্জব বনে যেতে হয়। অনেকেই জানেন, লোকসভায় দুই থেকে তিনশো তিনে পৌঁছে গিয়েছিল ভাজপা। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে কিছুটা ধাক্কা খেলেও তা সামলে নেওয়ার ক্ষমতা দেখিয়েছেন তাঁরা। কেন্দ্রে দুই শরিককে নিয়ে এনডিএ মন্ত্রীসভা গড়ে তাঁর হাতগরম প্রমাণও রেখেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, সাতাত্তরে রাজনৈতিক ডামাডোলে জনতা পার্টির লেজ ধরে এ রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় আসার পর অনেকেই ভেবেছিলেন, সিপিআই(এম) নিয়ন্ত্রিত বামফ্রন্ট সরকার জনগণের মৌলিক সমস্যার সমাধান বা সমাজ বিপ্লবের সূচনা করতে না পারলেও অনন্তঃ সততার সঙ্গে এই ক্ষুয়িষ্ণু বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যে সম্ভবমতো সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা সমাধানের আন্তরিক প্রচেষ্টা করবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি।

আজ আর বলতে কোনও দ্বিধা নেই, একটানা চৌত্রিশটি বছর এ রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় থেকে এরা বিপ্লবের পথ থেকে বিচ্যুতই শুধু নয়, বিপ্লবের পথটিকে নোংরা ও কলুষিতও করেছেন। রাজ্যের বামপন্থীরা প্রমাণ করেছে যে, বামপন্থীরা যদি ঘোষিত মতাদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বিপ্লবের পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাহলে তাঁদের চেয়ে ক্ষতিকারক ও বিপজ্জনক, অসৎ ও অপদার্থ এবং জনগণের স্বার্থের চরম শত্রু আর কেউ হতে পারে না। ধর্মীয় পীর আব্বাস সিদ্দিকীর আইএসএফ-এর মতো দলের হাত ধরতেও তাঁরা মোটেও পিছপা নন।

আলোচনার স্বার্থে কিছুটা পিছনে তাকানো যাক। ষাটের দশকের শেষে কেরলে মুসলিম লিগের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে জোট সরকার গড়েছিল সিপিআই(এম)। ২০০০-এ ইন্ডিয়ান মুসলিম লিগের সঙ্গে ফের জোটের চেষ্টা করে তাঁরা। প্রবীণ কমরেড ভি এস অচ্যুতানন্দন এর তীব্র বিরোধিতা করেন। পার্টি কংগ্রেসের ময়নাতদন্তে জানা যায়, ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কেরলে আব্দুল নাসের মাদানির পিডিপি-র হাত ধরায় পার্টিকে খেসারত দিতে হয়।

এখানেই কিন্তু শেষ নয়। এদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দীর্ঘ ইতিহাসে ভুলের বহর আরও অনেক আছে। নমুনা হিসেবে দু-একটা উল্লেখ করা যাক। যেমন ২০১১-র বিধানসভায় জামাত-ই-ইসলামির মতো মৌলবাদি বলে খ্যাত সংগঠনের সঙ্গে 'নির্বাচনি সমঝোতা' করার জন্য চড়া মাশুলও গুনতে হয় পার্টির কেরল শাখাকে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, বার বার ঠকে ও ঠেকেও তাঁরা কিছুই শেখেন না। ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ তাঁদের চরিত্রে নেই।

আরও আগে ফিরে তাকান। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে ভুল পথে চলেছে, সেই সময়ের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্র 'কোমিনফর্ম'-এর মুখপত্র 'ফর লাস্টিং পীস, ফর পিপলস ডেমোক্রাসি'তে ১৯৫০-এর ২৭ জানুয়ারি তা স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়। ভারতের পার্টি ক্যাডারদের মনোবল ভেঙে যাবে বলে সে খবর চেপে যাওয়া হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র বসুর দৈনিক 'নেশন' পত্রিকায় তা প্রকাশ পায়।

কমিউনিস্টদের 'ভুল'-এর যেমন রয়েছে দীর্ঘ তালিকা আবার সংগ্রাম ও সাফল্যেরও অনেক নজির রয়েছে। কেরলের বাম সরকার প্রথম ভূমিসংস্কার করে এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে জোর দেয় যার ফল কেরল এখন পাচ্ছে।

এছাড়াও শ্রমিক শ্রেণি এবং অন্যান্য শ্রমজীবী ও প্রান্তিক মানুষদের ক্ষেত্রে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। অনেক সৎ, মেধাবী, জনগণের জন্য নিবেদিত প্রাণ, সর্বস্ব ত্যাগী কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ও সংগঠক কমিউনিস্ট মতাদর্শকে উর্ধ্বে তুলে ধরেন।—

খোদ সোভিয়েত রাশিয়াতেও একই ঘটনার প্রতিফলন দেখা যায়। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী খোদ লেনিন-ভক্ত লেখক ভসেভেলোদ মেয়ারহোল্ড বিপ্লব পরবর্তী সময়ে ক্রমাগত ঘটতে থাকা সেদেশের বিচ্যুতিকে প্রত্যক্ষ করে প্রতিবাদে সরব হন তাঁর লেখা নাটকে। লেনিনের মৃত্যুর পর আচমকাই খুন হয়ে যান তিনি। সলঝেনেতসিনকে আরও বহু প্রতিবাদী সোভিয়েত লেখকদের নিয়ে যে অশেষ দুর্ভোগ সইতে রয়েছে তা তো আমাদের অনেকেরই কমবেশি জানা।

আমরা অবশ্যই আশাবাদি, শতবর্ষে পা রাখা এদেশের কমিউনিস্টরা ইতিহাস থেকে যথাযথ শিক্ষা নেবেন। তাঁদেরকে বুঝতে হবে, অপরকে শিক্ষা দেওয়ার আগে নিজেদেরকে শিক্ষিত করে তোলা দরকার। যে শিক্ষা তাঁদেরকে দেশের সিংহভাগ মানুষের কাছাকাছি আসতে পথ দেখাবে। মানুষকে নিয়েই তো রাজনীতি। সেই মানুষের কাছাকাছি পৌঁছতে যাবতীয় ইগো-অহংকার দূরে সরিয়ে নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করার মানসিকতা অর্জন করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বমানের কবি-মনীষী-দার্শনিকও নিজের 'ভুল' স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। জীবনের শেষপ্রহরে পৌঁছে উপলব্ধি করেছিলেন, 'আমার কবিতা জানি আমি, গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।/কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন/কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন।/সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি/...সাহিত্যের আনন্দের ভোজে/ নিজে যা পারিনা দিতে নিত্য আমি থাকি তাঁর খোঁজে।/সেটা সত্য হোক/শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।' ('জন্মদিন' কাব্যগ্রন্থের 'ঐকতান' শীর্ষক কবিতার পঙক্তি)। আমরা আশা করব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একবিশ্ব পরিস্থিতিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ; বিভিন্ন বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থা ও দেশীয় পারিবারিক পুঁজির অতিশোষণ, জাতীয়ক্ষেত্রে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে লুম্পেন স্বৈরতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মোকাবিলা করতে সমস্ত দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক ও জনমুখী সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হবে। সেখানে শতায়ু সিপিআই দলও অন্যান্য বাম দলগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আরএসএস: একশো বছরের হিন্দুত্ব ও বিভাজনের রাজনীতির প্রাককথন

সোমনাথ গুহ

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় রাজনীতির পরিষ্কার দুটি ধারা ছিলঃ একটা ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনীতি আর একটা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি। সাংগঠনিক ভাবে প্রথমটির সূত্রপাত ১৮৭৬ সালে যখন ভারত সভা গঠন হয়। একই ধরনের অ্যাসোসিয়েশন মাদ্রাজ, পুনা, বোম্বেতেও গড়ে ওঠে। এদের সদস্যরা ছিলেন মূলত অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ – শিক্ষক, লেখক, আইনজীবী ইত্যাদি। এরা উদারনৈতিক মনোভাব পোষণ করতেন, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ভেদাভেদ করতেন না। ১৮৮৫ সালে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ণতা পায় যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে কম্যুনিস্ট, সোশ্যালিস্ট এবং বিভিন্ন বামপন্থী দল গঠনের ফলে এই ধারার শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি রাজনীতির অভিধানে ঢুকে পড়ে।

অন্য ধারাটি ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন জোরদার করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করার ওপর গুরুত্ব দেয়। একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মুসলিমদের তথাকথিত আধিপত্য খর্ব করা এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা। এর জন্য প্রাচীন ভারত, বিভিন্ন দেবদেবী এবং শিবাজির মতো বীরদের মহিমান্বিত করা শুরু হয়। এরই ফলে ১৮৬৭ সালে কলকাতায় হিন্দু মেলা ও কয়েক বছর পরে বোম্বেতে বাল গঙ্গাধর তিলকের উদ্যোগে গণেশ উৎসব, শিবাজি উৎসব হয়। ১৮৭৫ সালে বোম্বেতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর উদ্যোগে আর্য সমাজ গঠিত হয়। এই সংগঠন মিশনারিদের দ্বারা ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে সরব হয়। এঁরা হিন্দু ধর্মত্যাগীদের ফিরিয়ে আনার জন্য শুদ্ধি বা শুদ্ধিকরণ রীতি চালু করেন। এঁরা হিন্দু ধর্মে গোঁড়ামির পরিবর্তে সংস্কারের ওপর জোর দেন।

আবেদন-নিবেদনের খোলস থেকে বেরিয়ে কংগ্রেস যখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সরব হয়, তখন সুবিধাভোগী ভূস্বামী ও অন্যান্য সম্প্রদায় বিপন্ন বোধ করতে শুরু করে। ধর্ম-বিচ্ছিন্ন রাজনীতির মোকাবিলা করতে এরা ধর্মের অবমাননার জিগির তুলে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে: উর্ধ্বে তুলে ধরে। ১৮৮৮ সালে ঢাকার নবাব এবং কাশীর রাজার নেতৃত্বে জমিদার ও সামন্তপ্রভুরা 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়া প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করে। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) সমর্থন করে, এক বছর বাদে মুসলিম লিগ গঠিত হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় উত্তর ভারতের বিভিন্ন হিন্দু সভাগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৯১৫ সালে হিন্দু মহাসভা গঠিত হয়।

হিন্দুত্বের দর্শন

হিন্দুত্বের প্রধান রূপকার বিনায়ক দামোদর সাভারকারের জন্ম ২৮ মে, ১৮৮৩, মহারাষ্ট্রের নাসিকের নিকটে ভাগুর গ্রামে। তাঁর বাল্যকালের একটি ঘটনা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন ও মতাদর্শের ইঙ্গিতবাহী। সেই সময় সংযুক্ত প্রদেশ ও মুম্বাইয়ে হিন্দুদের ওপর 'অত্যাচারের' প্রতিশোধ নিতে বালক সাভারকার বন্ধুদের নিয়ে একটি দল তৈরি করেন। এই বাহিনী মসজিদে পাথর ছুঁড়ে জানলা, টালি ভেঙে দেয় ও বিজয়গর্বে ফিরে আসে (সাভারকার ও হিন্দুত্ব-এ জি নুরানি-পৃ-১১)। ১৯০৮ সালে তিনি 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭' বই লিখলেন। নুরানি লিখছেন অনেকে এটিকে নিছক ইস্তাহার বলে ব্যঙ্গ করেছেন, কিন্তু বইটির লেখনী উচ্চ গুণসম্পন্ন এবং এটিকে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক রচনা হিসাবে গণ্য করা উচিত। এরপর দুটি রাজনৈতিক হত্যায় যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে দ্বীপান্তরে পাঠান হয়। বহুবার ক্ষমা প্রার্থনা করার পর এবং মুচলেকা দেওয়ার পর ১৯২১ সালে তাঁকে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। তিন বছর বাদে ব্রিটিশদের শর্তে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯২৩ সালে হিন্দুত্ব নামক মতাদর্শের ওপর তাঁর বই প্রকাশিত হয়। এটা জানা প্রয়োজন যে কোন প্রেক্ষাপটে হিন্দুত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটে। উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মতে প্রায় ৫০০ বছর মুসলিম শাসনের অধীনে থাকার ফলে হিন্দুদের মধ্যে একটা হীনমন্যতা তৈরি হয়েছিল। ব্রিটিশরাও তাঁদের দুর্বল এবং তথাকথিত ভীতু জাতি হিসাবে গণ্য করত (সাভারকার এবং আরও অনেকেই মনে করতেন

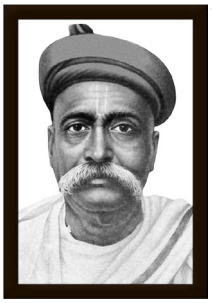

বাল গঙ্গাধর তিলক

(১৮৫৬-১৯২০)

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ। মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারের এই সন্তান গণিত ও আইন নিয়ে উচ্চশিক্ষার শেষে প্রথমে ডেকান সোসাইটি গড়ে শিক্ষা বিস্তার তারপর ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৯০-এ জাতীয় কংগ্রেসে যোগ ও চরমপন্থী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন। ১৯০৫-'০৭-র স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন থেকে শুরু হয় কংগ্রেসের তিলক যুগ। তিনি স্বরাজের ডাক দেন। মহারাষ্ট্রে প্লেগ মহামারি মোকাবিলায় ব্যর্থতার জন্য ব্রিটিশ সরকারের তীব্র সমালোচনা করে পত্রপত্রিকায় জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লেখেন এবং বক্তব্য রাখেন। তিনি মহারাষ্ট্রের সশস্ত্র বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ১৮৯৭, ১৯০৯ ও ১৯১৫-তে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং ১৯০৮-'১৪ অবধি মান্দালয় জেলে বন্দী থাকেন। বন্দী অবস্থায় লেখেন গীতা রহস্য। জেল থেকে বেরিয়ে লোকমান্য তিনি অ্যানি বেসান্তের সঙ্গে নরমপন্থী হোমরুল আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং গান্ধীর সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করেন।

হিন্দু শুধু একটি ধর্ম নয়, এটি একটি পৃথক জাতি)। ১৯১৯ সালে যখন ভারতের মুসলিমরা কন্সট্যান্টিনোপলের খিলাফতকে রক্ষা করার জন্য সরব হলেন এবং ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে শামিল হলেন, তখন হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা বিপন্ন বোধ করলেন। তাঁরা ভাবলেন দেশে তো বটেই, বিদেশেও তাঁরা একঘরে হয়ে গেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের হীন, এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর তুলনায় নিপীড়িত ও বঞ্চিত বোধ করলেন। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতন দেখা গেল ১৮৮১ এর জনগণনায় হিন্দুদের সংখ্যা যা ছিল ৭৪.৩% সেটা ১৯৩১-এ কমে গিয়ে হয়ে গেছে ৬৮.২%। কিছু লোক তো বলাই শুরু করলো যে হিন্দুরা একটি মৃতপ্রায় জাতি।

এই পরিস্থিতিতে সাভারকার হিন্দুদের জাতীয় বৈশিষ্টগুলি লিপিবদ্ধ করলেন। প্রথমত তিনি বললেন প্রথম যে আর্যরা উপমহাদেশে বসবাস করেছিলেন হিন্দুরা তাঁদের উত্তরাধিকারী; তাঁদের শিরা উপশিরায় আছে বৈদিক গোষ্ঠীপতিদের রক্ত। দ্বিতীয়ত এই জাতির একটা ভৌগোলিক সীমানা আছে যার মাটি গঙ্গা এবং অন্যান্য নদীর পবিত্র জলে সিক্ত হয়। তৃতীয়ত এর একটি নিজস্ব ভাষা আছে, সংস্কৃত যা অন্যান্য ভাষার উৎস এবং 'সমস্ত ভাষার মাতৃসম'। চতুর্থত এর একটি সংস্কৃতি আছে, হিন্দু সংস্কৃতি; সাভারকার মনে করতেন হিন্দু একটি সংস্কৃতি, ধর্ম যার অধীনে। সাভারকার নিজে হিন্দু ধর্মের কোনও আচার অনুষ্ঠান পালন করতেন না। এদিক থেকে জায়নবাদীদের সঙ্গে হিন্দুত্বের মিল আছে। তাঁদের মতো হিন্দুত্ববাদীরাও একটি কল্পিত সোনালি অতীত, জাতিগত শুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং পবিত্র ভূমি-কে প্রাধান্য দেয়।

এই ধরনের একটি সমাজে অন্য ধর্মগুলির অবস্থান কী হবে? সাভারকার মনে করতেন মুসলিমরা একটি বিপদ কারণ হিন্দুদের পবিত্র ভূমির প্রতি তাঁরা অনুগত নন, তাঁদের আনুগত্য মধ্য প্রাচ্যের ধর্মস্থানের প্রতি। তাঁরা যদি এই ভূমিকে তাঁদের পুণ্যভূমি মনে করেন, হিন্দু বিবাহ করেন ও সংসারধর্ম করেন এবং এটাকে নিজেদের পিতৃভূমি মনে করেন তবেই তাঁদের হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

হিন্দুত্বের আরেক তাত্ত্বিক, আরএসএসের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক এম এস গোলওয়ালকার এই মতবাদকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি নিদান দেন যে মুসলিমদের হিন্দু সংস্কৃতি গ্রহণ করতে হবে, হিন্দু ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং এই ধর্ম ও জাতিকে সর্বদা মহান বলে স্বীকার করতে হবে; অন্যথা হয় তাঁদের আত্মসমর্পণ করতে হবে নয় দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। দেশে থাকতে হলে হিন্দুদের অধীনে পুরো মাথা নত করে থাকতে হবে; তাঁরা কোনও কিছু দাবি করতে পারবেন না, অগ্রাধিকার বা সংরক্ষণের তো প্রশ্নই নেই, কোনও সুযোগসুবিধাই পাবেন না, এমন কি নাগরিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত হবেন। হয় তাঁদের হিন্দুদের অধীন হয়ে থাকতে হবে, নয় তো তাঁদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হবে।

ডাঃ বালকৃষ্ণ শিবরাম মুনজে

(১৮৭২-১৯৪৮)

তিলকের মন্ত্রশিষ্য মুনজে বম্বের গ্রান্ট মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে বম্বে পুরসভার চিকিৎসক হিসাবে যোগ দেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন এবং দীর্ঘদিন সেন্ট্রাল প্রভিন্সের কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। তিলকের মৃত্যুর পর গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস ছেড়ে স্বরাজ পার্টিতে যোগ দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তিনি আর জয়াকর ও এন. কেলকরকে নিয়ে 'রেসপনসিভ কো-অপারেশন পার্টি' গঠন করেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধে মেডিকেল টিমে অংশ নেন। ১৯২৫-এ গঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের পাঁচজন প্রতিষ্ঠাতার একজন। ১৯২৭ থেকে '৩৭ অবধি হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। লন্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে অংশ নেন। ১৯৩১-এ ইতালিতে গিয়ে মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করেন। ১৯৩৫-এ নাসিকে গড়ে তোলেন ভোসলে মিলিটারি স্কুল।

আরএসএসের গঠন

হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য এবং সারা দেশ জুড়ে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করার জন্য কে বি হেডগেওয়ার নাগপুরে একটা আন্দোলন ও তার জন্য সংগঠন শুরু করলেন— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। গত একশো বছর ধরে এই সংগঠনকে কেন্দ্র করে হিন্দু রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চলছে। আরএসএসের বুনিয়াদী শক্তি হচ্ছে শাখা। অসংখ্য শাখাগুলিকে কেন্দ্র করে তাঁদের কাজকর্ম পরিচালিত হয়। বাচ্চা থেকে বয়স্ক মানুষ সবাই এই শাখার সদস্য হতে পারেন। এই সংগঠন গড়ে তুলতে প্রধান উদ্যোগ নেন ব্রাহ্মণরা কিন্তু জাতপাত নির্বিশেষে সমাজের অন্যান্য মানুষদেরও এতে শামিল করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু মহিলাদের এই সংগঠনের সদস্য হওয়ার কোনও অধিকার নেই। (হেডগেওয়ারের পরামর্শে লক্ষ্মীবাই কেটকার ১৯৩৬ সালে মহিলাদের জন্য পৃথক সংগঠন করেন ---- রাষ্ট্রসেবিকা সমিতি। বলা হয় এটা স্বাধীন সংগঠন কিন্তু বাস্তবে এঁরা আরএসএসের অঙ্গুলিহেলনে চলেন।)

শাখার সদস্যরা নিয়মিত একত্রিত হন, নানা ব্যায়াম করেন, খেলাধুলা করেন। সদস্যদের বৈদিক যুগের কাহিনি, মুসলিম শাসনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী হিন্দু রাজাদের বীরত্বের গাথা শোনানো হয়, তাঁদের শাসনকে সোনালি সময় বলে চিহ্নিত করা হয়। একই সঙ্গে মুসলিম শাসনকালকে অন্ধকার যুগ বলে বর্ণনা করা হয়। হিন্দুদের সম্পর্কে ব্রিটিশরা যে বদনাম করে থাকে তা খণ্ডন করার জন্য শাখাগুলির কাজকর্ম পরিচালিত হয়। হিন্দুদের অনৈক্যের প্রধান দুটি কারণ জাতপাত ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সদস্যদের এই ঐতিহাসিক দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। অদ্ভুত হচ্ছে মুসলিমদের আদর্শ করেই তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সদস্যদের মুসলিমদের মতো শারীরিক ভাবে শক্তিশালী হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়, তাঁদের মতো সম্প্রদায়গত ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়। এমনকি

হেডগেওয়ারের গুরু বি এস মুঞ্জে মুসলিমরা যে ভাবে 'সংগঠিত হিংসা' (organised violence) চালনা করেন, হিন্দুদের তা নকল করতে বলেন। মুঞ্জে মুসলিমরা যে পুরুষোচিত সতর্কতার সঙ্গে নিজেদের জাতির স্বার্থ রক্ষা করতেন সেটার প্রশংসা করতেন এবং হিন্দুদের চরিত্রে এই গুণের অভাবের জন্য আক্ষেপ করতেন। ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র মুসলিমদের সমকক্ষ হওয়ার জন্য মুঞ্জে মাংস খাওয়া শুরু করেন।

পুরো তিরিশের দশক জুড়ে আরএসএস দেশজুড়ে শাখা বিস্তারের ওপর জোর দেয়। আরএসএস ক্যাডাররা এই শাখা পরিচালনা করতেন। এর জন্য তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ১৯২৭ সালে প্রথম প্রশিক্ষণ শিবিরে কিছু সদস্যকে 'প্রচারক' হিসাবে তৈরি করা হয়। প্রচারকরা নিজের কর্মজীবন, পরিবার ছেড়ে পুরোপুরি সংগঠনের কাজে নিজেদের আত্মনিয়োগ করতেন। এঁদের পরিশ্রমের কারণে ১৯৪৭ সালে সারা দেশ জুড়ে ৬০০০০০ শাখা স্থাপিত হয়।

আরএসএস এবং হিন্দু মহাসভা

আরএসএস এবং হিন্দু মহাসভার মধ্যেকার সম্পর্ক আলোচনা করা দরকার কারণ মহাসভার গর্ভ থেকেই সংঘের জন্ম। এছাড়া আরএসএস সব সময় অস্বীকার করেছে যে গান্ধী হত্যাকারী নাথুরাম গডসে তাঁদের সদস্য। ১৯৯৪ সালে ফ্রন্টলাইনে একটি সাক্ষাৎকারে নাথুরামের ভাই গোপাল গডসে বলেন যে আরএসএসের দিক থেকে এটা কাপুরুষতা যে তাঁরা নাথুরামকে নিজেদের সদস্য বলে স্বীকার করেন না। ১৯৪৪-এ নাথুরাম যখন হিন্দু মহাসভার কাজ করা শুরু করেন, তখন তিনি ইতিমধ্যেই আরএসএসের একজন বৌদ্ধিক কার্যকর্তা। আরএসএস গঠন করার ক্ষেত্রে হিন্দু মহাসভার বিশাল অবদান ছিল। হেডগেওয়ার নিজে মহাসভার একজন সেক্রেটারি ছিলেন। দুটি সংগঠন যাতে তাল মিলিয়ে চলতে পারে তার জন্য মহাসভার নেতারা আরএসএস ক্যাম্পে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর বক্তব্য রাখতে আসতেন। মহাসভার যোগাযোগের ওপর ভিত্তি করে আরএসএস উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। আরএসএস মহাসভা ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় কংগ্রেসের সঙ্গে মহাসভার ব্যবধান সৃষ্টি হয়। ১৯৩২ সালে কেন্দ্রীয় প্রদেশের (সিপি – সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস) সরকার সঙ্ঘের কাজকর্মকে সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করে এবং সরকারি কর্মচারীদের মহাসভার কাজকর্মে যোগদান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৩৪-এ গান্ধীকে হত্যার প্রথম প্রচেষ্টা হয়। কংগ্রেস তার সদস্যদের আরএসএস, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লিগের সঙ্গে যুক্ত হওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। গান্ধী হেডগেওয়ারের সঙ্গে দেখা করেন কিন্তু ওয়ার্ধাতে আরএসএস ক্যাম্পে যেতে অস্বীকার করেন। সাভারকারের 'তরুণ হিন্দু সভা' সঙ্ঘের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় সংগঠনের প্রসার ঘটে, পাশাপাশি দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাও বৃদ্ধি পায়।

বিনায়ক দামোদর সাভারকর

(১৮৮৩-১৯৬৬)

একদা ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী নেতা, পরবর্তীতে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রধান তাত্ত্বিক। উচ্চ শিক্ষা লাভের পাশাপাশি সহোদর গণেশ সাভারকারের সঙ্গে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামে যুক্ত হন। তাঁরা ১৯০৩ ও ১৯০৬ 'মিত্র মেলা' ও 'অভিনব ভারত সোসাইটি' দুটি গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। তিলকের অনুগামী সাভারকর বৃত্তি নিয়ে লন্ডনে গিয়েও শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার 'ইন্ডিয়া হাউজ' এবং ভিখাজি কামার 'ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাইটি'র মধ্যে দিয়ে বিপ্লবী কাজ চালান। লেখেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেনডেন্স'। ১৯১০-এ ব্রিটিশ পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে ভারতে পাঠায়। পথে মার্সাই বন্দরে তিনি জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে পালানোর চেষ্টা করেন এবং বীরের খ্যাতি অর্জন করেন। প্রথমে পুনের সেন্ট্রাল জেলে পরে ১৯১২-তে আন্দামানের সেলুলার জেলে অন্তরীণ হন। জেলে তাঁর ভাবান্তর ঘটে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে ১৯১১, '১৩ ও '১৭ সালে তিনবার চিঠি লেখেন ব্রিটিশ সরকারকে। অবশেষে তাঁদের দুই ভাইকে ১৯২১এ মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলে আনা হয় এবং ১৯২৪-এ ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর তিনি সশস্ত্র পথ ছেড়ে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিতে মন দেন। ব্রিটিশ সরকারের থেকে মাসোহারা পেতে ও তাদের সহায়তা করতে থাকেন। ১৯৩৭ থেকে '৪৩ অবধি হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৮-এ গান্ধী হত্যার ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হন। তাঁর সময় বাংলায় কৃষক প্রজা পার্টি ও সিন্ধে মুসলিম লিগের মন্ত্রীসভায় হিন্দু মহাসভা যোগ দেয়। প্রচুর লেখালেখি করেছেন।

আরএসএস এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম

সাভারকার ১৯২৩ সালে তাঁর হিন্দুত্ব বিষয়ক গ্রন্থে দ্বিজাতি তত্ত্ব সমর্থন করেছিলেন। সেদিক থেকে তিনি ছিলেন এই তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা। ১৯৩৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর হিন্দু মহাসভার সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন, ভারতবর্ষে প্রধানত দুটি জাতি হিন্দু এবং মুসলিম। এক বছর বাদে বললেন আমাদের দেশে হিন্দুরাই প্রধান জাতি আর মুসলিম সংখ্যালঘু একটি গোষ্ঠী। মিস্টার জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের সঙ্গে আমার কোনও বিরোধ নেই, তিনি বলেন। আমরা হিন্দুরা পৃথক একটা নেশন এবং এটা ঐতিহাসিক সত্য যে হিন্দু এবং মুসলিমরা আলাদা নেশন, ১৯৪৫ অবধি সাভারকার এটাই বারবার বলে গেছেন। এই কারণে দেশভাগের সময় যে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক হানাহানি দেখা যায় সেটার জন্য জিন্না ও মুসলিম লিগ যতটা দায়ী, সাভারকার এবং হিন্দু মহাসভা ও আরএসএসও ততটাই দায়ী।

১৯৪০ এর দশকে সারা দেশ জুড়ে ব্রিটিশ-বিরোধী অনেক বড় বড় আন্দোলন হয়— ১৯৪০-৪১ এর আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪৪-এ নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক অভিযান, ১৯৪৫-৪৬ আইএনএ

বিচারকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ, ১৯৪৬-এর নৌবিদ্রোহ ইত্যাদি। এই সব আন্দোলনে আরএসএস কোনওভাবেই অংশগ্রহণ করেনি। ১৯৪৬-৪৭ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় জিন্নার মুসলিম লিগের মতো আরএসএসেরও প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে আরএসএস-মহাসভার ভূমিকা ছিল ন্যক্কারজনক। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ওই সময় বাংলায় অর্থমন্ত্রী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী 'ভারত ছাড়ো' আওয়াজ তোলার পর তিনি পদত্যাগ করেননি, উল্টে তিনি প্রস্তাব দেন, " বাংলায় কী ভাবে এই আন্দোলনকে রোখা যায়? প্রশাসন এমন ভাবে পরিচালনা করা উচিত যে কংগ্রেস প্রবল ভাবে চেষ্টা করলেও যাতে প্রদেশে এই আন্দোলন দানা বাঁধতে না পারে। ...ভারতীয়দের ব্রিটিশদের ওপর আস্থা রাখতে হবে, সেটা ব্রিটিশদের কোনও সুবিধা পাইয়ে দেবার জন্য নয়, কিন্তু প্রদেশকে রক্ষা করার জন্য এবং স্বাধীনতার জন্য।" বাংলার মত সিন্ধ প্রদেশে মুসলিম লিগ -হিন্দু মহাসভা সরকার ক্ষমতায় ছিল, তারা পাকিস্তান গঠনের দাবির পক্ষে রায় দেয়। শ্যামাপ্রসাদ সহ মহাসভার কোনও মন্ত্রী পদত্যাগ করেননি। সাভারকার নির্দেশ দেন তাঁদের সরকারকে সমর্থন করা উচিত এবং পদত্যাগ না করে তাঁদের প্রাত্যহিক দায়িত্ব পালন করা উচিত। বাস্তবে ৩১ আগস্ট, ১৯৪২ তাঁরা একটি প্রস্তাব নেন যাতে বলা হয় যে মহাসভার সব সদস্য নিজেদের কাজ করবেন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করবেন।

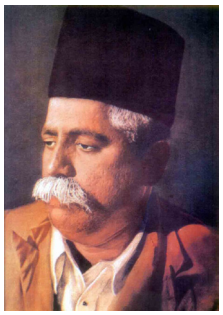

কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার

(১৮৮৯-১৯৪০)

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা এবং সঙ্ঘ পরিবারে ডাক্তারজী নামে পরিচিত। নাগপুরে জন্ম হেডগেওয়ার প্লেগ মহামারীতে ১৩ বছর বয়সে বাবা-মাকে হারান। ছাত্রাবস্থায় 'বন্দেমাতরম' শ্লোগান দেওয়ায় স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছিল। মুনজের ঘনিষ্ঠ অনুগামী তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯১০-এ কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯১৬-তে এল.এম.এস. পাশ করেন। এই পর্যায়ে তিনি অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৭-তে নাগপুরে ফিরে এসে তিনি চিকিৎসার কাজে যোগ দেন। কংগ্রেসের হিন্দুস্তানী সেবাদলের হয়ে আন্দোলনের সময় তিনি গ্রেফতার হন। গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। ১৯২৫-র বিজয়া দশমীর দিন তিনি নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আর.এস.এস.) প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯২৫-'৩০ এবং ১৯৩১-'৪০ আর.এস.এসের সরসঙ্ঘচালক থাকেন। মাঝে এক বছর অরণ্য সত্যাগ্রহ করে কারাবন্দী থাকেন।

আরএসএস ও গান্ধী হত্যা

৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮ গান্ধী হত্যা এবং তার ফলস্বরূপ আরএসএস নিষিদ্ধ ঘোষণা হওয়া নিয়ে চর্বিতচর্বণ করার কোনও প্রয়োজন মনে করছি না। বরঞ্চ সেই চাঞ্চল্যকর ঘটনার পরবর্তী প্রায় আট দশক জুড়ে কী ভাবে গান্ধীর প্রতি লোকদেখানো সম্মান প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আরএসএস এবং সঙ্ঘ পরিবার, প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে, নাথুরাম গডসেকে মহিমান্বিত করেছে সেটা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত ফ্রন্টলাইন পত্রিকার সাক্ষাৎকারে গোপাল গডসে বলেন তিনি এবং নাথুরাম দু'জনেই আরএসএসে বড় হয়েছেন। সবাইকে চমকে দিয়ে তিনি বলেন গান্ধী মৃত্যুর পূর্বে আদৌ 'হে রাম' বলেননি, এটা সম্পূর্ণ কংগ্রেসের তৈরি করা একটি মিথ। ১৯৯৮ সালে আউটলুক পত্রিকায় তৎকালীন আরএসএস প্রধান রাজেন্দ্র সিং বলেন, "গডসের উদ্দেশ্য ভালো ছিল, কিন্তু তিনি ভুল রাস্তা অবলম্বন করেছিলেন।" পরবর্তী সময়ে গডসেকে ইতিহাসের পাঁক থেকে উদ্ধার করে তাঁকে পুনর্বাসিত করার এই প্রবণতা আরও জোরদার হয়েছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার এক বছর বাদেই হিন্দু মৌলবাদী অশোক শর্মা মিরাটে গডসেকে উৎসর্গ করে এক মন্দির কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেন। শর্মা এবং তাঁর অনুসারীরা প্রতিদিন গডসের মূর্তির সামনে প্রার্থনা করেন, ধর্মীয় বক্তৃতা দেন এবং গান্ধীর বিরুদ্ধে জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনা হয়। ২০১৪ সালে নির্বাচিত সাংসদ বিজেপির সাক্ষী মহারাজ গডসেকে দেশভক্ত বলে বন্দনা করেন। এরপরেও ২০১৯ এর নির্বাচনে পুনরায় তাঁকে ভোটে প্রার্থী করা হয়। ২০১৯ সালে প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর সংসদের ভিতরে গডসেকে দেশপ্রেমিক আখ্যা দেন যা চতুর্দিকে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আরএসএস-বিজেপি নেতৃত্ব প্রকাশ্যে এঁদের বক্তব্যের বিরোধিতা করলেও আজ অবধি এঁদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয়নি। ২০২১ সালে গোয়ালিয়রে গডসে জ্ঞানশালা উদ্বোধনে বহু মানুষ জড়ো হন। এই সভায় হিন্দু মহাসভার জাতীয় সম্পাদক দেবেন্দ্র পান্ডে পরিষ্কার বলেন, "গান্ধীকে হত্যা করে গডসে ঠিক কাজই করেছেন।" পান্ডে বলেন এই ধরনের জ্ঞানশালাগুলি পরবর্তী প্রজন্মকে শেখাবে যে গডসে একজন জাতীয়তাবাদী শহীদ ছিলেন। মহাসভা মে মাসে গডসের জন্মদিনকে একটি পবিত্র দিন হিসাবে উদ্‌যাপন করে। এখন হিন্দুত্ববাদীদের অনেকের মতামত গান্ধী ও গডসে উভয়েই দেশভক্ত; একই সঙ্গে সংখ্যায় কম, কিন্তু যে সংখ্যাটা ক্রমবর্ধমান, তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে গডসে দেশভক্ত, কিন্তু গান্ধী গদ্দার!

সঙ্ঘ পরিবারের দ্বিচারিতা পরিষ্কার হয়ে যায় যখন তাঁর দল বা ঘনিষ্ঠ সংগঠনের বিভিন্ন ব্যক্তির গডসে বন্দনার পাশাপাশি মোদী গান্ধীকে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁর আধ্যাত্মিক আশ্রমে গিয়ে তাঁর আদর্শ ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে উচ্ছসিত প্রশংসা করেন।

আরএসএস ও সঙ্ঘ পরিবার

স্বাধীনতার পরে আরএসএস বিভিন্ন শাখা সংগঠন গড়ে তোলার ওপর জোর দেয়। এটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ১৯৫২ সালে প্রথম লোকসভা নির্বাচনে দেখা যায় ভোটের মানচিত্রে হিন্দুত্ববাদীদের অবস্থান

নিতান্তই প্রান্তিক (জন সঙ্ঘ – ৩, হিন্দু মহাসভা – ৪, আর 'রাম রাজ্য পরিষদ' – ৩)। একই নির্বাচনে তিনটি প্রধান বাম দল একত্রিত ভাবে ৩৭টি আসন জেতে। বিভিন্ন শাখা সংগঠন কোন সালে স্থাপিত হয় তার একটি তালিকা দেওয়া হল (মহিলা সংগঠন রাষ্ট্রসেবিকা সমিতি সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে) :

- অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) – ১৯৪৮
- ভারতীয় জনসংঘ – ১৯৫১
- বনবাসী কল্যাণ আশ্রম – ১৯৫২ (মূলত আদিবাসীদের মধ্যে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রভাব রোধ করার জন্য এই সংগঠনটি স্থাপিত হয়)
- ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ (বিএমএস) – ১৯৫৫
- বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) – ১৯৬৪ (এই সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিত করা, খ্রিস্টানদের দ্বারা ধর্মান্তকরণ বন্ধ করা, এবং হিন্দুদের জন্য গির্জার মতো একটা কাঠামো প্রস্তুত করা)।
- ভারতীয় কিসান সঙ্ঘ --- ১৯৬৮
- বিদ্যা ভারতী – ১৯৭৭ (প্রায় ১২০০০ স্কুল, সরস্বতী শিশু মন্দির, পরিচালনা করে)।
- সেবা ভারতী – ১৯৭৯ (বস্তি, আদিবাসী অঞ্চল, প্রাকৃতিক দুর্যোগের অঞ্চলে সেবামূলক কাজ করে)
- ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) – ১৯৮০ (আরএসএসের রাজনৈতিক সংগঠন, জন সঙ্ঘের উত্তরসূরি)
- বজরং দল – ১৯৮৪ (জঙ্গি সংগঠন, মূলত যুবকদের নিয়ে গঠিত ঝটিকা বাহিনী, Stormtroopers। নেতাদের নিরাপত্তা দেওয়া থেকে শুরু করে হিংসাত্মক হামলা, সবকিছু করতে এরা সিদ্ধহস্ত)।
- স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ— ১৯৯১ (স্বনির্ভর ভারতের ওপর জোর দেয়। বিশ্বায়ন, বহুজাতিক সংস্থার বিরোধিতা করতো। নয়া উদারবাদী অর্থনীতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এরা প্রায় একটি প্রান্তিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে)।
- মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ – ২০০২

এছাড়া হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, সংস্কার ভারতী, ধর্ম জাগরণ বাল সংস্কার কেন্দ্র, ভারতীয় জনসেবা সংস্থান, ভারত কল্যাণ প্রতিষ্ঠান, একাল বিদ্যালয়, বনবন্ধু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ ইত্যাদি সংগঠন আছে। সনাতন সংস্থা, শ্রী রাম সেনা, হিন্দু জাগৃতি সঙ্ঘের মতো ছায়া সংগঠন আছে যেগুলিকে আরএসএস নানা অকাজে, কুকাজে ব্যবহার করে কিন্তু প্রকাশ্যে এদের সঙ্গে সংস্রব অস্বীকার করে।

আরএসএস এবং সংসদীয় রাজনীতি

মহাত্মা গান্ধীর হত্যার মূল অভিযুক্ত নাথুরাম গডসেকে আরএসএস-ঘনিষ্ঠ মনে করা হতো। সেই কারণে ওই আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনার কয়েক দিন বাদেই আরএসএসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সংগঠনের ২০০০০ স্বয়ংসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়, আরও অনেকে পালিয়ে যান বা আত্মগোপন করেন। দেশের সমাজ-রাজনীতিতে আরএসএসের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হয়, মূল ধারার সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী সরকারের পদক্ষেপকে সমর্থন করে। এর ফলে সংগঠন একঘরে হয়ে পড়ে। এই নিঃসঙ্গতা সরসঙ্ঘচালক গোলওয়ালকারকে ভাবিত করে। তিনি সংগঠনের নিজস্ব রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। এই ভাবেই ১৯৫১ সালে ভারতীয় জনসঙ্ঘ গঠিত হয়। গোলওয়ালকার কিছু প্রচারককে ওই দল গড়ে তোলার কাজে নিযুক্ত করেন। নতুন দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী; অন্যতম দুই নেতা ছিলেন বলরাজ মাধোক এবং দীনদয়াল উপাধ্যায়।

প্রায় আড়াই দশক ধরে জনসঙ্ঘ, যে কট্টর হিন্দু মৌলবাদী ভাবমূর্তি আরএসএসের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়ার কারণে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল, সেটার থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। এই কারণে তারা নিজেদের বারবার একটি মধ্যপন্থী দল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। কিন্তু সেটা করেও নির্বাচনি ময়দানে তাদের সাফল্য উল্লেখযোগ্য কিছু নয় (১৯৬৭-৩৫ আসন, ১৯৭১-২২ আসন)। ১৯৭৫-এ ইন্দিরা গান্ধীর জারি করা জরুরি অবস্থা তাদের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে গড়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়। জয়প্রকাশ নারায়ণের স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলনে তারা বিপুল ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং ওই সূত্র ধরে নবগঠিত জনতা দলে গুরুত্বপূর্ণ শরিক হয়ে যায়।

জনতা পার্টির সরকারে জনসঙ্ঘীরা তিনটি হিন্দুত্ববাদী দাবি নিয়ে সরব হন। তাঁরা গোহত্যা বন্ধ করার লক্ষ্যে আইন তৈরি করার ওপর চাপ দেন। দ্বিতীয়ত তাঁরা খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে ধর্মান্তকরণের অভিযোগ আনেন এবং ধর্মান্তকরণ- বিরোধী আইন প্রণয়নের দাবি তোলেন। তৃতীয়ত তাঁদের মতে জাতীয়তাবাদী ও মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকরা ভারতীয় ইতিহাসকে বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সঙ্ঘীরা দাবি তোলেন যে এই ইতিহাস সংশোধন করতে হবে। এছাড়া জনতা দলের অন্য শরিকদের অভিযোগ ছিল যে জনসঙ্ঘী সাংসদরা অনেকেরই দ্বৈত সদস্যপদ রয়েছে, অর্থাৎ দলের সদস্য হওয়া ছাড়াও তাঁরা অন্য কোনও সংগঠনের অনুগত ছিলেন। এই সব প্রশ্নে দলের মধ্যে ভাঙন ধরে এবং সঙ্ঘীদের দল থেকে বিতাড়িত করা হয়। এই জনসঙ্ঘীরা ১৯৮০ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) গঠন করে।

আরএসএস, সঙ্ঘ পরিবার ও সাম্প্রদায়িকতা

তিস্তা শেতলবাদ তাঁর বই 'বিয়ন্ড ডাউটঃ আ ডোজিয়ার অন গান্ধীজ অ্যাসাসিনেশন'-এ লিখছেন আরএসএস যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জড়িত ছিল তার প্রমাণ ১৯৪৮ সালেই পাওয়া গেছিল। ওই বছর উত্তর ভারতের একটি শহরে আরএসএস_অফিসে হানা দিয়ে পুলিশ বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, এলাকার ম্যাপ এবং নাশকতার প্রমাণস্বরূপ নানা নথিপত্র উদ্ধার করে। এমনকি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা করতে যে গোলওয়ালকার নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেটার প্রমাণও পাওয়া যায়। পুরো ঘটনাটা প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী জি বি পন্থকে জানান হয়। প্রশাসন দিনের

পর দিন আলোচনা করে, নানা অজুহাতে টালবাহানা করে। ইতিমধ্যে গোলওয়ালকার আত্মগোপন করেন। শেষমেষ শুধুমাত্র একটি চিঠি দিয়ে ঘটনায় ইতি টানা হয়।

তিস্তা আরও লিখছেন যে কোনও দাঙ্গার পর যে সব তদন্ত কমিশন হয়েছে সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটি আরএসএস বা সঙ্ঘীদের কোনও সংগঠনকে হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য দায়ী করেছে। তিনি যে সব কমিশনের উল্লেখ করেছেন সেগুলি হলঃ ১৯৬৯ সালে আহমেদাবাদ দাঙ্গার তদন্তকারী জাস্টিস জগমোহন রেড্ডি কমিশন; ১৯৭৯ সালে জামশেদপুর দাঙ্গা তদন্তকারী জাস্টিস জোসেফ ভিথ্যাথিল কমিশন; ১৯৮২ সালে কন্যাকুমারীতে হিন্দু-খ্রিস্টান দাঙ্গা তদন্তকারী জাস্টিস ভেনুগোপাল কমিশন; ১৯৯২-৯৩ সালে বোম্বে দাঙ্গা তদন্তকারী জাস্টিস বি এন কৃষ্ণা কমিশন প্রভৃতি। কিন্তু নেহরু ও বল্লবভাই প্যাটেলের পর কোনও কংগ্রেস নেতা বা সরকার আরএসএসের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার সাহস দেখাতে পারেননি। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে জাতপাত নির্বিশেষে সমস্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ সংঘকে সমর্থন করে; তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নিলে হিন্দুরা কংগ্রেসের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবে। বাস্তবে নরেন্দ্র মোদীর উত্থানের আগে পর্যন্ত আরএসএস এবং সঙ্ঘ পরিবার ছিল মূলত ব্রাহ্মণবাদী সংগঠন। একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে তাদের গণভিত্তি আরও প্রসারিত হয়েছে।

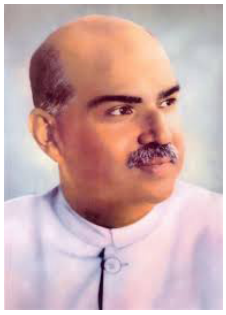

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(১৯০১-১৯৫৩)

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্যামাপ্রসাদ নিজেও একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও আইনজ্ঞ। তিনি ১৯৩৪ থেকে '৩৮ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন এবং ১৯২৯-'৪৭ অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দল প্রার্থী হিসাবে বাংলা বিধানসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৪১-'৪২-এ বাংলার ফজলুল হক মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৬-'৫০ অবধি ইন্ডিয়ান কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সদস্য ছিলেন। ১৯৪৩-'৪৭ হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৭-'৫০ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার শিল্প ও ব্যাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন। নেহরু-লিয়াকত চুক্তির বিরোধিতা করে মন্ত্রীসভা ছাড়েন এবং গান্ধীর হত্যার নিন্দা করে হিন্দু মহাসভা ছাড়েন। ১৯৫১-এ প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জনসঙ্ঘ দলের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাংসদ ছিলেন। তিনি সংসদের দুই কক্ষ মিলিয়ে ৩২ জন সাংসদকে নিয়ে বিরোধী জোট 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' গড়ে তোলেন। কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার বিরোধিতা করে তিনি কাশ্মীর অভিযান করেন এবং সেখানে তাঁর রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়।

আরএসএস, সঙ্ঘ পরিবার, অযোধ্যা আন্দোলন ও তারপর

জন্মলগ্ন থেকে আরএসএস হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে সমাজ-রাজনীতিতে কিছু বুনিয়াদী পরিবর্তনের দাবি করে এসেছে। এগুলি হল মূলত, গোরক্ষা, ধর্মান্তকরণ (কল্পিত বা বাস্তব) বিরোধী আইন প্রণয়ন করা, বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দির স্থাপন করা, ধারা ৩৭০ বাতিল করা, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা, এতদিন যাবত যা ইতিহাস পড়ান হচ্ছে তা সংশোধন করা, তথাকথিত সংখ্যালঘু তোষণ বন্ধ করা, সেকুলার শব্দটা বর্জন করা। এই দাবিগুলি বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে পুরো আশি ও নব্বইয়ের দশক এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক জুড়ে বিজেপি দোদুল্যমান থেকেছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য এরা কখনো এই দাবিগুলি এড়িয়ে চলেছে, আবার কখনো রাজনীতির ময়দানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই দাবিগুলি নিয়ে সরব হয়েছে। এই সময়ের প্রধান ঘটনাগুলি এবং আরএসএস-বিজেপির ভূমিকা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পরে ১৯৮৪'র নির্বাচনে 'সহানুভূতির ঢেউ'-এর কারণে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মাত্র দুটি আসনে জয়লাভ করে। এর এক বছরের মধ্যে শাহবানু মামলায় রাজীব গান্ধী সরকার সুপ্রিম কোর্টের রায়কে খারিজ করে শরিয়তকে গুরুত্ব দেওয়ায় হিন্দু কট্টরপন্থীরা বিরোধিতায় সরব হয়। তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য ১৯৮৬'র শুরুতে রাজীব গান্ধী বাবরি মসজিদের তালা খুলে দেন। শাহবানু মামলায় আদালতের রায় খারিজ করা এবং বাবরি মসজিদের তালা খুলে দেওয়া এই জোড়া সিদ্ধান্ত ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বহু দিনের দাবি পূরণ হল, হিন্দু মৌলবাদীরা নতুন উদ্যমে রামমন্দির স্থাপন করার আন্দোলন শুরু করল। যে বিজেপির প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল তারা ১৯৮৯ এর নির্বাচনে ৮৯টি আসনে জয়লাভ করল এবং পুনরায় ক্ষমতার দোরগোড়ায় চলে এল। এরপর থেকে ২০০৯ বাদে প্রতিটি লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি অন্তত ২০% ভোট পেয়েছে এবং একশোর অধিক আসনে জয়লাভ করেছে। ১৯৮৯-এ তারা জনতা দলের সরকারকে সমর্থন করলো এবং পরের বছর যখন প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিংহ মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করলেন তখন সেটার মোকাবিলা করতে এল কে আদবানি রামমন্দির গড়ার লক্ষ্যে দেশজুড়ে রথযাত্রা শুরু করলেন। শুরু হল মন্ডল বনাম কমন্ডলু রাজনীতি। এর ফলে উত্তর ভারতে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ হল এবং পরের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ১১৯টি আসনে জয়লাভ করল, কিন্তু তবুও তাদের বিরোধী আসনেই বসতে হল। ১৯৯৬ এবং ১৯৯৮ পরপর দুটি লোকসভা নির্বাচনে সর্বোচ্চ আসনে (যথাক্রমে ১৬০ ও ১৭৮) জয়লাভ করা সত্ত্বেও, কোনও রাজনৈতিক দল তাদের সঙ্গে জোট করতে রাজি না হওয়ায়, বিজেপি কেন্দ্রে স্থায়ী সরকার গড়তে ব্যর্থ হল। এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে প্রথমত অযোধ্যায় মন্দির নিয়ে আন্দোলন করা সত্ত্বেও দল ভৌগোলিক ভাবে মোটামুটি উত্তর ও কিছুটা পশ্চিম ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ; দ্বিতীয়ত মন্দির ইস্যুকে

কেন্দ্র করে জাতপাত নির্বিশেষে হিন্দুদের একত্রিত করার যে চেষ্টা সঙ্ঘ পরিবার করেছিল তা সীমিত সাফল্য পেয়েছে, নিম্নবর্ণ ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির বড় অংশকে এর দ্বারা প্রভাবিত করা যায়নি; তৃতীয়ত তাদের কট্টর রাজনৈতিক নীতির কারণে অন্যান্য রাজনৈতিক দল তাদের সংস্রব এড়িয়ে চলতে চাইছে।

১৯৯৯-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে দল তাদের সাবেকি নীতি পরিহার করে জোট গড়ে তোলার ওপর জোর দিল। রামমন্দির ইত্যাদি বিষয়কে ব্যাকবার্নারে পাঠিয়ে দিয়ে দল সুশাসনের ভিত্তিতে জোট তৈরি করল। এটা নিয়ে আরএসএসের মধ্যে বিতর্ক হয় কিন্তু বাজপেয়ীর নেতৃত্বে তথাকথিত নরমপন্থীদের চাপে কট্টরপন্থীরা নতুন লাইন মেনে নিতে বাধ্য হয়। মধ্যপন্থী এই বিজেপির সঙ্গে কিছু দল হাত মেলাতে রাজি হল, তৈরি হল নতুন জোট – এনডিএ (ন্যাশানাল ডেমোক্রেটিক অ্যাল্যায়েন্স)। জোট রাজনীতির ওপর এতটাই জোর দেওয়া হল যে ভোটের আগে বিজেপি নিজেদের কোনও ইস্তাহার প্রকাশ করলো না, এনডিএ'র নামে ইস্তাহার প্রকাশিত হল। কিন্তু এত করেও বিজেপির মাত্র চারটে আসন বাড়ল, ১৭৮ থেকে তাদের আসন সংখ্যা দাঁড়াল ১৮২। পাঁচ বছর সরকার চালানর পর পরপর দুটি নির্বাচনে তারা আবার মুখ থুবড়ে পড়লো; ২০০৪ ও ২০০৯ এর নির্বাচনে তাদের আসন সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়াল যথাক্রমে ১৩৮ এবং ১১৬।

নরেন্দ্র মোদীর উত্থান

২০১১-১২ সালে আন্না হাজারের দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলন, নির্ভয়া আন্দোলন এবং দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের লাগামছাড়া দুর্নীতি বিজেপিকে আবার ক্ষমতা দখলের সুযোগ করে দিল। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর আগমন শুধু বিজেপি নয় ভারতীয় রাজনীতিতে এক বিপুল পরিবর্তন সূচিত করল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাত্র আট বছর বয়সে আরএসএসে যোগদান করেন। তিনি ধাপে ধাপে সংগঠনের ওপরে ওঠেন—প্রচারক, বিভাগ প্রচারক, প্রাদেশিক প্রচারক। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে আদবানি ১৯৮৭ সালে তাঁকে অর্গানাইজিং সেক্রেটারি করে বিজেপিতে নিয়ে আসেন। তাঁর আগমনের পর, কংগ্রেসের গড় বলে পরিচিত গুজরাটে, পুরসভা নির্বাচনে দল অভাবনীয় সাফল্য পায়। ২০০১ সালে স্বয়ং অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন তাঁকে কেশুভাই প্যাটেলের পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রী হবার প্রস্তাব দেন, তিনি প্রথমে সেই দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন আমি সংগঠনের লোক, সাংগঠনিক কাজ করতেই পছন্দ করি। অবশেষে তিনি রাজি হন এবং আমরা সবাই জানি..... বাকিটা ইতিহাস!

তিনি নিজেকে বঞ্চিত মানুষদের একজন হিসাবে তুলে ধরে, প্রতিষ্ঠান এবং (তাঁর ভাষায়) তথাকথিত শিক্ষিত, অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। ছাপান্ন ইঞ্চি ছাতির স্ট্রং ম্যান এবং পাহাড়প্রমাণ আধ্যাত্মিকতার ভাবমূর্তি তৈরি করে, তিনি বললেন আমি ত্রাতা, আমি, একমাত্র আমিই তোমাদের রক্ষা করতে পারি। বিষাক্ত মুসলিম বিদ্বেষ, উগ্র জাতীয়তাবাদ, মিথ্যা, অর্ধমিথ্যায় ভরা জ্বালাময়ী ভাষণকে হাতিয়ার করে, স্বাধীনতার পরে সবচেয়ে কুখ্যাত মুসলিম নিধনে অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ২০০২ সালের রাজ্য নির্বাচনে কংগ্রেসকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন। পরের বছর রাজ্যের তাবড় তাবড় ধনকুবেরদের বিরোধিতা সত্ত্বেও, অপরিচিত, আনকোরা গৌতম আদানিকে দিয়ে বিপুল সাফল্যের সঙ্গে 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাট' অনুষ্ঠিত করলেন। টানা বারো বছর তিনি কংগ্রেসকে গুজরাটে দাবিয়ে রাখলেন, বুঝিয়ে দিলেন তাঁর ব্রান্ডের 'পপুলিস্ট' রাজনীতি দিয়ে আম আদমি থেকে ধনিক সম্প্রদায়, সবাইকে প্রভাবিত করা যায়।

২০১৪'র নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি আদবানির মধ্যপন্থার লাইন বর্জন করলেন। তাঁর রাজনীতি আগ্রাসী হিন্দুত্ব এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের মিশেল, যে শরিকরা এটা মানবে তারাই শুধু তাঁর এনডিএ-তে থাকবে। আরএসএস পুরোপুরি তাঁকে সমর্থন করাতে আদবানি কোণঠাসা হয়ে বাণপ্রস্থে চলে গেলেন। শোনা যায় এই নির্বাচনে প্রথম আরএসএস বিজেপি প্রার্থীদের জেতানোর জন্য বুনিয়াদী স্তরে প্রচার করেছে। বিজেপি ৩১% ভোট এবং ২৮২টি আসনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসীন হল। ২০১৯-এ দল আরও বড় ব্যবধানে নির্বাচন জিতেছে, ২০২৪-এ ৬৩টি আসন সংখ্যা কমে যাওয়ায় তাদের শরিকদের ওপর নির্ভর করে সরকার গড়তে হয়েছে, কিন্তু এর ফলে হিন্দুত্বের এজেন্ডা রূপায়ণ করা বন্ধ হয়নি।

১০০ বছর ও তারপর

১৯৮০ সালে বিজেপি গঠিত হওয়ার পর থেকে আরএসএস এবং বিজেপির সম্পর্ক নানা টানাপড়েনের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। আরএসএস তাদের বুনিয়াদী দাবিগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য বিজেপির ওপর নির্ভর করেছে। বিভিন্ন ইস্যুতে কখনো দুটি সংগঠন এক মত হয়েছে আবার কখনো ভিন্ন মত পোষণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বিজেপি কংগ্রেস-মুক্ত ভারতের আওয়াজ তুললেও, আরএসএস কিন্তু এই ব্যাপারে নীরব থেকেছে। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের সময় এক আরএসএস কার্যকর্তার বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে; তিনি বলেছিলেন কংগ্রেস জিতলেও আমাদের কোনও ক্ষতি হবে না কারণ তারাও আমাদেরই কর্মসুচি রূপায়িত করবে। এটা আজ সর্বজনবিদিত যে আরএসএস জরুরি অবস্থার সময় গোপনে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সমঝোতা করেছিল। অভিযোগ ১৯৮৪-তে শিখ নিধন যজ্ঞেও তারা কংগ্রেসি গুন্ডাদের সাহায্য করেছিল।

পরপর তিনটে লোকসভা নির্বাচন জেতার কারণে নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির দাপট আজ এতটাই যে খোদ আরএসএস এখন বিপন্ন বোধ করছে। ২০২৪ নির্বাচনের প্রাক্কালে জে পি নাড্ডা বলেন প্রথম দিকে বিজেপির আরএসএসকে প্রয়োজন হলেও এখন আর তাঁরা সংঘের ওপর নির্ভরশীল নন, নিজেদের কাজকর্ম তাঁরা নিজেরাই সামলাতে পারবেন! এই মন্তব্য আরএসএস কে ক্ষুব্ধ করে। আরএসএস ক্যাডাররা নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। বিজেপির আসন সংখ্যা ৩০৩ থেকে কমে ২৪০ হয়ে যাওয়ার পিছনে

এটা অন্যতম একটি কারণ। এছাড়া বিজেপি ব্যক্তি সর্বস্ব দলে পরিণত হওয়া, মোদী কি গ্যারান্টি, মোদীর পার্টি, হিন্দুত্বর পরিবর্তে মোদীত্ব গুরুত্ব পাওয়ার কারণে জনমানসে সংঘের ভাবমূর্তি ধাক্কা খেয়েছে। স্বয়ং সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য, আমিত্ব বর্জন করার কথা বলেছেন। বলছেন সংঘের আদর্শ অনুযায়ী প্রথমে দেশ, দ্বিতীয় সংঘ, সবশেষে ব্যক্তি।

সঙ্ঘ ও দলের সম্পর্ক আরও মসৃণ করতেই হয়তো নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর গত মার্চ মাসে প্রথম বার নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সদর দপ্তরে যান। তিনি সংঘকে ভারতীয় সংস্কৃতির 'বটবৃক্ষ' বলে অভিহিত করেন। তিনি অতীতের সরসঙ্ঘচালকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, সংঘের কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বোঝাই যায় দুটি সংগঠনের মধ্যে সম্পর্কের মেরামত করা, প্রধানমন্ত্রীর পছন্দসই ব্যক্তিকে দলের সভাপতি নির্বাচন করা ইত্যাদি কারণেই তাঁর এই সফর। এটা ছাড়াও এই সেপ্টেম্বরে মোদীর ৭৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। সংগঠনের নীতি অনুযায়ী তাঁকে বাণপ্রস্থে ঠেলে দেওয়া হবে, নাকি তিনি অপরিহার্য, নিজের পদেই বহাল থাকবেন সেটাও একটা বিচার্য বিষয়। বিজেপি মাইনাস মোদী কি একই রকম ভাবে দাপুটে ও প্রভাবশালী হতে পারবে, সেটাও এক বড় প্রশ্ন?

এর চেয়ে বড় প্রশ্ন আরএসএসের ১০০ বছর, প্রধানমন্ত্রী মোদীর ১১ বছরের শাসনকালে ভারতের গণতন্ত্র যে মুমূর্ষ অবস্থায় পতিত হয়েছে সেখান থেকে উদ্ধারের উপায় কী আছে? আজ উত্তর ও পশ্চিম ভারতের প্রায় পুরো অঞ্চলেই অলিখিত ভাবে হিন্দু রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে। সেখানে বাস্তবে মুসলিমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, প্রতিবাদ বিক্ষোভ অত্যন্ত সীমিত, প্রতিবাদীরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাবন্দী। দেশের প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠান সংঘীদের কুক্ষিগত, বিচারব্যবস্থা প্রতিনিয়ত তাদের হুমকির মুখে, দেশের উন্নয়ন, অর্থনীতি ক্রোনি ধনকুবেরদের ঘেরাটোপে বন্দি। বিজেপির বাইরে যে দলগুলি দুচারটে রাজ্যে ক্ষমতায় আছে তারা আরও জোরদার, কট্টর হিন্দুত্ব অনুশীলন করে হিন্দুত্ববাদীদের বি টিমে পরিণত হয়েছে। হৈ হৈ করে আর এস এসের একশো বছর পালিত হবে বটে, কিন্তু তাদের মতাদর্শের ঠেলায় ভারতের গণতন্ত্র আজ শুধু বিপন্ন নয়, মরণাপন্ন।

তথ্যসূত্র:

- মোদীজ ইন্ডিয়া – ক্রিস্টোফ জাফ্রেলট
- বিয়ন্ড ডাউট: আ ডোজিয়ার অন গান্ধীজ অ্যাসাসিনেশন: তিস্তা শেতলবাদ (সংকলন ও ভূমিকা)
- হিন্দু জাতীয়তাবাদ: সূচনাকাল থেকে বর্তমান শাসনব্যবস্থা – রাম পুনিয়ানি (হিন্দুত্ব, ফ্যাসিবাদ ও ভারতবর্ষ বই থেকে)
- সাভারকার ও হিন্দুত্ব: এ জি নুরানী
- www.hindustantimes.com – 01 Jun, 2019
- www.newindianexpress.com – 27 Jan, 2023
- theguardian.com – 17 Jan, 2021

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট ২০২৫-২০২৬

আর্থিক পরিস্থিতি (কোটি টাকায়)

	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬
রাজস্ব ঘাটতি	৪৩,২৫১.৬৭	৩৫,৩১৪.৯৫
রাজকোষ ঘাটতি	৭৩,০১৭	৭৩,১৭৭
পুঞ্জীভূত ঋণ	৭,০৬,৫৩১	৭,৭১,৬৭০
ঋণ শোধ	৭৭,২২৮	৮১,৫১০
মোট রাজস্ব	২,২৭,৫৯০	২,৬৬,০৬০
মোট রাজস্ব ব্যয়	২,৭০,৮৫২	৩,০১,৩৭৫
কেন্দ্রীয় করে রাজ্যের অংশ	৯৬,০০৯	১,০৬,৯৯৮
রাজ্যের নিজস্ব আয়	৯৯,৮৬৩	১,১২,৫৪৩
সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন ও ষ্ট্যাম্প ডিউটি থেকে আয়	৭৮৮৫	১০,১০০
আবগারি থেকে আয়	২০,৪৪৪	২২,৫৫০
জিএসটি থেকে আয়		৪৯,৭৭২
বিক্রয়কর থেকে আয়		১৩,৯০৫
জিএসডিপির নিরিখে ঋণ (%)	৩৬.৮৮%	৩৭.৯৮%
জিএসডিপির নিরিখে রাজস্ব ঘাটতি	১.৭০%	১.৭৪%
জিএসডিপির নিরিখে আর্থিক ঘাটতি	৩.৬৩%	৩.৬০%

অভয়া আন্দোলন – সাফল্য ও ব্যর্থতা

সুকান্ত চক্রবর্তী*

গত বছর নয় আগস্ট আমাদের প্রিয় আরজি কর মেডিকেল কলেজে ঘটে যায় একটি অবিশ্বাস্য নৃশংস ঘটনা।

আর জি কর আমার নিজের ডাক্তারি শিক্ষার কলেজ। যে স্নাতকোত্তর চিকিৎসক-ছাত্রীর সাথে এই ঘটনা ঘটে সেও আমারই মতো উত্তর শহরতলির বাসিন্দা। আমারই মত মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রথম প্রজন্মের ডাক্তার। এইরকম একজন পরিবারের প্রথম ডাক্তারের সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর যে কি পরিমাণ আবেগ জড়িয়ে থাকে তা আমি নিজের জীবনে অনুভব করেছি।

যাইহোক সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যখন এই ঘটনা জানতে পারি ঘটনাচক্রে তখন অন্য একটি কাজে উপস্থিত ছিলাম এনআরএস মেডিকেল কলেজে। উপেক্ষা না করতে পেরে ছুটে যাই আমার প্রিয় আর জি কর-এ। ঐদিন সন্ধ্যায় গিয়ে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি দেখি। যে আর জি কর কে আমি চিনি, সেই আর জি কর-এ একজন অন ডিউটি পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনি চিকিৎসক এইভাবে খুন হলে গোটা আর জি কর ক্ষোভে ফেটে পড়ার কথা ছিল। পরিবর্তে দেখলাম গোটা কলেজ টা যেন বোবায় ধরেছে। চারিদিকে এক আতঙ্কের পরিবেশ। অভয়ার সতীর্থ বন্ধুরা যে কজন জড়ো হয়েছেন কারো মুখে কথা নেই। ভেতরে পোস্টমর্টেম চলছে। বাইরে পুলিশ, মানবাধিকার কমিশন ও রাজনৈতিক নেতাদের আনাগোনা।

কিছুক্ষণ পর তাদের এলাকার এক পরিচিতর মাধ্যমে অভয়ার কাকিমা দেখা করতে এলেন যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জির সঙ্গে। আমাদের উপস্থিতিতে বললেন ওনারা তাড়াহুড়ো করে আর জি কর-এ পোস্টমর্টেম চান না। নিরপেক্ষ জায়গায় দ্বিতীয় পোস্টমর্টেম চান। কিন্তু কোনভাবেই অভয়ার বাবা মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না। পরে জানতে পারি পুলিশ প্রশাসন বাবা মাকে আলাদা আলাদা ভাবে টালা থানা এবং আর জি কর-এর প্রিন্সিপাল অথবা সুপার অফিসে বসিয়ে রেখেছিলেন। ইতিমধ্যেই দিনের বেলা অভয়া আত্মহত্যা করেছে ইত্যাদি গল্প ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আমাদের ধারণা হয়েছিল পোস্টমর্টেমেও এরকম কিছু একটা বলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হবে। এই সময়ে হঠাৎ করে যখন পুলিশ অভয়ার মৃতদেহ বের করে নিতে যায় আমরাও ডিওয়াইএফআই কর্মীদের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ি বাধা দিতে। পুলিশ জবরদস্তি বল প্রয়োগ করে গাড়ি বের করে নিয়ে যায়। জানতে পারি শ্মশানে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে দাহ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

পোস্টমর্টেমে এত তীব্র এবং মারাত্মক, অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে যে কোনভাবেই এটিকে আত্মহত্যা বলে চালানো সম্ভব নয়। পরবর্তীতে কলকাতা পুলিশ সঞ্জয় রাই বলে একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার কে গ্রেফতার করে। যার মূল কাজ ছিল আর জি কর-এ পুলিশ প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতাদের পরিচিত রোগীদের দেখানো। এই সুবাদে হাসপাতালে সর্বত্র তার ছিল অবারিত দ্বার। বাবা মায়ের দাবিতে এবং জন আন্দোলনের চাপে হাইকোর্ট তদন্তের দায়িত্ব কলকাতা পুলিশের হাত থেকে নিয়ে দেয়া হয় সিবিআইকে। নির্ভয়া কাণ্ড খ্যাত সীমা আহুজা আসেন তদন্তকারী দলের নেতৃত্ব দিতে। সুপ্রিম কোর্টের তদানীন্তর প্রধান বিচারপতি ধনঞ্জয় চন্দ্রচূড় শত প্রণোদিত হয়ে অভয়া মামলা নিজের কাছে নিয়ে নেন। কিন্তু রহস্যজনকভাবে তদন্তকারী সংস্থা থেকে বিচারকারী সংস্থা পরিবর্তন হতে থাকে সবই; শুধু পরিবর্তন হয় না এক আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য বক্তব্যের। যা হলো একা সঞ্জয় রাই এই নৃশংস খুন ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়েছে।

আজও অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর নেই।

কি করে সবার নজর এড়িয়ে সঞ্জয় রাই মাঝরাতে ডিউটি রুমে পৌঁছে গেল?

ও জানলই বা কি করে যে অভয়া একা সেমিনার রুমে বিশ্রাম করছেন? ওটা তো সাধারণ ডিউটিরুম নয়।

কি করে ছোটখাটো চেহারার একজন মানুষ সুস্থ সবল তরুণী চিকিৎসককে এইভাবে নৃশংস অত্যাচার ও খুন করতে পারল?

সেমিনার রুমে মৃতদেহ যে অবস্থায় পড়েছিল সেটা কি ক্রাইম সিন হওয়া আদৌ সম্ভব?

অভয়ার সতীর্থ রা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা যারা ওই দিন অন ডিউটি ছিলেন তারা কেন কেউ কিছু জানেন না?

স্বাস্থ্য প্রশাসনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা পরের দিন সকাল থেকে ওখানে কি করে পৌঁছে গেলেন?

কেন সেমিনার রুম ভাঙ্গা হলো তদন্ত চলাকালীন?

কেন সরকার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে দিয়ে অন্য নিরপেক্ষ জায়গায় পোস্টমর্টেম করালো না?

কেনই বা দাহ করতে এই অস্বাভাবিক তাড়াহুড়ো?

সুপ্রিম কোর্ট শত প্রণোদিত হয়ে যখন মামলাটি গ্রহণ করেন তখন

সারা বাংলা, ভারত তথা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার পাওয়ার এক আশা তৈরি হয়েছিল। যদিও যে দ্রুততার সঙ্গে বিচার প্রক্রিয়া বা তদন্ত হওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছিল বাস্তবে তা কিছুই দেখা যায়নি। কলকাতা পুলিশ থেকে সিবিআই এর হাতে মামলা যাওয়ার ক্ষেত্রেও সেই একই প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার হতাশা। একটাই কথা যে নিচু তলার তদন্তকারী অফিসারেরা এত পরিশ্রম করলেন তারা কি ভবিষ্যতের জন্য কিছু সূত্র ছেড়ে রেখে যাচ্ছেন না? জনমতের চাপে এর আগে আমরা জেসিকা লাল হত্যা মামলার দেরিতে হলেও ন্যায় বিচার হতে দেখেছি। অভয়ার ক্ষেত্রে এইরকম কিছু হবার আশা যারা প্রথম দিন থেকে রাস্তায় ছিলাম তারা এখনো করছি। অভয়ার বাবা মার পাশে সব সময় আমরা আমাদের লিগাল টিম নিয়ে রয়েছি।

এ তো গেল আইন আদালতের লড়াইয়ের কথা।

অভয়া আন্দোলন এই কঠিন সময়ে দাঁড়িয়েও এক অভূতপূর্ব গণজাগরণের সূচনা করেছিল। চরম অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায় কে যখন স্বাভাবিক নিয়তি বলে মেনে নিয়ে মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ভুলে যাচ্ছিলেন, সেই সময় অভয়া তাঁর জীবন দিয়ে জনগণকে শিখিয়ে দিয়ে গেল যে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ শাসকের বিরুদ্ধে আজও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। এ এক অসম অথচ অসামান্য লড়াই। উদ্ধত শাসকের ঐক্যের বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্য। এই লড়াইতে মিডিয়ার সদর্থক ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না। হয়তো আপামর মানুষ চেয়েছিলেন বলেই মিডিয়া প্রত্যাশার বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল অভয়া আন্দোলনকে।

এমন এক সময়ে যেখানে চিকিৎসক ও রোগী একে অপরকে শ্রেণি শত্রু বলে মনে করতে শুরু করেছে; সেই সময়ে অভয়া আমাদের সকলকে মিলিয়ে দিয়ে গেলেন। মানুষ যেভাবে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশে এই আন্দোলনে দাঁড়িয়েছেন তার কোন নজির অতীতে বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর কারণ অভয়ার চিকিৎসক সত্তা ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠা তার ঘরের মেয়ের সত্তা। প্রত্যেকটা মানুষ ভাবতে শুরু করেছিলেন আমার ঘরের যে মেয়েটি স্কুলে যাচ্ছে, কলেজে যাচ্ছে, কাজে যাচ্ছে সে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারবে তো?

এই অসহায়তা, নিরাপত্তাহীনতা এবং এই অসহনীয় পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করার জেদ জন্ম দেয় ১৪ই অগাস্ট রাতের সেই ঐতিহাসিক রাত দখলের আন্দোলনের। লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নামেন ন্যায় বিচারের দাবিতে। সবার মনে তখন একটাই প্রশ্ন, এখনো যদি এই সমাজকে পরিবর্তন না করতে পারি, এই শাসকের টনক না নাড়াতে পারি, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কি পৃথিবী রেখে যাবো? সেই ঐতিহাসিক রাত দখলের আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করার জন্য শাসকের গুন্ডাবাহিনী আর জি কর মেডিকেল কলেজ আক্রমণ করে। আমি নিজেও আরো অনেকের সঙ্গে ট্রমা সেন্টারে সেই দিন আটকে পড়ি। দুষ্কৃতকারীরা সেমিনার রুম ভাঙচুর করারও চেষ্টা করে। সেই চেষ্টা সেদিন সফল হয়নি। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে পি ডব্লিউ ডি হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ কদিন পরে শুরু করতে যায় ওই বিতর্কিত সেমিনার রুমের পাশের বাথরুম ভেঙে। এ এক পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র।

আর জি কর মেডিকেল কলেজ যে দুষ্কৃতীরাজ, দুর্নীতি এবং অরাজকতার শিকার হয়েছিল গত কয়েক বছর ধরে, তারই চরম পরিণতি অভয়ার খুন ও ধর্ষণ। সেখানকার অধীক্ষক সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে গত কয়েক বছরে বারে বারে প্রতিবাদ আন্দোলন হয়েছে কিন্তু প্রতিবারই নির্মমভাবে প্রশাসনিক অত্যাচার চালিয়ে তাকে দমন করা হয়েছে। আমাদের ব্যর্থতা যে সাধারণ মানুষকে আমরা অবহিত করতে পারিনি এই নৈরাজ্য সম্পর্কে। মানুষ যখন জানতে পারলেন তখন প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন। অবশ্যই ইদানিং কালের রাজনীতি বিমুখতার যে ধারা দেখা যাচ্ছে সেই ধারা এই আন্দোলনেও অব্যাহত ছিল। এই আন্দোলন প্রথম দিকে ছিল একটা সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত নাগরিক আন্দোলন। কিন্তু অদলীয় হলেও অরাজনৈতিক শব্দটি যে সোনার পাথরবাটি সেটা আন্দোলনকারীদের সামনের সারির অংশ অচিরেই বুঝতে পেরেছিলেন।

কেন্দ্রের শাসক দল এই আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা প্রথম দিকে করেছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই এই আন্দোলন তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। তার সঙ্গে এই আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকট হয়ে পড়ে, কেন্দ্র রাজ্যের শাসকের সেটিং তত্ত্ব। সিবিআই এর তদন্তকারী দলের কলকাতা পুলিশকে অনুকরণ করা মানুষের মধ্যে কেন্দ্রের শাসক দল সম্বন্ধে সব প্রত্যাশা শেষ করে দেয়। রাস্তায় রয়ে যান তথাকথিত বাম, গণতান্ত্রিক ও অরাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন প্রতিবাদী নাগরিকেরা। কালের স্বাভাবিক নিয়মে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকারীরা ধীরে ধীরে জীবন জীবিকার প্রয়োজনে ফিরে যান নিজের নিজের রুটিনে।

তবে এক ঝাঁক তরতাজা তরুণ তরুণীর বাহিনী তৈরি হয়, যারা লাগাতার অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে রাস্তায় রয়েছেন। এদের সকলের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা রয়েছে এমন নয়। কেউ কেউ অভয়ার ন্যায় বিচারের আন্দোলনকে শাসকের সব রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে এক করে দেখতে এখনো নারাজ। আবার কেউ কেউ ভাবেন, আমাদের চারপাশে ঘটে চলা অসংখ্য অন্যায় অত্যাচারের সাধ্যমত প্রতিবাদ করা অভয়ার আন্দোলনেরই একটা চলমান অংশ। প্রতিমুহূর্তে আগামীর চলার পথ নির্ণয়ে অসংখ্য সংঘাত, অসংখ্য মতপার্থক্য। তার সাথে রয়েছে শাসকের এই

আন্দোলন হাইজ্যাক করে নেওয়ার ক্রমাগত চেষ্টা। কিন্তু এইসব দ্বন্দ্ব ও বাধা পেরিয়েই প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে প্রতিবাদের নতুন ভাষ্য।

আইনি পথের সাফল্য কবে আসবে তা আমরা জানি না। কিন্তু আইনি লড়াই ছেড়ে দেওয়ারও কোন প্রশ্ন নেই। তবে তার চেয়ে অনেক বড় হলো রাস্তার লড়াই, গণ-আন্দোলনের পথ। অনেক অনেক দিন পর শাসকের রক্ত চক্ষুর বিরুদ্ধে, সর্বস্তরের সীমাহীন দুর্নীতি, অরাজকতা, গুন্ডারাজ এর বিরুদ্ধে মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখেছেন। এই স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ প্রতিবাদকে সংগঠিত করে তাকে দিশা দেখানোর দায়িত্ব আমাদের সকলের। এই রাজ্যের, এই দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ যতই অন্ধকারাচ্ছন্ন এই মুহূর্তে দেখাক না কেন; অন্ধকার শেষ করে আলোর দিশা আনতে পারেন একমাত্র খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষই। শ্রমিক কৃষক ডাক্তার শিক্ষক এই সর্বস্তরের মানুষের যে এক স্বর এই পরিবর্তন আনার জন্য দরকার, তার সূচনা করেছে অভয়া আন্দোলন।

এই আন্দোলন এ সম্পৃক্ত হয়েছে লিঙ্গ-জাত-ধর্ম সব ধরনের বৈষম্য বিরোধী কণ্ঠস্বর। এ এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। যে তরুণ প্রজন্মকে আমরা স্মার্টফোনে মুখ গুজে থাকতে আর অনলাইনে শপিং করতে শুধু দেখতাম; তাদের একটা অংশ আজ যে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদে পথে নামছেন। সমাজ পরিবর্তনের পথে এই স্ফুলিঙ্গ কে যদি আমরা নিভতে দেই তাহলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। আর যদি শেষ অবধি লড়াইতে থাকতে পারি, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অন্তত জবাবদিহি করতে পারব, নাগরিক হিসাবে সমাজের কাছে আমার দায় পূরণ করতে চেষ্টার অন্তত কোন ত্রুটি রাখিনি ।

* ডাঃ সুকান্ত চক্রবর্তী, 'ডক্টরস ফর ডেমোক্রেসি'র সম্পাদক, 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস' এর নেতা এবং প্রথম দিন থেকে অভয়া আন্দোলনের প্রথম সারিতে রয়েছেন।

ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম অথবা আই বি এস

অরিজিৎ সিনহা

দরজা ঠেলে পরের রুগি ঢুকলেন। বললাম—বসুন।

—ডাক্তার বাবু আমায় একটু সময় দিতে হবে। আমি আই বি এস এর রুগি। আমি বললাম—তা আমার কাছে কেন? আমি তো ফিজিসিয়ান। আপনি গ্যাস্ট্রোএন্টারোলোজিস্ট দেখালে ভালো করতেন। রুগি বলে চলেন—দেখিয়েছি স্যর, কাউকে বাদ দিই নি। কলকাতায় পি জি হাসপাতাল, সোনারপুরের পেটের হাসপাতাল, অ্যাপোলোর বড় ডাক্তারবাবু সব্বাই। শেষে এ আই জি হায়দ্রাবাদ, ওখানকার ডিরেক্টর ডাঃ রূপা ব্যানার্জী বললেন কোলকাতাতেই চিকিৎসা করান, এতদূর আসার দরকার নেই। শেষে ডাঃ ধারের কাছে গিয়েছিলাম। উনি প্রথমবার দেখলেন ওষুধ লিখলেন, দ্বিতীয়বার শুনলেন ওষুধ লিখলেন। কি বলবো স্যর আমি একটু বেশি প্রশ্ন করি, এটা আমার দোষ। তৃতীয়বার বলা শেষ হবার আগেই প্রেসক্রিপশন লিখে উঠে এসে চেম্বারে দরজা খুলে দিলেন। বুঝলাম যেতে বলছেন। প্রেসক্রিপশন-এ দেখলাম মানসিক ডাক্তার দেখাতে বলেছেন। স্যর আর কোথাও যাবো না, আপনিই আমার চিকিৎসা করুন। আমি বললাম—ঠিক আছে ঠিক আছে, আপনাকে সবার শেষেই দেখবো। একটু অপেক্ষা করুন। রুগি দেখা শেষ, ওই একজন ছাড়া। ডাকলাম—নিরঞ্জন বাবু এবার আসুন।

—আচ্ছা আপনি জানলেন কি করে আপনার আই বি এস হয়েছে?

—দেখুন ডাক্তার বাবুরাই ডায়াগনসিস করেছেন। পরে আমি গুগুল থেকে জেনেছি। আমার বয়স ৪৫ এর নিচে, বয়সটা অসুখের সঙ্গে ম্যাচ করে। যদিও মেয়েদের মধ্যে ছেলেদের থেকে দু-তিনগুণ বেশি, আমি কিন্তু সব হাসপাতালের ক্লিনিক-এ ছেলেদের বেশি বসে থাকতে দেখেছি।

—সে তো বুঝলাম, কিন্তু আপনার প্রথম লক্ষণ কি ছিল?

নিরঞ্জন বাবু বলে চলেন—কি বলবো ডাক্তার বাবু একটা মেয়ে, সে ব্যাঙ্গালোরে থাকে। আমরা দু'জন এখানে থাকি। টেনশন তো হয়। পেটে মৃদু মৃদু ব্যাথা হয় ৬ মাসেরও বেশি, পায়খানা পায়খানা ভাব। পায়খানা গেলে ব্যথা একটু কমে। দিনে ৪/৫ বারও যেতে হয়, তবে রাতে হয় না। পায়খানা কখনো কাদা কাদা, ফেনা ফেনা, কখনো শক্ত হয়, কখনো পাতলা। তবে কখনও রক্ত পড়েনি।

—হ্যাঁ, আপনার লক্ষণগুলো আই বি এস এর ডাইগনস্টিক ক্রাইটেরিয়ার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। যাকে আমরা বলি রোম ৩ ক্রাইটেরিয়া। অর্থাৎ ৬ মাস ধরে অস্বস্তি এবং ৩ মাসের মধ্যে বার বার পেটে ব্যথা (সপ্তাহে একদিন বা তার বেশি) যা পায়খানা যাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত, পায়খানা যাওয়ার সংখ্যার পরিবর্তন আনে, পায়খানার গঠনের পরিবর্তন নিয়ে আসে—এই তিনের দুই বা তার অধিক লক্ষণ থাকলে আই বি এস এর রোম ক্রাইটেরিয়া মান্য করে।

—ঠিক আমার মত। জানেন তো স্যর। তাছাড়া আমার আবার খাওয়ার পরেই পায়খানা দৌড়াতে হয়। আবার কোথাও বের হতে হলে ঘন ঘন পায়খানা যেতে হয়। রাস্তায় বের হতে টেনশন হয়। জানেন তো ডাক্তারবাবু আমার ঠাকুমা বলতেন রাস্তা পার হবার সময় যদি দোনামনা হয় তাহলে থেমে গিয়ে পরের সিগন্যাল এ যাবি, আর বাইরে যাবার সময় পায়খানা পায়খানা ভাব হলে পায়খানা বসে তার পর যাবি।

কোথাও গিয়ে শান্তি নাই স্যর। মনটা খারাপ হয়ে যায়।

—মন খারাপের কিছু নাই। ভাববেন জ্যোতি বসুরও এই অসুবিধা ছিল, ডাঃ মনি ছেত্রী তাই বলেছিলেন।

—কি যে বলেন স্যর, আমরা সামান্য মানুষ। আচ্ছা ডাক্তার বাবু অসুখটা হয় কেন? সবার তো হয় না?

—সে এক জটিল তত্ত্ব। আমাদের সব কিছু কন্ট্রোল করে ব্রেন। ব্রেন গাট এক্সিস এর গন্ডগোল, যেমন হাইপোথ্যালামিক পিটুইটরি এক্সিস অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম এর গন্ডগোল। খাদ্য নালীর মুভমেন্ট এর গন্ডগোল, খাদ্যনালীর উপকারী জীবাণুদের পরিবর্তন, জেনেটিক ফ্যাক্টর, উত্তেজিত হওয়া, মনের বিষণ্ণতা। এগুলো সব সম্ভাব্য কারণ। আই বি এস তিন ধরনের হতে পারে। যারা পাতলা পায়খানা বেশিবার যায় (IBS D), যাদের পায়খানা কষে যায় (IBS C) কিংবা উভয় লক্ষণ যুক্ত (Mixed).

—হ্যাঁ, আমার আবার পেট টা ফেঁপে যায়, শুধু গ্যাস আর গ্যাস, ঢপ ঢপ করে। আবার কখনো কখনো গলায় অ্যাসিড উঠে আসে, ঘুমও ভালো হয় না। তবে যাই হোক আমার কিন্তু পায়খানার সঙ্গে রক্ত কখনো আসেনি আর ওজনও কমেনি।

—ঠিক বলেছেন, আই বি এস-এ সাধারণত ওজন কমে না, রক্তও আসেনা। তবে কি জানেন কিছু কিছু লক্ষণ আমরা রুগিদের বলে থাকি, যেগুলো চিন্তার, রেড ফ্ল্যাগ সাইন। সেগুলি হল—বয়স্ক মানুষ, হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়া শক্ত বা পাতলা পায়খানা, ওজন কমে যাওয়া, পায়খানায় রক্ত আসা, রাতের বেলা পায়খানা যাওয়া, অনেকখানি ফ্যাকাসে তৈলাক্ত দুর্গন্ধ পায়খানা। এসব থাকলে নতুন কোন ইনফেকশন, টিউবারকুলোসিস, ক্যান্সার, আলসারেটিভ কলাইটিস, ক্রোন্স ডিজিজ, ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি জনিত রোগ ইত্যাদির খোঁজ করতে হয়।

—ডাক্তারবাবু, আমার সেরকম খারাপ কিছু হয় নি তো? নিরঞ্জনবাবু বড় বড় ফাইল থেকে রিপোর্ট বের করতে শুরু করলেন।

ডাক্তারবাবু মনে মনে হয়ত ভাবলেন এত রিপোর্ট দেখার সময় কোথায়, কিন্তু তিনি সব দেখলেন। নিরঞ্জনবাবু বললেন—আমি সব সাজিয়ে রেখেছি, বেশি সময় লাগবে না। একটু দেখুন স্যর। আমায় চিন্তামুক্ত করুন। আমি এমনিতেই টেনশন এর পাবলিক। ডাক্তারবাবু টেবিলে তুলে রুগিকে পরীক্ষা করলেন। তারপর একটার পর একটা রিপোর্ট উল্টাতে লাগলেন।

—নিরঞ্জনবাবু, আপনার রেড ফ্ল্যাগ সাইন নেই। আপনার পরিবারে কারও খাদ্যনালীর ক্যান্সার হয় নি। আপনার ম্যালএবজর্বসন এর লক্ষণ নেই। আপনি এমন কোনো ওষুধ খান না যাতে এই সব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়। আপনার পরফাইরিয়া, লেড পয়জনিং হয়নি। আপনার থাইরয়েড, সুগার, স্টুল, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট সব ভালো। হিমোগ্লোবিন, ই এস আর নর্মাল। হাইড্রোজেন ব্রেথ টেস্ট, গ্লুকোজ হাইড্রোজেন ব্রেথ টেস্ট রিপোর্ট ভালো, মানে ল্যাক্টোজ ডেফিশিয়েন্সি বা ক্ষুদ্রান্তে ব্যাকটেরিয়ার ওভারগ্রোথ নেই। টি টিজি আইজি এ (tTG-IgA) নর্মাল অর্থাৎ সিলিয়াক স্প্রু নেই। পেটের আলট্রাসাউন্ড, আপার জি আই এণ্ডোসকপিতেও গোলমাল ধরা পড়েনি। কোলোনোসকপি তিনবার, ক্যাপসুল এণ্ডোসকপি একবার করেছেন, সব বার নর্মাল রিপোর্ট। ভয় কাটাতে ডাক্তারবাবুরা কোলোনোস্কোপিক বায়োপসিও করেছেন, তাও নর্মাল। আপনি চিন্তা করছেন কেন? কোনো ভয় নাই। মরুতীর্থ হিংলাজ ঘুরে আসুন। ডাক্তারবাবুর একটু ধৈর্যহানি হল।

—ডাক্তারবাবু, আপনি রাগ করবেন না। আমার বিশ্বাস, আপনিই আমাকে সারাতে পারেন? নিরঞ্জনবাবুর মুখটা কেমন করুণ হয়ে উঠল।

ডাক্তারবাবু একটু আনমনা হলেন। মোবাইল-এ কিসব দেখলেন। বললেন—আই বি এস স্কোরিং সিভিয়ারিটি স্কেল (IBS-SSS)-এ হিসেব করে দেখলাম মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার এর মধ্যে আপনার সিভিয়ার আই বি এস বা রিফ্রেক্টরি আই বি এস। আপনাদের মত রুগিদের প্রধান চিকিৎসা হচ্ছে কাউন্সেলিং, লাইফ স্টাইল মোডিফিকেশন, ডায়েট কন্ট্রোল। আমরা বলি ভয়ের কিছু নাই, মানে আশ্বস্ত করা। টেনশন কমানো-মেন্টাল রিলাক্সশন টেকনিক। ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ। নেশা যেমন তামাক ধূমপান অ্যালকোহল বন্ধ। সময়ে খাওয়া, সময়ে ঘুমানো। বাঁধাকপি, সিম, কড়াইশুঁটি, খাবারে ব্যবহৃত কেমিকাল, কৃত্রিম মিষ্টি লাগার জিনিস, ডেয়ারি প্রোডাক্ট, আপেল ইত্যাদি না খাওয়া ভালো।

নিরঞ্জনবাবু বলে উঠলেন—হাঁ হাঁ আমাকে একটা চার্ট দিয়ে ছিলেন FODMAP।

—ঠিক বলেছেন, ইন্টারনেট-এও পাওয়া যায়। ফার্মেনটেবল ওলিগোসাকারইড ডাইসাকারইড মনোসাকারাইড এন্ড পলিওল। Low FODMAP খাবার আই বি এস এর পক্ষে ভালো। পেঁয়াজ, রসুন, আটা এগুলিতে ফ্রুকটন থাকে। ফল, মধু, কর্ন সিরাপ এগুলিতে প্রচুর ফ্রুকটোজ থাকে। বিন আর শুঁটিগুলিতে গ্যালাকটেন থাকে। দুধ ও দুধের তৈরি খাবারে ল্যাকটোজ থাকে। আপেল, অ্যাভোকাদস, চেরি, চিনি, অ্যালকোহলে পলিওল থাকে। এগুলি না খেতে বা কম খেতে পারলে ভালো। ইসবগুলের ভূষি খুব উপকারী। সব ভ্যারাইটিতে কাজ করে-স্টুল বালকিং এজেন্ট। কন্সটিপেশন বেশি থাকলে পলি ইথিলিন গ্ল্যায়কল (PEG) কাজ করে। পেটের ব্যথার জন্য আন্টিস্প্যাস্মডিক, আন্টিকোলিনির্জিক ড্রাগস্, মেবেভেরিন ব্যবহার হয়, কখনও ক্লোর ডায়াজিপোক্সাইড সঙ্গে দেওয়া হয়। লুজ মোশন বেশি হলে লোপেরামাইড, কোলেস্টায়রামিন ব্যবহার হয়। মুড এলিভেটোর হিসেবে ট্রাইসাইকলিক অ্যান্টি ডিপ্রেসান্ট বা সিলেকটিভ সেরোটনিন রিআপটেক ইনহিবিটর (SSRI) দিতে লাগে। সেরোটনিন রেসিপিটর মডুলেটর, এগোনিস্ট প্রুকালোপ্রাইড, টেগাসেরয়েড কন্সটিপেশন ভ্যারাইটিতে উপকারী। সেক্রেটাগ লুবিপ্রস্টোন, প্লেকানাটাইডও সেই কাজ করে। খাদ্যনালীর ফ্লোরা ঠিক রাখতে এন্টিবায়োটিক রিফাক্সিমিন দু'সপ্তাহের বেশি বা প্রোবায়োটিক, জীবন্ত মাইক্রোঅর্গানিজম উপকারী। এরা পেট এর গ্যাস ফেঁপে থাকা ভাব কমায়।

নিরঞ্জন বাবু বললেন—একটু একটু যা বুঝেছি, এসবই আমার

উপর ব্যবহার হয়ে গেছে। কিছু কিছু ওষুধে একটু আধটু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হত, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, ঘুম পাওয়া, তাও সহ্য করে নিয়েছি। কিন্তু আমার কি হবে ডাক্তার বাবু? আমি মনে হচ্ছে ওই রিফ্রেক্টরি গ্রুপের রুগি?

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। ১২ মাস আই বি এস রুগিদের নানা পদ্ধতির চিকিৎসা চালিয়ে উপকার না হলে রিফ্রেক্টরি। আপনিও রিফ্রেক্টরি গ্রুপের। আমরা আপনাদের মত আই বি এস রুগিদের অত্যাচারের রেসিস্ট্যান্ট।

—তাহলে কি হবে ডাক্তার বাবু?

—কিছু ভাববেন না। আপনি তো এটুকু বুঝবেন যে সমস্ত পরীক্ষা বার বার করে এটা প্রমাণিত আপনার ক্যান্সার নাই, ভয়ের কিছু নেই।

নিরঞ্জনবাবু সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়লেন।

মনের জোর বাড়ান। এক্সারসাইজ করুন। খাবার মেনে চলুন। মেডিটেশন করুন। ধরুন আপনি শ্যামবাজার থেকে শিয়ালদহ যাবেন। আপনি ভয় পেতে পারেন, যদি রাস্তায় পায়খানা পায়! আরে বেরিয়ে পড়ুন, রাস্তায় অনেক শৌচালয় আছে। ভয় কাটান, লাইফ স্টাইলে মোডিফিকেশন দরকার। আমরা ওষুধের দিকটা দেখছি। আপনার সাইকোলজিকাল... মোবাইলে জোরে জোরে রিং বেজে উঠল। ডাক্তার বাবু বললেন—এটা আমার স্ত্রীর ফোন, রিং টোনটা বেশি আওয়াজের ক্রিং ক্রিং দিয়ে রেখেছি যাতে মিস না করি। ফোন ধরলেন, ওপাস থেকে তীব্র চিৎকার—রাতে ফিরবে না নাকি? কটা বাজলো খেয়াল আছে? রিসেপশনিস্ট বলল একটা রুগিকে এক ঘণ্টা ধরে জ্ঞান দিচ্ছো। কি রুগি? ডাক্তারবাবু বিনীত ভাবে বললেন—আই বি এস। ওপার থেকে আরও তীব্র গলা শোনা গেল—মরণ দশা, নিজে হাসপাতাল যাওয়ার আগে তিন বার প্যান্ট পরে আর গামছা পরে, তিনি অন্যকে জ্ঞান দিচ্ছেন। ডাক্তারবাবু বেরোচ্ছি বলে ফোন রাখলেন। নিরঞ্জনবাবুকে বললেন—যেটা বলছিলাম, সাইকোথেরাপি। আচ্ছা নিরঞ্জনবাবু, ফোনের কথা শুনতে পান নি তো? নিরঞ্জন বাবু মাথা নিচু করে বললেন—একটু একটু। ডাক্তারবাবু বললেন—চলুন চলুন, রাত ১২ টা বাজলো। আপনি কিসে যাবেন?

অটো আর নেই, হেঁটে যাবো।

ডাক্তারবাবু বললেন—আসুন গাড়িতে, নামিয়ে দিই।

ডাক্তারবাবু আবার রুগিকে জিজ্ঞেস করলেন—কিছু বুঝলেন তো নাকি?

রুগি বললেন—একটু একটু।

ডাক্তার বাবু রেগে গিয়ে বললেন—কি একটু একটু?

রুগি মাথা চুলকে বললেন—আমরা সবাই কম বেশি আই বি এসে ভুগছি। ডাক্তারবাবু জানলার কাঁচ খুলে রাতের কলকাতার বাতাস নিতে লাগলেন। [* বিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ]

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স: আগামী দিনের বিপদ ও আমাদের কর্তব্য

আনোয়ার হোসেন

শুরু করি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সম্প্রতি এক সতর্কবাণী দিয়ে। সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, ***"অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স* (এ এম আর)"** *হলো বিশ্ব জনস্বাস্থ্যের উপর সবচেয়ে ভয়ানক দশটি হুমকির মধ্যে একটি"*। এখানে আমরা সাধারণের বোঝার সুবিধার্থে প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স কথাটি ব্যবহার করেছি। একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের জন্য২০১৯ সালে পৃথিবী জুড়ে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং এই সংখ্যা খুব শীঘ্রই দ্বিগুণ অর্থাৎ এক কোটিতে পৌঁছে যাবে। এমনকি আগামী মাত্র পনের থেকে কুড়ি বছর পরে আর কোনও অ্যান্টিবায়োটিকই কাজ করবে না। যে কোনও রোগজীবাণুর আক্রমণে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হবে। এখন থেকে পৃথিবীর সকল দেশ সম্মিলিতভাবে পদক্ষেপ না নিলে ২০৫০ সালের মধ্যে শুধু অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স মোকাবিলা করতে সারা বিশ্বের এক বিপুল আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। যার পরিমাণ প্রতি বছরে প্রায় একশত ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। টাকার অঙ্কে যা প্রায় ৮৩১০৯২০০০০০০০০০ টাকা।

অ্যান্টিবায়োটিক হলো এমন ধরনের ওষুধ যা জীবাণুঘটিত রোগে আক্রান্ত রোগীর শরীরে প্রয়োগ করে ওই জীবাণু ধ্বংস করে অথবা তার বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে রোগীকে সুস্থ করে তোলা হয়। অর্থাৎ কি না, রোগসৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক, আদ্যপ্রাণী ইত্যাদিকে এই অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে মেরে ফেলা বা তাদের বৃদ্ধি আটকে দেওয়া হয়। আমরা জানি, প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক, পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন আলেকজান্দার ফ্লেমিং ১৯২৮ সালে। পেনিসিলিয়াম নামক ছত্রাকের নির্যাস থেকে। মানুষের শরীরে পেনিসিলিনের প্রয়োগ শুরু হয় ১৯৪১ সালে। তারপর থেকে একে একে বহু অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার হয় ও বিভিন্ন ধরণের জীনাণুঘটিত রোগ থেকে মানুষ রক্ষা পায়।

এখন অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বিষয়টা জানা যাক। বিশ্বের প্রতিটি জীব বিবর্তনবাদের নিয়ম মেনে তার প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য জীবনসংগ্রামে লিপ্ত। জীবাণুরাও তার ব্যতিক্রম নয়। ফলে অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে লড়াই তাদের টিকে থাকার অন্যতম প্রধান শর্ত। তাই জীবাণুরা এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করতে সক্ষম হয় যা অ্যান্টিবায়োটিকটিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। ফলে তার প্রভাবে ওই জীবাণু আর মরে না। তাই রেজিস্ট্যান্স গড়ে তোলা জীবাণুদের সহজাত প্রবৃত্তি। দেখা গেল ১৯৪২ সালেই, অর্থাৎ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার শুরুর ঠিক পরে পরেই চার রকম প্রজাতির

স্ট্যাফাইলোকক্কাস নামের ব্যাক্টেরিয়া পেনিসিলিনেজ নামক উৎসেচক তৈরি করে পেনিসিলিনকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে সক্ষম হচ্ছে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ নিত্যনতুন গবেষণা চালিয়ে নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করে জীবাণুদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখেছে। জীবাণুরাও টিকে থাকার তাগিদে নিত্য নতুন ভাবে রেজিস্ট্যান্স গড়ে তুলছে।

কীভাবে হয় এই রেজিস্ট্যান্স? আগেই বলেছি, সমস্ত জীব তার প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত। এরই অঙ্গ হিসাবে জীবাণুরা যখন অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন তাদের কোষের জেনেটিক বস্তুতে আকস্মিক পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটে। তৈরি হয় বিশেষ ধরনের প্লাজমিড যা অ্যান্টিবায়োটিককে নিষ্ক্রিয় করার মতো উৎসেচক যা অন্য জৈবরাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনে সক্ষম। তখন ওই জীবাণু এবং তার থেকে বংশবৃদ্ধিপ্রাপ্ত কোনও জীবাণু আর নির্দিষ্ট সেই অ্যান্টিবায়োটিকের দ্বারা মরবে না। শুধু তাই নয়। একটি জীবাণু এই বিশেষ প্লাজমিডকে অন্য প্রজাতির জীবাণুর দেহেও বিভিন্ন পদ্ধতিতে স্থানান্তর করতে পারে, তখন সেই অন্য প্রজাতির জীবাণুও গড়ে তোলে সেই নির্দিষ্ট অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা রেজিস্ট্যান্স।

যে যে কারণ জীবাণুর মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে সেগুলোও আমাদের জানা দরকার।

অ্যান্টিবায়োটিকের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার এই রেজিস্ট্যান্স গড়ে তুলতে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সাধারণ সর্দিকাশি, গলা ব্যথা, অল্প জ্বর, ফ্যারিঞ্জাইটিস, টন্সিলাইটিস, অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস, অ্যাকিউট সাইনুসাইটিস ইত্যাদি অসুখ সাধারণত ভাইরাস দ্বারা ঘটে। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবণতা আছে এইসব রোগে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করার। বেশিরভাগ চিকিৎসকের মধ্যেও এইসব রোগে অপ্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানোর প্রবণতা আছে। চিকিৎসকদের মধ্যে এই প্রবণতার কারণগুলো হলো রোগের লক্ষ্মণ দেখে রোগের কারণ সম্বন্ধে ধারণা করার ক্ষমতার অভাব, নিজেদের শিক্ষার প্রতি অবিশ্বস্ততা, রোগীর নিজস্ব মানসিক চাহিদা পুরণ, যে ওষুধের দোকানে চেম্বার সেই দোকানের বিক্রিবাট্টার প্রতি স্নেহসুলভ মনোভাব, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের থেকে ফারমাকোলজির জ্ঞান লাভ করতে থাকা এবং কিছুক্ষেত্রে ওষুধ কোম্পানির সঙ্গে অনৈতিক আর্থিক চুক্তি। অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের ফলে মানুষের শরীরে বাস করা অসংখ্য উপকারী ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মরে যায় আর কিছু ব্যাকটেরিয়ার মিউটেশন হয়ে ওই অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জেনেটিক বস্তু তৈরি করে ফেলে। পরে অন্য ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া (যার কি না ওই অ্যান্টিবায়োটিকে মরে যাওয়ার কথা)-র মধ্যে ওই জেনেটিক বস্তু স্থানান্তর করে দেয়। নতুন ব্যাকটেরিয়া সেই ওষুধ-প্রতিরোধী অস্ত্র রেডিমেড পেয়ে যায় ও অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়।

কোনও জীবাণুঘটিত রোগে অ্যান্টিবায়োটিকের অপর্যাপ্ত অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় কম ব্যবহার করা হলে জীবাণুর পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সহজ হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সাত, দশ বা চৌদ্দ দিনের বদলে দু'দিন বা তিন দিন ওষুধ খেয়ে রোগের একটু উপশম হতেই রোগী ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, সমীক্ষায় দেখা গেছে, ডাক্তাররা নিজেরাই যখন প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক খান তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা পুরো মেয়াদ শেষ করেন না। এবং এই প্রবণতা সাধারণ মানুষের তুলনায় ডাক্তারদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ রকমের বেশি। এছাড়া আছে ওষুধের দোকান থেকে দু-তিন দিনের অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খাওয়ার প্রবণতা। সরকারি হাসপাতালেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের পুরো কোর্স-এর বদলে দুই অথবা তিন দিনের অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে রোগীকে পরে আবার আসতে বলা হয়। এই সময়ে একটু উপশম হতেই রোগী আর হাসপাতালে আসেন না।

এগুলো ছাড়াও আমরা নিজের অজান্তেই অতি অল্প মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করে থাকি বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের মাধ্যমে। এটা আসে মাছ ডিম মাংস দুধ ও কৃষিজ খাদ্য ইত্যাদির মাধ্যমে। গরু, মহিষ, শুকর, ছাগল, ভেড়া, মুরগী ইত্যাদির চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয় মানুষের রোগে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক। এছাড়া বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদন করতে, পশুপালন ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উৎপাদন সংস্থাগুলো গ্রোথ প্রোমোটিং ফ্যাক্টর হিসাবে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার করে থাকেন। যা খাদ্যের মাধ্যমে আমাদের শরীরে অতি অল্প মাত্রায় প্রবেশ করে ও অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের সহায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ২০০৩ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জাতিসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং পশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার বিশেষজ্ঞ দল এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে জানায়, কৃষি, মৎস্য চাষ, পশুপালন ইত্যাদিতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে রেজিস্ট্যান্ট জীবাণু বাড়তে থাকা ও তা থেকে মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব এবং তার খারাপ পরিণতির সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। এই খারাপ পরিণতিগুলোর মধ্যে পড়ে, যে সংক্রমণ হওয়ার কথা নয় সেই সংক্রমণ হওয়া, চিকিৎসার ব্যর্থতা ও কিছু ক্ষেত্রে তা থেকে মৃত্যুর ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়া, রোগের প্রাবল্য ও তার মারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া।

এ পর্যন্ত এটুকু পরিষ্কার যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স তৈরির সহায়ক পরিস্থিতিগুলোকে জনসচেতনতা, ক্রমাগত মনিটরিং ও সুপারভিশন, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ল্যাবোরেটরির পরিকাঠামোর উন্নয়ন, আইন-কানুন প্রণয়নের মাধ্যমে অ্যান্টিবায়োটিকের বেঠিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করতে সক্ষম হলে রেজিস্ট্যান্সের সম্ভাবনা কমাতে পারব মাত্র, বন্ধ করতে পারব না। জীবাণুরা বাঁচার তাগিদে ক্রমাগত অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা রেজিস্ট্যান্স গড়ে তুলবেই। এ থেকে রেহাই পাওয়ার একটি মাত্র রাস্তা খোলা আছে তা হলো নিত্য নতুন অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ভাবন করা। সেই নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ভাবনের পথ বর্তমান পৃথিবীর অর্থব্যবস্থার

যাঁতাকলে প্রায় অবরুদ্ধ। এই অবরুদ্ধতার কারণ জানা যাক। বর্তমান পৃথিবীতে ওষুধ উদ্ভাবন গবেষণায় সিংহভাগ অর্থ বিনিয়োগ করে প্রাইভেট কর্পোরেট সংস্থাগুলো। যাদের উৎপাদনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মুনাফা। ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি ইনফরমেশনের ২০২২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ওষুধ গবেষণায় সারা বিশ্বে মোট ৫৩,০৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের মধ্যে মাত্র ২৪১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (অর্থাৎ মাত্র ৪.৫৫ শতাংশ) বিনিয়োগ করেছে বিভিন্ন দেশের সরকার আর বাকিটা প্রাইভেট কোম্পানিগুলি। আবার এই ৪.৫৫ শতাংশ সরকারি বিনিয়োগের বেশিরভাগ চলে যায় প্রাইভেট কোম্পানিগুলিকে অ্যান্টিবায়োটিক গবেষণায় ইনসেন্টিভ বা ভর্তুকি হিসাবে দিতে। এই প্রাইভেট কোম্পানিগুলি আবার সেই সকল ওষুধ গবেষণায় বেশি বিনিয়োগ করে যেখানে তাদের মুনাফা বেশি। ক্যান্সার, উচ্চ-রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, মানসিক রোগ, অ্যাজমা জাতীয় ফুসফুসের রোগ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত ওষুধ রোগীকে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করতে হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা প্রায় সারা জীবন। এইসব ওষুধ তাই ফার্মা কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা নিশ্চিত করে। অপর পক্ষে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার সীমিত সময়ের জন্য। যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ইত্যাদি কয়েকটি রোগ বাদ দিলে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার হয় বড়জোর দুই বা তিন সপ্তাহের জন্য। এর উপরে আছে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে পড়ার আশঙ্কা। মুনাফামুখী উৎপাদন ব্যবস্থায় তাই অ্যান্টিবায়োটিক গবেষণায় বিনিয়োগ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ফলে নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার চূড়ান্ত রকমের ব্যাহত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক রিপোর্ট অনুসারে ২০২২ সালে মাত্র সাতাত্তরটি অ্যান্টিবায়োটিক গবেষণার স্তরে রয়েছে। এই ৭৭-টির মধ্যে কোনও মৌলিক অ্যান্টিবায়োটিক নেই, প্রায় সবগুলিই বর্তমানে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকের অন্য রূপ মাত্র। আমাদের দেশের অবস্থা আরও ভয়াবহ। সারা বিশ্বে প্রাইভেট কোম্পানিগুলি যখন তার বাৎসরিক লেনদেনের পনের শতাংশ গবেষণা খাতে ব্যয় করে সেখানে ভারতের কোম্পানিগুলি ব্যয় করে তাদের বাৎসরিক লেনদেনের পাঁচ শতাংশেরও কম। অর্থাৎ কি না, নতুন অ্যান্টিবায়োটিক বাজারে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এর পরেও যে অল্প সংখ্যক অ্যান্টিবায়োটিক বাজারে আসবে ফার্মা কোম্পানিগুলির মুনাফা বজায় রাখতে তার বিক্রয়মূল্য থাকবে সাধারণ শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্তের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে।

এতক্ষণ যারা ধৈর্য ধরে উপরের লেখাটুকু পড়লেন তাদের কাছে অন্তত এটুকু পরিষ্কার যে সারা বিশ্বের দেশগুলির জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারগুলি জনগণের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণার দায়িত্ব প্রাইভেট ফার্মা কোম্পানির মর্জির উপর ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। জনগণের স্বাস্থ্যের চেয়ে নির্বাচিত সরকারের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো ফার্মা কোম্পানিগুলির মুনাফা নিশ্চিত করা। তাই দেশের মানুষ, বিশেষত শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত মানুষদের ঐক্যবদ্ধভাবে সরব হওয়ার সময় অতিবাহিত হতে চলেছে। নিজেদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনের ও স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার জন্য এখনই ভাবা শুরু করতে হবে। বলা শুরু করতে হবে, "স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসা নয়, স্বাস্থ্য আমাদের জন্মগত অধিকার"। "মুনাফামুখী প্রাইভেট কোম্পানির দ্বারা নয়, ওষুধ উৎপাদন শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে জাতীয়করণ করতে হবে"।"জনগণের স্বাস্থ্যের পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে প্রতিটি দেশের সরকারকে"। গড়ে তুলতে হবে সংহত দীর্ঘমেয়াদী স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

[লেখক ডাঃ আনোয়ার হোসেন একজন জনস্বাস্থ্য সংগঠক]

যক্ষ্মা রোগ ও জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূলকরণ কর্মসূচি

নিতাই প্রামাণিক*

যক্ষ্মা একপ্রকার অ্যাসিডফাস্ট ব্যাসিলাই ব্যাকটেরিয়া মাইকো ব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস ঘটিত সংক্রামক ব্যাধি। এই অসুখ পৃথিবীব্যাপী এক প্রাচীন দীর্ঘমেয়াদী সংক্রামক রোগ। যক্ষ্মারোগের নির্দিষ্ট ঔষধ আবিষ্কারের আগে লক্ষ লক্ষ যক্ষ্মারোগী এই অসুখে মৃত্যুবরণ করেছেন। ১৯৪১ সালে স্ট্রেপটোমাইসিন ঔষধ আবিষ্কারের পর থেকে আজ পর্যন্ত অনেক কার্যকরী ঔষধ এই অসুখের চিকিৎসায় ব্যবহার করা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীতে এই রোগের মহামারী অব্যাহত আছে। ২০২৩ সালের গণনায় পৃথিবীতে প্রায় এক কোটি আট লক্ষ যক্ষ্মা রোগী চিহ্নিত হয়েছেন। অর্থাৎ প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ১৩৪ জন যক্ষ্মা রোগী রয়েছেন। এই অসুখে পুরুষেরা সবচেয়ে বেশি ভোগেন। তারপরে মহিলা, অল্প বয়সী ছেলেমেয়ে এবং শিশুরা ভোগে। সমস্ত যক্ষ্মা রোগীর মধ্যে ৬.১ শতাংশ রোগীরা HIV ও এইড্‌স্ রোগে আক্রান্ত। সবচেয়ে বেশি যক্ষ্মারোগী বাস করেন ভারত, ইন্দোনেশিয়া, চিন, ফিলিপাইনস, পাকিস্তান, নাইজিরিয়া, বাংলাদেশ এবং ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো-তে। পৃথিবী সমগ্র যক্ষ্মারোগীর দুই-তৃতীয়াংশ এই আটটি দেশে বাস করেন। সমগ্র পৃথিবীর যক্ষ্মা রোগীর এক-চতুর্থাংশ ভারতে বসবাস করেন। ২০২২ সালের গণনায় ভারতে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা ২৭.৭ লক্ষ।

প্রধানতঃ প্রায় আশি শতাংশ ক্ষেত্রে মানুষের ফুসফুসে এই জীবাণু সংক্রমণ করে। ধীরগতিতে এই অসুখের ব্যাপ্তি হয়। ফুসফুস ছাড়াও শরীরের অন্যান্য অংশ, যথা—লসিকাগ্রন্থি, অন্ত্র, যকৃৎ, বৃক্ক, অস্থিসন্ধি, হাড়, মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কঝিল্লি (মেনিনজেস্), অস্থিমজ্জা,

চামড়া, চোখ, জিহ্বা ইত্যাদি প্রায় সমস্ত অঙ্গে এই অসুখের সংক্রমণ হতে পারে (Extrapulmonary TB)। শরীরের বেশি অক্সিজেন প্রবাহিত অঙ্গের কোষে, বিশেষতঃ ফুসফুসে এই জীবাণুর সংখ্যা উচ্চহারে বৃদ্ধি পায়। ক্রমশঃ ফুসফুসের কোষ-কলায় (অ্যালভিওলাই, অ্যাট্রিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাসনালী ও আশপাশের কোষগুলি ও ফুসফুসের রক্তজালের ও ধমনী ও শিরার শাখা প্রশাখায়) এই জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে ও কোষ কলা ধ্বংস হয়। ফুসফুসে আক্রান্ত যক্ষ্মারোগীর ক্রমশঃ কাশি ও কফতোলা (Phlegm) বৃদ্ধি পায়। মাঝে মাঝে কফের সঙ্গে রক্ত বের হয়, শ্বাসকষ্ট হয়, শরীরের ওজন কমে যায়, ক্ষুধামান্দ্য হয়, দীর্ঘদিন যাবৎ অল্পমাত্রায় জ্বরে ভোগে, বিশেষতঃ রাত্রে জ্বর আসে। কাশির সঙ্গে উদ্গত কফে প্রচুর সংখ্যায় যক্ষ্মার জীবাণু শরীরের বাহিরে বের হয়ে আসে। কফের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার মধ্যে শতশত ওই জীবাণু বাতাসে বাহিত হয় ও আশে পাশের মানুষেরা শ্বাসগ্রহণের মাধ্যমে ওই সব জীবাণুযুক্ত কফ কণিকা তাদের ফুসফুসের মধ্যে গ্রহণ করেন এবং তাহাদের যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। এইভাবেই যক্ষ্মা রোগ এক রোগী হতে অন্য মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হয়। যক্ষ্মা জীবাণু নির্গতকারী রোগীর (Cavitary Pulmonary Tuberculosis) কাছাকাছি বাস করা মানুষদের এই অসুখে সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা বেশি। এইচ. আই. ভি. রোগী, অপুষ্ঠিতে আক্রান্ত মানুষ, যে সমস্ত মানুষ দীর্ঘদিন যাবৎ অন্য-অসুখে ভোগার জন্য স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ খান, ক্যান্সারে আক্রান্ত মানুষরা যক্ষ্মারোগে বেশি আক্রান্ত হতে পারেন। যক্ষ্মায় বেশ কিছুদিন রোগভোগ করার পর যক্ষ্মারোগীর নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমশঃ কমে আসে। তাছাড়া যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে যাওয়া রোগীদের (যেমন HIV ও AIDS আক্রান্ত) যক্ষ্মার জীবাণু ফুসফুসের কোষকলায় আর আবদ্ধ থাকে না। ওই জীবাণুরা তখন ফুসফুসের লসিকানালী ও রক্তবাহিকার (ধমনী ও শিরা) মাধ্যমে শরীরের অন্যান্য দূরতম অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে ফুসফুসের বাহিরের অঙ্গে যক্ষ্মা অসুখ (Extrapulmonary TB) প্রকাশ পায়। প্রধানতঃ লসিকাগ্রন্থিতে, ফুসফুস আচ্ছাদন (Pleura), হৃৎপিণ্ড আচ্ছাদনী (Pericardium), অন্ত্র ও অন্ত্র আচ্ছাদনী (Peritoneum), মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্ক আচ্ছাদনি, হাড় (প্রধানতঃ শিরদাঁড়ার হাড়) ও অস্থিসন্ধিতে এই অসুখ প্রকাশ পায়। প্রদাহের ফলে লসিকাগ্রন্থি ফুলে যায় (গলায়, বগলে, উদর গহ্বরের, বক্ষ গহ্বরের লসিকাগ্রন্থি)। চামড়ার কাছাকাছি থাকা স্ফীত লসিকাগ্রন্থি চামড়া ভেদ করে ফেটে গিয়ে পুঁজ বাহিরে বের হয়ে আসে। ওই পুঁজেও হাজার হাজার যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া যায়। শরীরের লালা অঙ্গ থেকে নির্গত মাইকোব্যাকটেরিয়াম টি. বি. মানুষদের মধ্যে সংক্রমিত হবার জীবাণুর স্পিসিস।। প্রকৃতিতে জলে মাটিতে অন্যান্য নানা প্রজাতির মাইকোব্যাকটেরিয়া প্রচুর বাস করে। সেইসব যক্ষ্মার জীবাণু জলের মাধ্যমে বা সংক্রমিত মাটির মাধ্যমে বা খাবারের মাধ্যমে অন্ত্রে, ফুসফুসে, মুখ গহ্বরের টনসিলের গাত্রের সূক্ষ্মনালীর মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে এবং টি. বি. রোগের সংক্রমণ প্রকাশ পেতে পারে—গলায় বা পেটের লসিকাগ্রন্থি প্রদাহে ফুলে যায়, যক্ষ্মা জীবাণু সংক্রমিত জল ফুসফুসে গিয়ে সরাসরি ফুসফুসেও জীবাণু চলে যেতে পারে অথবা সংক্রমিত লসিকা গ্রন্থি ও অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লির বাধা অতিক্রম করে শরীরের সর্বত্র বিভিন্ন অঙ্গে চলে যায়। এই যক্ষ্মারোগ সাধারণতঃ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া মানুষদের (শিশু, HIV আক্রান্ত, ডায়াবেটিস রোগী) হতে দেখা যায়। এইসব যক্ষ্মা রোগীরা 'ননটিউবারকুলার মাইকো ব্যাকটেরিয়া' (NTM) অসুখে আক্রান্ত হয়। এই NTM আক্রান্ত যক্ষ্মা রোগীদের সফলভাবে ঔষধ প্রয়োগ করা প্রায়শই কঠিন হয়ে পড়ে এবং দীর্ঘকাল যাবৎ চিকিৎসা করতে হয়। হিউম্যান মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবার কিউলোসিস দ্বারা আক্রান্ত রোগীদের যে সকল টিবির ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়, সেই সমস্ত অনেক প্রকার Anti TB ঔষধেও এইসব NTM TB জীবাণু ধ্বংস করা যায় না। এই প্রকার TB অসুখেও সারা বিশ্বে বহু মানুষ আক্রান্ত হয়ে চলেছে। NTB-TB রোগীর চিকিৎসায় আলাদা কিছু ঔষধ সম্মিলিত ভাবে প্রয়োগ করে চিকিৎসা করা হয়।

যক্ষ্মা রোগী হ'তে অন্যান্য মানুষের মধ্যে সংক্রমণের প্রধান রাস্তা হ'ল কাশির সঙ্গে রোগীর উদ্গত কফের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বাতাস দ্বারা বাহিত হয়ে সুস্থ মানুষের ফুসফুসের মধ্যে সংক্রমণের চেষ্টা। এই সংক্রমণ প্রতিরোধ করার যে সমস্ত আচরণবিধি পালন করার কথা বলা আছে তাহা আমাদের অবশ্য পালনীয়। কফে নির্গত যক্ষ্মার জীবাণু (Sputum Positive রোগীর) ল্যাবরেটরিতে মাইক্রোসকোপে কফপরীক্ষার মাধ্যমে দেখা যায়। যক্ষ্মারোগীর অসুখের সংক্রমণের লক্ষণে সহজেই ওই রোগীকে যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত বলে সন্দেহ করা হয়। পরে রোগীর কফ পরীক্ষা করে যক্ষ্মার জীবাণু মাইক্রোসকোপে দেখে রোগ নির্ণয় নিশ্চিত হয়। কফে জীবাণু না পাওয়া গেলে বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আধুনিক উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্রের সাহায্যে জীবাণুর ক্ষুদ্রাংশের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। এমন কি টি.বি. ঔষধের বিরুদ্ধে জীবাণু প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেছে কিনা তাও জানা যায় (Molecular Diagnosis – CBNAAT পরীক্ষা বা Cartridge Based Nuclear Amplification Assay Test). M.T.B. ব্যাকটেরিয়ার কালচার-ও ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন TB ঔষধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে কিনা তা DST বা Drug Sensitivity Test করে জানা যায়। এ ছাড়া কফে যক্ষ্মার জীবাণু না পাওয়া গেলে রোগীর বুকের এক্স রে ফটো করে যক্ষ্মা হয়েছে কিনা তার অনুমান আরও দৃঢ় হয়। বুকের এক্স রে তে জীবাণু সংক্রমণের হদিশ না পাওয়া গলে TST অর্থাৎ Tuberculin Skin Test বা মান্টু টেস্ট (Mantaux Test) করা যায়। এছাড়া রক্ত পরীক্ষায় Gamma Interferron-এর উপস্থিতি (Quantiferon TB Gold) পরীক্ষা করে Sputum Negative TB-র যক্ষ্মারোগ নির্ণয় করা হয়। সম্প্রতি রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে T Spot TB পরীক্ষায় Activated T. লিম্ফোসাইট কোষ দেখা হয় TB. Antigen দিয়ে inoculate করার পর এবং তাতে টি.বি. রোগ নির্ণয় হয়। এই পরীক্ষাটি 'কোয়ান্টিফেরন'

টিবি গোল্ড পরীক্ষা বা 'টিউবারকুলিন স্কিন টেস্ট' অপেক্ষা যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ে বেশি সাহায্যকারী বিশেষতঃ LTB1 বা সুপ্ত TB ইনফেকশনের ক্ষেত্রে।

যক্ষ্মারোগকে আয়ত্তে আনা খুব কঠিন, কারণ M.T.B. ব্যাকটেরিয়ার জীবনে মিউটেশনের (গঠনের পরিবর্তন) জন্য অ্যান্টি টি.বি ঔষধের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে (Genetic Resistance)। অ্যান্টি টি.বি. ঔষধ নিয়মিত এবং সঠিক ডোজে না খেলে এবং, টিবি ঔষধের পুরো কোর্স না খেলে, রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকলে, HIV অসুখে আক্রান্ত হলে, মাদকাসক্ত যক্ষ্মারোগীদের ক্ষেত্রে, ডায়বেটিস অসুখ, ক্যান্সার অসুখ থাকলে, অন্য কোন অসুখের জন্য দীর্ঘকাল স্টেরয়েড গ্রহণ করলে ড্রাগ রেজিসট্যান্ট M.T.B. জীবাণু স্পিসিসের উদ্ভব হয়। অ্যান্টি টিবি ঔষধ সেবনে কোন কোন রোগীর সহ্য হয় না। বমি, ক্ষুধামান্দ্য, জন্ডিস, রেজিস্ট্যান্ট TB ব্যাকটেরিয়া উদ্ভবের কারণ। যক্ষ্মারোগ নির্মূলকরণে যেমন যক্ষ্মারোগের দ্রুত রোগ নির্ণয় প্রথম ও প্রধান জরুরি কাজ ও তার সঙ্গে প্রথম সারির ঔষধ শীঘ্র চালু করা দরকার, সেইরূপ রোগী নিয়মিত অ্যান্টি টিবি ঔষধ সেবন করছে কিনা এবং ঔষধের কোর্স সম্পূর্ণ করছে কিনা তাও সরাসরি দেখা (DOT-এর মাধ্যমে) জরুরি। চিকিৎসারত রোগীর কফে পুনরায় সরকারি নির্দেশ নামা অনুসারে যক্ষ্মাজীবাণু পাওয়া গেলে, কিছু রোগীর কফের মধ্যে রেজিসট্যান্ট TB জীবাণুর জিনোমিক সিকোয়েন্স পরীক্ষার মাধ্যমে কোথায় কোন জিনের মিউটেশন ঘটেছে তা পরীক্ষা করা হয় এবং সঠিক যক্ষ্মার ঔষধ নির্ধারণ করে তা রোগীকে দেওয়া হয়। সরকারি ব্যবস্থাতেও এই পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

RNTCP (Revised National Tuberculosis Control Programme)—এর আদেশনামা অনুসারে যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা:—সম্প্রতি NTEP (National Tuberculoris Elimination Programme) এর কর্মসূচি বলবৎ এর আগে RNTCP-র নির্দেশ অনুযায়ী বিশ্বে তথা ভারতে যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। সদ্য রোগনির্ণয় হওয়া যক্ষ্মারোগীদের 'Category 1' এর অন্তর্ভুক্ত সম্মিলিত ঔষধ দুইটি পর্যায়ে—প্রথম ইনটেনসিভ ফেজ দুইমাস এবং শেষ কন্টিনিউএশন ফেজ চারমাস ঔষধ প্রয়োগ করার পর রোগ সারলে তা বন্ধ করা হত। প্রথম ফেজে রিফামপিসিন, আই. এন. এইচ, পাইরাজিনামাইড ও ইথামবিউটল (RHPE) এই চার প্রকার ঔষধ সম্মিলিত ভাবে খাওয়ানো হত। মস্তিষ্কে ও মেনিনজেসে যক্ষ্মা সংক্রমণে স্ট্রেপটোমাইসিন ইনজেকশান প্রথম দুই মাস সপ্তাহে ৩ দিন করে দেওয়া হত। চিকিৎসার শেষ ফেজে চারমাস তিনপ্রকার ঔষধ (RHE) মুখে খাওয়ানো হত DOTS (Directly Observated Treatment, Short Course)-এর তত্ত্বাবধানে। এইসব ঔষধ একদিন অন্তর অর্থাৎ সপ্তাহে ৩ দিন করে দেওয়া হত। কফে যক্ষ্মা জীবাণু চিকিৎসার ২ মাস পরেও পাওয়া গেলে অথবা চিকিৎসা শেষ করার পর পুনরায় যক্ষ্মা জীবাণুর অস্তিত্ব পাওয়া গেলে (Relapse) ঔষধের কোর্স দীর্ঘায়িত করে 'Catagory II'-র সম্মিলিত ঔষধ প্রয়োগ করা হত আট মাস ধরে (IP এর ৩ মাস এবং, CP এর ৫ মাস)। এই রোগীরা চিকিৎসায় না সারলে বা ঔষধের সম্পূর্ণ কোর্স শেষ না করলে অনেক রোগীকে MDR-TB (মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টি.বি.) বলে সন্দেহ করা হত এবং, DST করে এবং জিনোমিক পরীক্ষায় অন্তত INH এবং, Rifampicin এর বিরুদ্ধে ড্রাগ-রেসিসট্যান্ট M.T.B. রোগনির্ণয় হত। সেইমত এইসব MDR-TB যক্ষ্মারোগীদের দ্বিতীয় সারির যক্ষ্মা ঔষধ (Second Line ATD) প্রয়োগ হত অন্তত ছয়প্রকার ঔষধ সম্মিলিতভাবে। ঔষধগুলি হল—Kanamycin ইনজেকশন, Amikacin ইনজেকশন, Capremycin ইনজেকশন এবং ট্যাবলেট মক্সিফ্লক্সাসিন, High Dose লিন্ডোফ্লক্সাসিন, সাইক্লোসেরিন, PAS, অ্যামক্সিসিলিন-ক্ল্যাভুলানেট, এথিওনামাইড, প্রোথিওনামাইড, লিনেজোলিড, ডেলামেনিড, রেডাকুইলিন, ক্লোফাজামিন এবং কার্বাপেনেম ইনজেকশন ইত্যাদি। এই ঔষধগুলি বেশ ক্ষতিকারক দীর্ঘদিনের সেবনে। অনেকক্ষেত্রে রোগী সহ্য করতে পারে না। বমি, ক্ষুধামান্দ্য, জনডিস ইত্যাদি দেখা দেয়। দ্বিতীয় সারির যক্ষ্মারোগের ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা অন্তত ৯ মাস বা বেশি পক্ষে ১৮ মাস চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। বেশ কিছু ক্ষেত্রে MDR TB রোগীর সংখ্যা আরও বেড়ে গেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে HIV সংক্রমিত রোগীদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের সংক্রমণ। এদের অনেকে MDR-TB ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত। এই MDR TB ব্যাকটেরিয়া ফ্লুওরোকুইনোলোন (মক্সিসাইক্লিন, লিভফ্লক্সাসিন ইত্যাদি) ঔষধে এবং আরও অন্য দ্বিতীয় সারির ইজেকশন ঔষধের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে পড়লে তখন রোগীকে XDR TB (Extremely Drug Resistant TB) বলে রোগ নির্ণয় হয়। কফের DST পরীক্ষা করে ও Genomic Sequence পরীক্ষার বিশ্লেষণে XDR-TB রোগ নির্ণয় হয়। এইসব XDR-TB রোগীদের ১৮ মাস থেকে ২৪ মাস সম্মিলিত যক্ষ্মার ঔষধ (৬ থেকে ৭ প্রকার ঔষধ) খাওয়ানো হয়। প্রায়শই এইসব রোগীরা ঔষধের সম্পূর্ণ কোর্স শেষ করতে পারে না, এবং শেষে রোগী মারা যায়। এ পর্যন্ত প্রকাশিত রিপোর্টে ৪৮%-৬০% XDR-TB রোগী চিকিৎসায় সেরে গেছে। তবে WHO এর রিপোর্টে সারা পৃথিবীর মাত্র ২২% রোগী রোগমুক্ত হয়েছে XDR-TB রোগের চিকিৎসায়। এই রিপোর্টে HIV পজিটিভ TB রোগীর সংখ্যাও যোগ করা হয়েছে। রোগের কি ভয়াবহ চিত্র তা চিন্তা করলে আতঙ্ক হয়। রোগীর যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়লে তার রক্তে শর্করার মাত্রা ও HIV-এর সংক্রমণ পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক।

NTEP-র নির্দেশ নামা অনুসারে বর্তমান যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা : MDR-TB এবং XDR-TB রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য C.D.C. (Centers for Disease Control and Prevention), WHO এবং NTCA (National Tuberculosis Coalition of America) সম্মিলিতভাবে NTEP-4 নির্দেশনামায় সকল দেশকে TB-অসুখকে নির্মূল করার আহ্বান জানিয়েছে ২০৩০ সাল নাগাদ যক্ষ্মা রোগ নির্মূল করার জন্য এই কর্মযজ্ঞে সমস্ত শক্তি দিয়ে। এই রোগের (১) প্রতিরোধ; (২) দ্রুত রোগ নির্ণয় (৩) নতুন

যক্ষ্মা রোগীদের যাদের বয়স <২২ বছর প্রতিদিন সম্মিলিত যক্ষ্মার ঔষধ (RHEP) খাইয়ে ৬ মাসের চিকিৎসায় রোগ নির্মূলের প্রচেষ্টার পরিবর্তে চার মাসের Short Treatment যক্ষ্মার ঔষধের কোর্স INH, Rifampicin, Pyrazinamide এবং Moxyfloxacin সম্মিলিত ভাবে মুখে প্রত্যহ খাইয়ে চিকিৎসা; (৪) MDR-TB রোগীদের যারা Rifampicin Resistant কিন্তু Fluoroquinolone Susceptible এবং রোগীর বয়স >১৪ বছর তাদের নূতনভাবে মুখে খাবার সম্মিলিত যক্ষ্মার ঔষধ চার প্রকার—বেডাকুইলিন, প্রিটোম্যানিড, লিনেজোলিড এবং মক্সিফ্লক্সাসিন (B Pa L M-Regime) একযোগে প্রয়োগে ৬ মাসের চিকিৎসায় রোগে আরোগ্যলাভ; (৫) বেশির ভাগ অল্পবয়সী (৩ মাস থেকে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) যে সব যক্ষ্মারোগীর রোগ অত জটিল হয়নি তাদের চিকিৎসা ছয় মাসের বদলে চারমাসে করা যাবে—প্রথম দুই মাস RHZE এবং পরের দুই মাস RH ঔষধ খাইয়ে; (৬) এক্সপার্ট প্যানেল আরও নির্দেশ দেয় যে, যে সমস্ত যক্ষ্মারোগী বয়স > ১৪ বৎসর ও ফুসফুসে আক্রান্ত যক্ষ্মারোগী যারা রিফামপিসিন রেজিস্ট্যান্ট এবং ফ্লুওরোকুইনোলোন রেজিসট্যান্ট বা এই ঔষধ সহ্য করতে পারছেন না তারা ৬ মাসের বেডাকুইলিন, প্রিটোম্যানিড ও লিনেজোলিড ঔষধ (B Pa L-Regime) প্রতিদিন নিয়মিত DOT-S তত্ত্বাবধানে খাবেন। (৭) WHO, MDR এবং XDR-TBর চিকিৎসার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে B PaLM/B Pa L সম্মিলিত ঔষধ প্রয়োগ অতি দ্রুততায় প্রয়োগ করতে আহ্বান ''Call to Action'' জানিয়েছে; (১০) HIV পজিটিভ TB রোগীদের ও HIV নেগেটিভ TB রোগীদের একইভাবে সম্মিলিত ঔষধ প্রয়োগে ৬ মাসের কোর্সে ওই নির্দ্দিষ্ট সময়ে চিকিৎসা করা হয়; (১১) মস্তিষ্ক ও মেনিনজেসের যক্ষ্মা রোগে সংক্রমণে ডেক্সামিথাজোন অথবা প্রেডনিসোলোন দ্বারা রোগের প্রাথমিক পর্যায়ের ২ মাসের অ্যাডজুভেন্ট চিকিৎসা। (১২) যে সব যক্ষ্মা রোগীদের সম্মিলিত যক্ষ্মা ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াবশতঃ নার্ভের প্রদাহ হবার সম্ভাবনা আছে তাদের ভিটামিন B6 বা পাইরিডক্সিন যক্ষ্মার ঔষধের সাথে রোগীকে খাওয়ানো হবে। (১৩) রোগীকে যক্ষ্মারোগের ঔষধ খাওয়ানো হবে সরাসরি তত্ত্বাবধানে DOTS-এর মাধ্যমে; (১৪) ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ বা রোগীদের বিশেষতঃ যক্ষ্মারোগীর বাসগৃহে বসবাসকারী বাচ্চাদের ও অন্যান্য মানুষদের এবং HIV অসুখে আক্রান্ত রোগীদের যক্ষ্মা প্রতিরোধ করার জন্য চিকিৎসা বা সুপ্ত টি বি সংক্রমণের LTBI-Latent T.B. Infection চিকিৎসার নির্দেশাবলী জারি করা হয়েছে। যক্ষ্মার সংক্রমণের পর যাতে ঐ ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ যক্ষ্মারোগগ্রস্থ না হয়ে পড়েন বা সেই সুপ্ত সংক্রমণের অগ্রগতি রুখে দেবার জন্য যে সমস্ত যক্ষ্মার ঔষধ প্রয়োগের বিধি বলবত করা হয়েছে তা হল:—(ক) ৬ মাস বা ৯ মাস ধরে রোজ কেবলমাত্র INH ট্যাবলেট খাওয়ানো (INH_6 or INH_9); (খ) ৩ মাস ধরে প্রতি সপ্তাহে একবার করে রিফাপেনটিন ট্যাবলেট ও প্রত্যহ INH ট্যাবলেট খাওয়ানো (Rt. once weekly + INH 3 months); (গ) ৩ মাস ধরে রোজ রিফামপিসিন এবং INH ট্যাবলেট খাওয়ানো (Rc+H) 3 months; (খ) MDR/XDR TB (Multi Drug Resistant এবং Extremely Drug Resistant TB) রোগীর সংস্পর্শে থাকা রোগীদের ৬ মাস ধরে রোজ একবার করে Levofloxacin ট্যাবলেট খাওয়ানো (L6); (১৫) রাজ্য, জেলা, সাব ডিভিসনে; নানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও বড় হাসপাতালে সর্বত্র যক্ষ্মারোগের সচেতনতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, T.B. সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের বিভিন্ন ট্রেনিং ও শিক্ষার মাধ্যমে এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সঙ্গে যক্ষ্মা রোগীদের সুপরামর্শে রোগ চিকিৎসার সঠিক দিশার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি বছরের মত ২০২৫ সালের ২৪ মার্চ বিশ্ব যক্ষ্মারোগ দিবসে জনগণের প্রতি ডাক হল— 'হ্যাঁ, আমরা যক্ষ্মারোগ নির্মূল করতে পারি। আমরা সবাই একযোগে এই কাজ করার জন্য সর্বশক্তি এখনই নিয়োগ করি—'Commit, Invest and Deliver High Quality Care'. আমরা সবাই এটা সম্পন্ন করার জন্য দায়বদ্ধ। আমাদের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে যক্ষ্মা রোগ নির্মূল করা।

NTEP এর নূতন উদ্যোগ :—(১) প্রধানমন্ত্রী যক্ষ্মারোগ নির্মূলকরণের জন্য আগামী ১০০ দিনে এই বিষয়ের জরুরি কাজে সকলকে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিয়েছেন বিশেষতঃ যে সব অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যক যক্ষ্মারোগী আছে যেমন, বস্তি এলাকা, খনি এলাকা, ছোট, মাঝারি ও বড় শিল্পাঞ্চল, দুর্গম পাহাড় অঞ্চল ও স্বাস্থ্য পরিষেবা যেথায় অপ্রতুল, HIV ও নেশাগ্রস্থ রোগীদের মধ্যে, ডায়াবেটিস ও অপুষ্টিতে ভোগা মানুষদের মধ্যে টিবি রোগী খুঁজে বের করা ও রোগীদের যথাযথ নির্দেশ অনুযায়ী, রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করা। (২) সরাসরি রোগীদের সাথে যক্ষ্মারোগ বিষয়ে ডাক্তারবাবু ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আলাপ আলোচনা ও নানান সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান। (৩) রোগীদের যত্ন আরও ভালভাবে নেওয়া। উচ্চ প্রোটিন যুক্ত ও ক্যালরি, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার প্রদান। (৪) নিঃক্ষয় পোষণ যোজনায় রোগীদের আর্থিক সহায়তা ৫০০/ (পাঁচশত টাকা) প্রতি মাসে—Direct Benifit Transfer। (৫) MDR TB এবং XDR-TB রোগীদের প্রতি বেশী যত্নবান হওয়া। তাদের পক্ষে M. TB. পরীক্ষায় Whole Genome Sequencing এবং Drug Resistant TB, Surveillance—কাজটি অতিদ্রুততায় করে ফেলা। (৬) TB.-রোগীদের যক্ষ্মার সুচিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি তারা অপুষ্টি, ডায়াবেটিস, HIV অসুখ, ড্রাগের নেশায় আসক্ত থাকলে ওই অসুখ গুলিরও সুচিকিৎসা করে যক্ষ্মারোগীদের সারিয়ে তুলতে সাহায্য করা। (৭) নিঃক্ষয় মিত্র যোজনায় যক্ষ্মারোগী ও তাদের সংস্পর্শে পরিবারের মানুষদের, খাদ্যদ্রব্য ও পুষ্টির যোগান ও তাদের রোগনির্ণয়ে সহায়তা করা এবং, তাদের সংসার নির্বাহের জন্য নানা প্রকার কর্মের সাথে যুক্ত করার সহায়তায় পরিবারগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা। (৮) যক্ষ্মা চিকিৎসায় ও প্রতিবছরে সমস্ত কর্মকাণ্ড রোগীর পাড়ায়, ব্লকস্তরের মাধ্যমে ট্রেনিং প্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে রোগীর কাছে পৌঁছে দেওয়া। এ ব্যাপারে ASHA (Accredited Social Health Activist) কর্মীদের, টি.বি.

বিজেতা (TB Champion)-দের এবং পরিবারের সহায়তাকারী মানুষদের প্রতি মাসে আর্থিক অনুদান দিয়ে উৎসাহিত করা। (৯) এই প্রকল্পের সমস্ত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে Digital Health Initiative দ্বারা ধরে রাখা নিঃক্ষয় টিবি অর্ন্তজালের মাধ্যমে। এই প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী সর্বস্তরের স্বাস্থ্যকর্মীরা পৃথিবীর সমস্ত স্থান হতে TB রোগীদের যাবতীয় নথিপত্র অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। কেন্দ্রিয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রকে যক্ষ্মার বিভাগ এবং জাতীয় ইনফরমেশন কেন্দ্র যুগ্মভাবে এই সিস্টেম চালু করেছেন। (১০) বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র ও হাসপাতালেরও সম্পূর্ণ সাহায্য নিয়ে ব্লকের সমস্ত মানুষকে এই যক্ষ্মা নির্মূলকরণ অভিযানে নিযুক্ত করা। (১২) বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া, পোস্টার, ব্যানার, স্বাস্থ্য শিক্ষা শিবির ও সভার মাধ্যমে এবং রেডিও ও মাইকের মাধ্যমে যক্ষ্মারোগী সম্বন্ধে এবং রোগীদের পরিষেবা ও সাহায্যের নানা বিষয় সম্বন্ধে জনগণকে দ্রুত সচেতনতার আলোকে আলোকিত করা। এইভাবে অচেতন মানুষদের যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হবে এবং তারা রোগ দূরীকরণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন।

*ভূতপূর্ব অধ্যাপক, স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন, কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়) ২০২৫-'২৬

	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬
মোট বাজেট বরাদ্দ	৩,৬৫,১১৬	৩,৮৯,১৯৪.০৯
মূলধন খাতে বরাদ্দ	৩৫,৮৬৬	৪০,০৮৬
সামাজিক ক্ষেত্রে বরাদ্দ	৯২,৮৪০	৯৯,০১৬
পরিকাঠামো খাতে বরাদ্দ	১০,৫৯৫	১২,১৮৪
লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বরাদ্দ	১৪,৪০০	২৬,৭০০
বাংলার বাড়ি খাতে		১৫,৪৫৬
কৃষকবন্ধু (নতুন)	৫,৮০০	৫,৭৮১
কৃষকবন্ধু (মৃত্যুকালীন)	৭০০	৭১৪
জয় বাংলা পেনশন	১০,৫০১	১০,৬০৩
স্বাস্থ্যসাথী	২,৭৬৫	৮৫৮
কন্যাশ্রী	১,৩৭৪	১,৮০৩
রূপশ্রী	৭০৪	৬৮৫
সবুজসাথী	৫১৪	৪৯৩
উচ্চশিক্ষা	৬,৪০১	৬,৫৯৩
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	১৯,৮৫১	২১,৩৫৫
নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ	২৬,৫৯০	৩৮,৭৬২
সংখ্যালঘু বিষয়ক	৫,৫৩০	৫,৬০২
পূর্ত	৬,৭৭৬	৬,৭৯৬
জনস্বাস্থ্য কারিগরি	৪,৫৭৬	১১,৬৩৬
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন	২৯,৬০২	৪৪,১৩৯
পুর ও নগরোন্নয়ন	১৩,৩৪১	১৩,৩৮১
খাদ্য ও সরবরাহ	৯,৮৫৮	৯,৯৪৪
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প	১,২৬২	১,২২৮

প্রকৃতি ও পরিবেশ

চলে গেলেন অরণ্যের জীবন্ত বিশ্বকোষ তুলসী গৌড়া

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

কিংবদন্তি শ্রীমতী তুলসী গৌড়া-অরণ্যের জীবন্ত বিশ্বকোষ। বার্ধক্য জনিত অসুস্থতার কারণে প্রয়াত হলেন ৮৬ বছর বয়সে। এইতো মাত্র সেদিনের কথা। ২০২১ সালে রাষ্ট্রপতি ভবনের ঐতিহাসিক দরবার হলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কৃতীদের বার্ষিক রাষ্ট্রীয় পদ্ম পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। ঘোষক ঘোষণা করলেন পদ্মশ্রী তুলসী গৌড়ার নাম। দরবার হলে উপস্থিত নামীদামী অতিথি অভ্যাগতদের পোষাকের খসখসানি, ফিসফিসিয়ে কথা বলাকে এক লহমায় থামিয়ে দিয়ে নগ্নপদে দৃঢ় অথচ বিনম্র পদক্ষেপে প্রথাগত হালাক্কি উপজাতীয় রমণীর শালীন পোশাকে রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দের সামনে এসে দাঁড়ালেন এক অসাধারণ মানবী – তুলসী গৌড়া দেবী। দরবার হল তখন মুখরিত হয়ে ওঠে অতিথি অভ্যাগতদের সম্মিলিত করতালির শব্দে। পরের দিন দৈনিক সংবাদপত্রে তাঁর ছবি সহ প্রতিবেদনের শিরোনামে লেখা হলো "দরবার হলে হাজির প্রকৃত ভারতবর্ষের প্রতিমূর্তি তুলসী গৌড়া– অরণ্যের জীবন্ত বিশ্বকোষ।"

তুলসী গৌড়া

ঘটা করে ঢাকঢোল পিটিয়ে একদিনের জন্য বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন নয়, বনবালা তুলসীর কাছে বৃক্ষরোপণ ছিল এক নিত্যদিনের অভ্যাস, বেঁচে থাকার এক আনন্দময় উৎসব। তুলসীর জন্ম ১৯৩৮ সালে , অরণ্যময় কর্ণাটক রাজ্যের উত্তর কন্নড় জেলার এক স্থানীয় হতদরিদ্র হালাক্কি উপজাতীয় পরিবারে। বাবা নারায়ণা এবং মা নীলি। পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় দশা, তাই পাঠশালার পথে পা বাড়ানোর সুযোগ আর পাননি। কিন্তু তাতে কি! চারপাশে ঘিরে থাকা গহন বনপথে চলতে চলতেই তুলসী একদিন জেনে শিখে বুঝে নিলেন গাছগাছালির পরিচয়, তাদের সমবেত অবস্থানের অপার সৌন্দর্য আর উপযোগিতার আশ্চর্য আখ্যান।

অবশ্য একাজে তাঁকে প্রাণিত করেছেন তাঁর মা নীলি দেবী। মা কাজ করতেন বনবিভাগ পরিচালিত স্থানীয় সরকারি নার্সারিতে। সকালেই তাঁকে কাজে বেরিয়ে যেতে হতো। মেয়েকে একলা কোথায় রেখে যাবেন ? তাই তুলসীকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। মায়ের সঙ্গে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে বনের গাছপালা, লতা গুল্ম, ভেষজগুণ সম্পন্ন গাছগাছালির সাথে এক নিগূঢ় সম্পর্কের বন্ধন তৈরি হয় তাঁর। আমৃত্যু সেই বন্ধনেই বাঁধা পড়েছিলেন তুলসী গৌড়া দেবী। মায়ের হাতেই বনের পাঠ পড়ার হাতেখড়ি। প্রায় সাত দশক ধরে সেই পাঠেই নিজেকে নিবদ্ধ রেখে গেলেন তিনি। আমার পড়া শেষ বা আমার কোর্স খতম বলে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করার কথা ভাবেননি কখনও, বরং অতি পরিচিত, প্রতিদিনের জানার মধ্যেও তিনি অজানার সন্ধানে নিয়োজিত ছিলেন। উত্তর কানাড়া জেলার সুবিস্তীর্ণ বনভূমির বৃক্ষ পরিচিতি ছিল তাঁর নখদর্পণে। একাজে একেবারে মজে ছিলেন। তাই কোনো অপূর্ণতা তাঁকে কখনও স্পর্শ করেনি। আর হয়তো সেই জন্যই জানার পথের একাকী পথচারিণী হয়েই তাঁর একান্ত ব্রত সাধনা। একা হাতেই প্রায় সামলে নিয়েছিলেন একটা গোটা বনমহলের ভালোমন্দের সব কিছু।

মায়ের মৃত্যুর পর বনদফতরেই অস্থায়ী বন সহায়িকার কাজে যোগদান করেন তুলসী দেবী। আসলে বন সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে হাতছাড়া করতে চায়নি সরকারের বনবিভাগ। কেতাবি শিক্ষা ছাড়াই তিনি হয়ে ওঠেন "উদ্ভিদবিজ্ঞানের জীবন্ত বিশ্বকোষ"/ The Living Encyclopaedia of Botany." দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তিনি পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিক ভালোবাসায় পরিবেশ পরিমন্ডলের সেবা করে গেলেন কোনো কিছু প্রাপ্তির আশা না করেই। যখন তুলসীর বয়স মাত্র দুই তখন তিনি তাঁর বাবাকে হারান। সেই থেকেই মায়ে ঝিয়ের লড়াই শুরু। পরবর্তীতে পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে একাই লড়াই করে গেলেন কোনো কিছুর সঙ্গে আপোষ না করেই। বনের যে কোনো গাছের মাতৃ প্রজাতির শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে তুলসী দেবীর ছিল প্রশ্নাতীত দক্ষতা। অরণ্য বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই মাতৃ বৃক্ষের ভূমিকা অনন্য। এদের রক্ষণাবেক্ষণ করার ওপরই নির্ভর করে অরণ্যের অস্তিত্ব, সবার সাথে এক হয়ে টিকে থাকার রসায়ন। তুলসী দেবী নিজের এই ভালোবাসা, জ্ঞান অকৃপণভাবে ভাগ করে নিয়েছেন সবার সঙ্গে। নিজে শিখেছেন, শিখিয়েছেন অন্যদের যাতে অরণ্য অনন্য হয়ে উঠতে পারে সবার জন্য।

হালাক্কি জনগোষ্ঠীর মানুষদের কাছে তিনি ছিলেন "বনদেবী, অরণ্যের জননী, কাদিনা দেবাতে।" সেই দেবী হয়েই রয়ে যাবেন তিনি অগণিত মানুষের কাছে।

তুলসী গৌড়াদের মৃত্যু নেই। কারণ তুলসী গৌড়াতো কেবল একজন দেহাতি মানবী নন, তুলসী গৌড়া হলো এক ধারণার নাম, এক বিশ্বাসের নাম, এক সুগভীর ভালোবাসার নাম, এক নিরলস কর্মময় জীবনের নাম। সবার হৃদয়ে লেখা এ নাম রয়ে যাবে।

ভালো থাকবেন তুলসী, ভালো থাকবেন। প্রণাম।

ভালোপাহাড় ভালো থেকো

অরণি সেন

['স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' পত্রিকার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বিশিষ্ট পরিবেশ সংরক্ষক, সমাজ কর্মী এবং সাহিত্যিক শ্রী কমল চক্রবর্তী (১৯৪৬ - ২০২৪) চলে গেলেন। তাঁর পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিষয়ে তিনি প্রথমে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারপর থেকে মিষ্টভাষী কমলদার সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁর আমন্ত্রণে দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ও অরণি সেন ধলভূমগড়, গালুডি হয়ে 'ভালো পাহাড়ে' পৌঁছন ও থাকেন। এবার সম্পর্কটি ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছয়। সেন তার বৎসরাধিককাল পুরুলিয়া বাসে পটমদা, বান্দোয়ান, দুয়ারসিনি, রাইকা পাহাড়, দলমা পাহাড়, বুরুডি, ঘাটশীলা যাওয়ার পথে বহুবার 'ভালো পাহাড়ে' যান। আকস্মিক অসুস্থতার পূর্ব অবধি কমলদার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।— সম্পাদকমন্ডলী।]

দলমা পাহাড়

নীল পাহাড়, সবুজ বন, আদিবাসী বালক - বালিকা আর নিশুতি রাতের জোনাকিদের সাহচর্য ছেড়ে তারাদের দেশে পাড়ি দিলেন কমলদা—

তাঁর বৃক্ষনাথদের বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টাকে অসমাপ্ত রেখে সুবর্ণরেখার গুণী সন্তান, 'টাটা বাবা' প্রমুখ জনপ্রিয় কবিতা ও প্রচুর চমকপ্রদ গদ্যের রচয়িতা, 'কৌরব' পত্রিকার প্রাণপুরুষ, একদা 'টেলকো' র ইঞ্জিনিয়ার এবং পরবর্তীতে পুরুলিয়ার বন্দোয়ানের দলমা পাহাড়ের পাদদেশে কুইচা অঞ্চলে ঊষরভূমিতে একশ বিঘা জমিতে লক্ষাধিক দেশজ গাছ লালন পালন করে 'ভালো পাহাড়'

সাতগুরুম নদী

পরিবেশ সামাজিক ও শিক্ষা আন্দোলনের প্রবক্তা শ্রী কমল চক্রবর্তী চলে গেলেন না ফেরার দেশে।

আমরা হারালাম অফুরান শক্তির তরতাজা এক চিরযুবক বন্ধু ও সুহৃদকে। তিনি 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' পত্রিকার একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খুব কম সময়ের মধ্যে শ্রী সনৎ রায়চৌধুরী, শ্রী সমর বাগচী এবং শ্রী কমল চক্রবর্তী তিন প্রিয় পৃষ্ঠপোষককে হারিয়ে আমরা গভীর দুঃখে ভারাক্রান্ত।

৭৮ বছর বয়স হলেও কমলদা ছিলেন অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, কর্মক্ষম, কর্মদীপনায় ভরপুর এক তরুণ তাজা প্রাণ। খালি পায়ে মেঠো পথে জঙ্গলে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কর্ম ব্যস্ততায় ছোটাছুটি করতেন। তিনি কোন শহুরে আদুরে পরিবেশ প্রেমী ছিলেন না, টাটা কোম্পানির বড় চাকরি ছেড়ে এসে ওরকম পশ্চাদপদ অঞ্চলে থেকে সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে লক্ষাধিক বৃক্ষনাথকে লালন পালন করেছিলেন। আদিবাসী শিশুদের জন্য স্কুল নির্মাণ করে তাকে ক্রমশঃ উন্নত করে তুলছিলেন। শিশুদের মধ্যে পৌঁছে দিচ্ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। এর সঙ্গে জৈব চাষে পরীক্ষা নিরীক্ষা, গোপালন, মৎস্য চাষ। স্থানীয় মানুষদের জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র। ঈশ্বর মেলা, পলাশ উৎসব ... কত কিছু। মায় ভালো পাহাড়কে তো একটা পর্যটন কেন্দ্র বানিয়ে তুলেছিলেন। এর সঙ্গে ছিল তাঁর সাহিত্য চর্চা। একটা সুন্দর লাইব্রেরি তৈরি করেছিলেন।

তাই কমলদার আকস্মিক চলে যাওয়া শুধু গভীর যন্ত্রণাই নয় এক বিরাট শূন্যতা। পরিবেশ আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি। কিন্তু এক সময় আমাদের সবাইকে আগে পরে চলে যেতেই হবে। থাকবে কমলদার ওই কাজের নজির। ওই কাজ করতে কমলদাকেও কি কম বাধা ও বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়েছিল? সবাইকেই কম বেশি হতে হয়। কমলদার মত সেগুলো অতিক্রম করে চলতে হয়।

কমলদা চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর সবুজের সমারোহ মহীরূহদের, তাতে বিচরিত অজস্র পাখ পাখালি প্রজাপতি। এছাড়াও কত রকমের দেশি ধান, পুকুর ভরা মাছ, গোশালা, নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ানো মরাল বাহিনী এবং অবশ্যই তার নিষ্ঠাবান সহযোগী ও ছাত্র ছাত্রীদের।

কমলদার আড্ডা

আর আছে বান্দোয়ানের অপার্থিব নিসর্গ প্রকৃতি, একদম কাছাকাছি রাইকা ও দলমা পাহাড় - জঙ্গল, ভালো পাহাড়ের কাছ দিয়ে ছলছলাৎ বয়ে চলা সাত গুরুম নদী, দুয়ারসিনির আদিবাসীদের বর্ণাঢ্য হাট, স্থানীয় সাঁওতাল, মুন্ডা, কোল, বিরহর, শবর, ভূমিজ, মাহাতো প্রকৃতির সন্তানরা।

তাঁদের সবাইকে নিয়ে ভালোপাহাড় ভালো থেকো।

হাসপাতালে ভর্তির আগে তিলোত্তমার উপর নারকীয় অপরাধের ঘটনায় কমলদার গভীর শোকভারনত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ:

"ভাবতে ভাবতে বুকে রক্ত জমে যাচ্ছে।" ১৬ আগষ্ট

"আর কত দিন, আমরা, মেরুদন্ডহীন হয়ে থাকব। জয় বৃক্ষনাথ।" ১৭ আগষ্ট

কমলদাকে আমাদের প্রণাম ও বিদায়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

মেঘনাদ সাহা ও তাপীয় আয়নীভবন তত্ত্ব

অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

সময়টা ১৯১৬ সাল। সেই বছরই কলকাতার রাজাবাজারে বিজ্ঞান কলেজের বাড়িটি তৈরি হল, এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগে ক্লাস শুরু হল জুলাই মাসের প্রথম দিন থেকে। তখনও সি ভি রামন (১৮৮৮-১৯৭০) যোগ দেন নি, অথচ পালিত অধ্যাপকের সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪) ও মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩-১৯৫৫)। তাঁদের মাসিক বেতন ২০০ টাকা। ওঁরা দু'জনেই গণিতের ছাত্র। কিন্তু এখানে পড়াতে হবে পদার্থবিদ্যা। অতএব প্রয়োজন আত্মপ্রস্তুতি। স্টাডি মেটেরিয়ালের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ান দুই বন্ধু। কিন্তু উপযুক্ত বইপত্র নেই কোথাও। তাছাড়া ওঁদের দৃঢ় বিশ্বাস পড়ানো ও গবেষণা পরস্পরের সম্পূরক এবং দুটোই একসঙ্গে চলা উচিৎ। এদিকে ইউরোপে বিজ্ঞানের মৌলিক ক্ষেত্রগুলিতে তখন একের পর এক নব দিগন্তের উন্মোচন হচ্ছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব, বোরের পরমাণু মডেল, আরও কত কী! অথচ সেইসব খবর সাগর পেরিয়ে সময়মত এখানে এসে পৌঁছোয় না। এক ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন ছাড়া আর কোনও বিজ্ঞানের পত্রিকাই প্রেসিডেন্সি কলেজে আসে না। তাছাড়া মহাযুদ্ধ লেগে যাওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত করুণ। অবশেষে ড. ব্রুল নামে এক অধ্যাপকের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল শিবপুর বি ই কলেজে, যাঁর দৌলতে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত একগুচ্ছ বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রবন্ধের সন্ধান পেলেন ওঁরা। অনেক প্রবন্ধই জার্মান ভাষায় প্রকাশিত। মেঘনাদ জার্মান জানেন আর সত্যেন্দ্রনাথও দ্রুত শিখে নিচ্ছেন এই ভাষা। দুজনে মিলে পড়ে ফেললেন প্ল্যাঙ্কের তাপীয় বিকিরণ সম্পর্কিত বইপত্র, নিলস বোরের পরমাণু তত্ত্ব, আইনস্টাইনের গবেষণা প্রবন্ধ, নার্নস্টের তাপবিজ্ঞান সম্পর্কিত লেখালেখি ইত্যাদি। মেঘনাদ কলেজে তাপবিজ্ঞান, তাপগতিতত্ত্ব ও বর্ণালীতত্ত্ব পড়াবার ভার নিলেন।

এক ফ্রেমে জগদীশচন্দ্র, মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথ

দুই বন্ধু পদার্থবিদ্যা বিভাগে পড়ানো শুরু করার এক বছর পর পালিত অধ্যাপক হিসাবে কলেজে যোগ দিলেন সি ভি রামন। কাগজে কলমে ওঁরা রামনের সহকারী হলেও ক্লাস নেওয়া বা গবেষণার কাজকর্ম করেন নিজেদের মতোই স্বাধীনভাবে। বিকিরণ, স্থিতিস্থাপকতা, ইলেকট্রনের তত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা ও চিন্তাভাবনা করেন মেঘনাদ। ততদিনে সত্যেন্দ্রনাথ বোসের সঙ্গে মিলে আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ জার্মান ভাষা থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ করে ফেলেছেন মেঘনাদ- এর মধ্যে আছে আইনস্টাইনের লেখা দুটো গবেষণাপ্রবন্ধ (১৯০৫ সালে প্রকাশিত বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ এবং একই বছরে প্রকাশিত সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ)। তাছাড়া ১৯০৯ সালে প্রকাশিত মিনকাওস্কির লেখা প্রবন্ধটিও পরিশিষ্ট সমেত অনুবাদ করে ফেলেছেন ওঁরা। ১৯২০ সালে The Principle of Relativity নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগ থেকে এই লেখাগুলো নিয়ে একটি সংকলন বের হয়। বইটির একটি চমৎকার ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ। আজও এই বইটি বাজারে পাওয়া যায়।

এদিকে ১৯১৭ সাল থেকেই মেঘনাদ কয়েকটি মৌলিক গবেষণাপ্রবন্ধ প্রকাশ করে ফেলেছিলেন যেখানে তড়িৎচৌম্বকীয় তত্ত্ব, আপেক্ষিকতাবাদ, কোয়ান্টাম তত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর স্পর্শ করতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি। ১৯১৮ সালে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে মিলে বাস্তব গ্যাসের অবস্থা সম্পর্কিত একটি সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মেঘনাদ। বিকিরণ ও তার চাপ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে লেখা থিসিসটির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিএসসি ডিগ্রি পেয়েছিলেন তিনি, কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে প্রথম ডক্টরেট।

একদিন তাপগতিতত্ত্বের ক্লাসে রাসায়নিক বিক্রিয়া পড়াচ্ছিলেন মেঘনাদ। হঠাৎ তাঁর মাথায় এলো এক ভাবনা - নক্ষত্রের অভ্যন্তরে উচ্চ তাপমাত্রায় পরমাণুর বাইরের দিকে আলগা হয়ে থাকা ইলেকট্রনগুলো বেরিয়ে গিয়ে আয়ন তৈরি হতে পারে। অবশ্য কতগুলো ইলেকট্রন বের হবে সেটা নির্ভর করবে ইলেকট্রনগুলো কত দৃঢ়ভাবে পরমাণুতে বাঁধা পড়ে আছে তার ওপর। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ধাঁচেই তিনি বের করে ফেললেন ঠিক কতগুলি পরমাণু এইভাবে ইলেকট্রন ত্যাগ করে আয়নে পরিণত হয়। আর তাই যদি হয় তবে সূর্যের আলোর বর্ণালীতে কোনো মৌল বা আয়নের ছাপ ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে আর কোথায় যাবে না সেটা তাঁর সমীকরণ থেকে বলে দেওয়া যাবে।

বরং বিষয়টি আরেকটু বুঝিয়ে বলা যাক। ১৮১৪ সাল নাগাদ জার্মান বিজ্ঞানী জোসেফ ফন ফ্রাউনহোফার লক্ষ্য করেন সূর্যের বর্ণালীতে বেশ কিছু কৃষ্ণবর্ণের রেখা রয়েছে, এমনকি নক্ষত্রদের বর্ণালীতেও এই ধরনের কালো রেখা দেখা যায়। নিজের হাতে তৈরি বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে তিনি এই রেখাগুলোর কম্পাঙ্ক পরিমাপ করেছিলেন। বস্তু উত্তপ্ত হলেই তা থেকে আলো বিকিরিত হয়,

তাছাড়া আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতাতেও জানি যে কোনো পদার্থকে অগ্নিশিখার অভ্যন্তরে প্রবেশ করালে শিখার বর্ণের পরিবর্তন হয়। আর এই পরিবর্তন উপাদান মৌলগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি মৌলের নিজস্ব বিশিষ্টমূলক বর্ণালী রয়েছে। উত্তাপ বৃদ্ধি করলে বর্ণালীচিত্রে নতুন নতুন রেখা সংযোজিত হয় ও জটিলতা বাড়তে থাকে। অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে বর্ণালীরেখার জটিলতা বৃদ্ধির একটা সম্পর্ক রয়েছে। এইরকম হাজারো ফ্রাউনহোফার রেখা নিয়ে গবেষণা করে ১৮৫৯ সাল নাগাদ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন বিজ্ঞানী গুস্তাফ কির্শপ। তাঁর বক্তব্য ছিল কোনো বস্তু একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের উজ্জ্বল রেখা উৎপন্ন করতে পারলে অবস্থা বিশেষে সেই একই কম্পাঙ্কের কৃষ্ণরেখাও উৎপন্ন করতে পারবে। অন্যভাবে বলতে গেলে পদার্থটি যে বর্ণের আলো বিকিরণ করে ঠিক সেই বর্ণের আলো শোষণও করতে পারে। আর এই বিকিরণ ও শোষণের অনুপাত নির্ভর করে কেবলমাত্র তাপমাত্রার ওপর, উপাদানের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এই বিবৃতিকে আমরা কির্শপের সূত্র বলে জানি। তাঁর মতে সূর্যের অভ্যন্তরভাগের তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি এবং সেখান থেকে নিঃসৃত সাদা আলো সূর্যের বাইরের দিকের অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রার আবরণ অতিক্রম করার সময় এই অঞ্চলের উপাদান মৌলগুলি নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাদা আলো থেকে বর্ণ শোষণ করে নেয়। সেইজন্যেই বর্ণালীচিত্রে আমরা কালো রেখা দেখতে পাই।

মেঘনাদ সাহা

নক্ষত্রের বর্ণালীতে পাওয়া রেখার সঙ্গে আমাদের পৃথিবীতে প্রাপ্ত মৌলদের বর্ণালীরেখা মিলিয়ে নক্ষত্রলোকের উপাদান সম্পর্কে ধারণা করেন বিজ্ঞানীরা। রাতের আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায় একেকটা নক্ষত্রের আলো একেক রকমের। বর্ণ অনুযায়ী নক্ষত্রগুলোকে O, B, A, F, G, K, M এই ছয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। এখানে O শ্রেণির নক্ষত্ররা সবচেয়ে বেশি উত্তপ্ত (এরা সংখ্যায় খুব কম প্রতি ৩,০০০,০০০ নক্ষত্রের মধ্যে ১ টি) এবং M নক্ষত্ররাজি হল সবচেয়ে শীতল। আমাদের সূর্য একটি G শ্রেণিভুক্ত নক্ষত্র। সৌরমণ্ডল এবং তার বাইরের মহাজাগতিক জগতের উপাদান সম্পর্কে খুব একটা পরিষ্কার ধারণা তখনও বিজ্ঞানীদের ছিল না। তাঁদের বিশ্বাস ছিল গ্রহ, উপগ্রহ সহ আমাদের সৌরমণ্ডলের সমস্ত কিছুই সূর্য থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, তাই এদের গঠনগত উপাদান অভিন্ন। এমনকি ওঁরা মনে করতেন তাপমাত্রার পার্থক্য হলেও সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র পৃথিবীর মতো হুবহু একই উপাদানে তৈরি। হেনরি রল্যান্ড নামে এক আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী একবার মন্তব্য করেছিলেন— "আমাদের এই আস্ত পৃথিবীটাকে যদি কোনোভাবে সূর্যের সমান উষ্ণতায় নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে সেটা থেকে নির্গত আলোকরশ্মি ঠিক সূর্যের মতোই হবে।" তাছাড়া নক্ষত্রের গঠন সম্পর্কিত এডিংটনের তত্ত্বও রল্যান্ডের বক্তব্যকে সমর্থন যোগায়। কারণ এডিংটনের সমীকরণ অনুযায়ী সূর্য সহ অন্যান্য নক্ষত্রের মূল উপাদান সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, অক্সিজেন, আয়রন ইত্যাদি মৌল, যেগুলো আমাদের পৃথিবীর চেনা পরিবেশে যথেষ্ট মাত্রায় উপস্থিত রয়েছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল আরেকটি। ১৯১৯ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে যে ৯২ টি মৌলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল তাদের সবার বর্ণালীরেখা সূর্যে পাওয়া যায় নি। যেমন রুবিডিয়াম ও সিজিয়াম মৌল দুটি আমাদের পৃথিবীতে বেশ সহজলভ্য এবং এদের শিখাও খুব উজ্জ্বল, অথচ সৌরবর্ণালীতে এরা অনুপস্থিত। তাছাড়া সেই বর্ণালীতে প্রাপ্ত তথ্য কিছুতেই আমাদের পৃথিবীর হিলিয়াম ও হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলছে না।

ফিরে আসা যাক মেঘনাদ সাহার কথায়। কলকাতায় বসেই পরপর চারটি গবেষণাপ্রবন্ধ লিখে ফেলেছিলেন মেঘনাদ। সেটা ১৯১৯ সালের শেষদিক। প্রবন্ধগুলো প্রকাশের পরই আমেরিকা ও ইউরোপের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলে সাড়া পড়ে গেল। সৌর বর্ণালী বিশ্লেষিত তথ্যে সাহার সমীকরণের সাফল্যে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনরি নরিস। ততদিনে বোরের পরমাণু তত্ত্বের ধারণা বিজ্ঞানীরা জেনে গিয়েছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী উপযুক্ত শক্তির আলোককণা (ফোটন) হজম করে ফেলতে পারলে পরমাণুর কক্ষস্থিত ইলেকট্রন লাফিয়ে উচ্চ শক্তিস্তরে চলে যায় এবং শক্তি ত্যাগ করলে উচ্চ কক্ষ থেকে নিম্ন কক্ষে নেমে আসে। কিন্তু এই গৃহীত শক্তির পরিমাণ যথেষ্ট বেশি হলে পরমাণুটি উত্তেজিত হয়ে নিজের বাইরের কক্ষের এক বা একাধিক ইলেকট্রনকে বর্জন করে আয়নে পরিণত হতে পারে। আর মেঘনাদ বুঝেছিলেন নাক্ষত্রিক পরিবেশে এই আয়নে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটি ঠিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার মতো উভমুখী প্রক্রিয়া, যেখানে ধাক্কাধাক্কির ফলে পরমাণুগুলো ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে আয়নে পরিণত হয় আবার ইলেকট্রন জোগাড় করে নিজেদের অটুট পারমাণবিক অবস্থায় ফিরেও আসে। দ্বিমুখী ভারসাম্যের এই অবস্থা নির্ভর করবে পরিবেশের চাপ ও তাপমাত্রা উভয়ের ওপর। তাপমাত্রা বাড়ালে আয়ন উৎপন্ন হওয়ার পাশাপাশি পরমাণু ও আয়নের গতিশক্তিও বৃদ্ধি পায়, আর সেই কারণেই বর্ণালী ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ে।

মেঘনাদ আগ্রহী ছিলেন সূর্যের বর্ণালী নিয়ে, তাই প্রথমেই সূর্যের গঠন সম্পর্কে একটু বলে নেওয়া দরকার। এখনও পর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে তাতে ধারণা করা হয় সূর্যে একটি কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বাইরে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত রয়েছে কয়েকটি অঞ্চল। সবচেয়ে বাইরের আস্তরণটি হল বর্ণমণ্ডল (ক্রোমোস্ফিয়ার), এর ঠিক নীচে রয়েছে আলোকমণ্ডল (ফোটোস্ফিয়ার)। এই দীপ্ত অংশটুকুই আমরা খালি চোখে দেখতে পাই। বর্ণমণ্ডলের উপরিতল থেকে সদা উৎক্ষিপ্ত জলন্ত শিখা অঞ্চলকে ইংরাজিতে বলা হয় প্রমিনেন্স। এর বাইরে থাকা হালকা আগুনের অংশটিকে বলে করোনা। বর্ণমণ্ডলের তাপমাত্রা মোটামুটি ৬০০০ কেলভিন, সেখান থেকে সূর্যের অভ্যন্তরে

প্রবেশ করতে থাকলে ক্রমশ তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে এবং কেন্দ্রে এসে পৌঁছলে তা হবে প্রায় দুই কোটি কেলভিন। বর্ণমণ্ডলের তাপমাত্রাতেই যেকোনো পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে এবং সূর্যের অভ্যন্তর থেকে আসা শক্তির প্রভাবে উত্তেজিত পরমাণুর বিভিন্ন কক্ষে ইলেকট্রন স্থানান্তর এবং আয়নে পরিণত হওয়ার মতো ঘটনা নিরন্তর ঘটে চলে। সৌর বর্ণালিতে প্রাপ্ত ক্যালসিয়ামের রেখাগুলির উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছিলেন মেঘনাদ। সৌরচাকতি থেকে চোদ্দ হাজার কিলোমিটার ওপর পর্যন্ত প্রাপ্ত অঞ্চলের বর্ণালীতে ক্যালসিয়ামের আয়নিত অবস্থায় থাকার চিহ্ন স্পষ্ট, কিন্তু পাঁচ হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় উষ্ণতা বেশি হওয়া সত্ত্বেও সেখানে রয়েছে কেবলমাত্র অআয়নিত ক্যালসিয়াম পরমাণু। অথচ হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের বেলায় ভিন্ন চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ সৌরপরিবেশে সব পরমাণু সমানভাবে আয়নিত হয় না। তাপমাত্রার পাশাপাশি বিকিরণ চাপের এখানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

মেঘনাদ ধরে নিলেন বর্ণমণ্ডলের গঠন অনেকটা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মতো, তবে এখানে উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রা যে হারে হ্রাস পায় আঞ্চলিক চাপ তার চেয়ে অনেক দ্রুত হারে কমতে থাকে। এবার বর্ণমণ্ডলের বিভিন্ন তাপমাত্রায় মৌলদের আয়নিত পরমাণুর সংখ্যা হিসাব করলেন তিনি, দেখলেন চাপ হ্রাসের জন্যই কম তাপমাত্রাতেও ক্যালসিয়াম আয়নিত হতে পারে। আর এইভাবেই নক্ষত্রদের শ্রেণি ও ঔজ্জ্বল্য সংক্রান্ত বেশ কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন মেঘনাদ। বছর কয়েকের ব্যবধানে তাঁর গবেষণার সূত্র ধরেই নক্ষত্রের গঠনগত উপাদান সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ রহস্যের উন্মোচন ঘটিয়েছিলেন ২৫ বছরের তরুণী পদার্থবিদ সিসিলিয়া পায়েন (১৯০০-১৯৭৯)।

সাহার সমীকরণ প্রয়োগ করে বর্ণালীর তথ্য বিশ্লেষণের পর সিসিলিয়া দেখলেন নক্ষত্রের তাপমাত্রা যাই হোক না কেন প্রত্যেকের গঠনগত উপাদান মোটামুটি একই। নাক্ষত্রিক বর্ণালী বিশ্লেষণ করে সেখানে উপস্থিত মোটামুটি ১৫ টি মৌলিক উপাদানের আপেক্ষিক প্রাচুর্য গণনা করেছিলেন তিনি। তাঁর গবেষণা অনুযায়ী লিথিয়াম থেকে বেরিয়াম পর্যন্ত মৌলের পরিমাণ সব নক্ষত্রের ক্ষেত্রে একই রকম, আনুপাতিক দিক থেকে যা মোটামুটি পৃথিবীর মতোই, কিন্তু সেখানে হাইড্রোজেনের প্রাচুর্য পৃথিবীর তুলনায় দশ লক্ষ গুণ বেশি, আর হিলিয়ামের পরিমাণ বেশি কয়েক হাজার গুণ। অর্থাৎ সূর্য সহ মহাবিশ্বের যেকোনো নক্ষত্রের মোট ভরের সিংহভাগই হল হাইড্রোজেন। অর্থাৎ সিসিলিয়ার হাতে থাকা তথ্য অনুযায়ী এডিংটন সহ সমসাময়িক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনুমান একেবারে ভ্রান্ত। কিন্তু একজন পিএইচডি ছাত্রীর পক্ষে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীমহলের সম্মুখে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা সহজ কথা নয়। সিসিলিয়ার জোরের জায়গা বলতে শুধুমাত্র সাহা সমীকরণ, যা তথ্য বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করেছেন তিনি। পিএইচডি ডিগ্রির জন্য যে থিসিসটি লিখেছিলেন ১৯২৫ সাল নাগাদ সেটা Stellar Atmospheres নামে হার্ভার্ড অবজারভেটরি মনোগ্রাফ হিসাবে প্রকাশিত হয়। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর লেখা মনোগ্রাফটি ৬০০ কপির বেশি বিক্রি হয়েছিল। সিসিলিয়ার থিসিস পরীক্ষকদের একজন ছিলেন প্রিন্সটন অবজারভেটরির পরিচালক এবং 'পৃথিবী ও সূর্য একই উপাদানে তৈরি' এই ধারণার একজন শক্তিশালী প্রবক্তা হেনরি রাসেল, যিনি নক্ষত্রলোকে হাইড্রোজেনের প্রাচুর্যের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে কিছুতেই মানতে রাজি ছিলেন না। পরে অবশ্য সিসিলিয়াকে তাঁর আবিষ্কারের যোগ্য সম্মান জানাতে কার্পণ্য করেন নি রাসেল। যেহেতু হার্ভার্ডে তখনও মহিলাদের ডিগ্রি প্রদান করার প্রথা ছিল না, তাই র‍্যাডক্লিফ কলেজ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি পেয়েছিলেন সিসিলিয়া। এই ঘটনার প্রায় চল্লিশ বছর পর বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ অটো স্ট্রাভ Stellar Atmospheres কে "জ্যোতির্বিদ্যায় লেখা সবচেয়ে মেধাবী পিএইচডি থিসিস" বলে অভিহিত করেছিলেন।

১৯২৭ সালে বিজ্ঞান গবেষণার স্বীকৃতি হিসাবে মেঘনাদ লাভ করলেন রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ। ইঞ্জিনিয়ার ও জাহাজ নির্মাতা আর্দাশির কারশেতজী ওয়াদিয়া, গণিতজ্ঞ রামানুজন, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র ও সি ভি রামনদের মতো দিকপাল ব্যক্তির পর পঞ্চম ভারতীয় হিসাবে এই সম্মান পেয়েছিলেন তিনি। পরাধীন ভারতের একজন বিজ্ঞান সাধকের রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ লাভ করা এক বিরাট ঘটনা। বড়লাট স্বয়ং তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন, সঙ্গে গবেষণার জন্য অনুদান হিসাবে তিনশ পাউন্ড আর্থিক সহায়তা। এমনকি বেশ কয়েকবার নোবেল পুরষ্কারের জন্য তাঁর সপক্ষে মনোনয়নও জমা পড়েছিল। যদিও নোবেল পুরষ্কার তিনি পান নি। অবশ্য নোবেল না পেলেও বিজ্ঞানের জগতে তাঁর অবদান কিছু কম হয়ে যায় না।

তবে বিজ্ঞানী হিসাবে মেঘনাদের জীবনপথ খুব সহজ ছিল না, বিশেষত বিজ্ঞানচর্চার পাশাপাশি তাঁর সামাজিক, রাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ববোধ সেই পথটিকে আরও বন্ধুর করে তুলেছিল। সি ভি রামনের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য তো প্রায় সর্বজনবিদিত, এমনকি সহপাঠী সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গেও তৈরি হয়েছিল মানসিক ব্যবধান। একসময়ে (১৯৩০-১৯৩৮) কলকাতা ছেড়ে এলাহাবাদ চলে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। এখানে ফিরে পরমাণু কেন্দ্রক সম্পর্কিত পদার্থবিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করেন তিনি। এমনকি তাঁর উদ্যোগেই নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতবর্ষে প্রথম সাইক্লোট্রন যন্ত্র স্থাপনে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মেঘনাদ সাহা।

সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষ নামক দেশটিকে তখন গুছিয়ে নেওয়ার তোড়জোড় চলছে। মেঘনাদ অনুভব করলেন যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রটিতে চিন্তা ও উদ্দেশ্যের মধ্যে বিস্তর ফারাক থেকে যাচ্ছে সেইদিকে এবার নজর দেওয়া দরকার। সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দিলেন তিনি। ১৯৫১-র লোকসভা নির্বাচনে তিনি বাম সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হিসাবে কলকাতা উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র থেকে জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করে বিজয়ী হন। তবে বিজ্ঞানী হয়ে রাজনীতির

অলিন্দে পা রেখেছেন সমসাময়িক কালেই এমন উদাহরণ আরও পাওয়া যায়। বিশেষত মেঘনাদের পরিচিত দুই নোবেলজয়ী ইংরেজ বিজ্ঞানী ব্ল্যাকেট ও হিল ব্রিটেনের হাউস অফ কমনস-এ জয়ী হয়েছিলেন, তাছাড়া আমেরিকান বিজ্ঞানী গ্লেন সিবর্গ (ইনিও নোবেলজয়ী) ছিলেন সেনেটের সদস্য। নির্বাচিত জন প্রতিনিধি হিসাবে শিক্ষা, নদী পরিকল্পনা, শিল্পায়ন, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে লোকসভায় একাধিক বক্তব্য রেখেছিলেন মেঘনাদ সাহা। তবে সাংসদ হিসাবে নিজের মেয়াদকাল পূর্ণ করতে পারেন নি তিনি। সেদিন ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ সাল। প্ল্যানিং কমিশনের অফিসে যাওয়ার সময় রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে কয়েক পা হাঁটার পরই অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন মেঘনাদ। কাছেই ওয়েলিংটন হসপিটালে (রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতাল) দ্রুত নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। একরোখা অদম্য মানুষটি এবার জীবনের কাছে হার মানলেন।

জীবন থেমে গেলেও রয়ে যায় উত্তরাধিকার। আজও জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণায় মেঘনাদের আবিষ্কৃত তাপীয় আয়নীভবন তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়। এমনকি তাঁর স্বপ্নের নিউক্লিয় পদার্থবিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র (বর্তমান নাম সাহা ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স) বর্তমানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক গবেষণাগার। বিজ্ঞান সাধকরা তো এইভাবেই বেঁচে থাকেন!

তথ্যসূত্র

১) মেঘনাদ সাহা, গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়, খোয়াবনামা, ২০১৯
২) মেঘনাদ রচনা সংকলন, সম্পাদনা- শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৮৬
৩) অবিনাশ মেঘনাদ সাহা, অত্রি মুখোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ, ২০১২
৪) What Stars Are Made Of, Donovan Moor, Harvard University Press, 2020

অর্ধপরিবাহী হাব : একটি আশার আলো

তপন দাস

প্রাতঃভ্রমণ সেরে চৌরাস্তার মোড়ে চায়ের আড্ডার পরে বাড়ি ফেরা সুবিনয় বাবুদের রোজকার অভ্যেস। তবে বিষয়বস্তু ছাড়া অযথা আড্ডা দিতে তিনি নারাজ। এর মধ্যেই একদিন ফেসবুক নাড়াচাড়া করে জানলেন আমাদের দেশে নাকি বেশ কয়েকটা সেমিকনডাক্টর হাব তৈরি হচ্ছে। সারা বিশ্বের শিল্পপতিরাও নাকি সেমিকনডাক্টর নিয়ে নতুন নতুন প্রোজেক্টের পরিকল্পনা করছে। সেমিকনডাক্টর বাংলা পরিভাষায় অর্ধপরিবাহী। কিন্তু অর্ধপরিবাহী বিষয়টি কি? কোথায় কি কাজে ব্যবহার হয়, সেই ভাবে প্রায় কিছুই জানা নেই সুবিনয় বাবুর। আর মনে মনে ভাবছেন ছেলে উচ্চমাধ্যমিক পাশের পরে এরকম একটা বিষয় নিয়ে যদি পড়াশুনা করে তাহলে হয়তো কোথাও একটা কর্মসংস্থান হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে বিষয়টা নিয়ে একটু জেনে নিতে হবে। সেদিনের আড্ডায় ঋজুকে পেয়েই সুবিনয়দার অনেক প্রশ্ন। কিন্তু অর্ধপরিবাহী বোঝাতে গিয়ে, কোন জায়গা থেকে শুরু করবে সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলনা ঋজু। কিন্তু সুবিনয়দাকে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ হলেও জ্ঞান দিতেই হবে। ঋজু জানায় একদিনে কিন্তু সবটা বলতে পারবনা। দু'চারদিনে কিছু কথা তোমাকে শোনাবো।

তারপর বেশ কয়েকদিন তাঁদের এই নিয়েই চলে আলাপচারিতা। বাচ্চাদের খেলনা থেকে শুরু করে মোবাইল, ফ্রিজ, টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোটর গাড়ি, এমনকি এরোপ্ল্যান থেকে মহাকাশযান সব কিছুই চলে কোন না কোন চিপসের মাধ্যমে। আর অল্প কথায় বলতে গেলে সমস্ত চিপস বানাতে গিয়ে প্রয়োজন অর্ধপরিবাহীর। আমরা তিন ধরনের পদার্থের কথা জানি। কিছু পদার্থ তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম, কিছু পদার্থ তড়িৎ পরিবহন করতে পারে না। আবার কিছু আছে তারা এই দুইয়ের মাঝামাঝি। দুইয়ের মাঝামাঝি থাকা পদার্থগুলোই অর্ধপরিবাহী। সিলিকন, জার্মেনিয়াম, ক্যাডমিয়াম সালফাইড, গ্যালিয়াম আর্সেনাইড ইত্যাদি অর্ধপরিবাহী পদার্থের উদাহরণ। কোন পদার্থ কতটুকু তড়িৎ পরিবহন করতে সক্ষম তা তাদের আপেক্ষিক রোধের (Relative Resistance) মানের ওপর নির্ভর করে। যার আপেক্ষিক রোধ যত বেশি তার পরিবাহিতা তত কম। অর্ধপরিবাহী পদার্থের মধ্যে ইলেক্ট্রনগুলি বিভিন্ন শক্তি স্তরে (Power Structure) অবস্থান করে, যা শক্তি ব্যান্ডের (Power Band) আকারে থাকে। দুটি প্রধান ব্যান্ড হলো: ভ্যালেন্স ব্যান্ড (Valence Band) এবং কন্ডাকশন ব্যান্ড (Conduction Band)। ভ্যালেন্স ব্যান্ড এবং কন্ডাকশন ব্যান্ডের মধ্যে একটি শক্তি ব্যবধান থাকে, যা ব্যান্ড গ্যাপ (Band Gap) নামে পরিচিত। এই গ্যাপের কারণে ইলেক্ট্রনগুলি সহজে এক ব্যান্ড থেকে অন্য ব্যান্ডে যেতে পারে না। অর্ধপরিবাহী পদার্থের পরিবাহিতা ব্যান্ড গ্যাপের উপর নির্ভর করে। ব্যান্ড গ্যাপ যত কম, পদার্থের পরিবাহিতা তত বেশি হবে। তাপমাত্রা বাড়লে অর্ধপরিবাহীর পরিবাহিতা বাড়ে, কারণ উচ্চ তাপমাত্রায় ইলেক্ট্রনগুলি ব্যান্ড গ্যাপ অতিক্রম করে কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে পারে। অর্ধপরিবাহী পদার্থের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে অপদ্রব্য (Impurities) (যেমন ফসফরাস, আর্সেনিক) মেশানোর মাধ্যমে এর পরিবাহিতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যা ডোপিং (Doping) নামে পরিচিত।

আধুনিক যুগে প্রযুক্তির প্রভূত অগ্রগতির মূলে রয়েছে এই অর্ধপরিবাহী। কারণ এটি দিয়েই প্রথমে ডায়োড (এক প্রকারের ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ যা কারেন্টকে কেবলমাত্র একদিকে প্রবাহিত করতে দেয় যে বৈশিষ্ট্যটি AC থেকে DC কারেন্টে রূপান্তর এবং ইলেকট্রনিক সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহের দিক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ) এবং পরবর্তীতে ট্রানজিস্টর (ট্রানজিস্টর হলো একটি সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস যা বৈদ্যুতিক সংকেত বা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ এবং বাড়াতে (Amplify) ব্যবহৃত হয়, এটি আধুনিক ইলেক্ট্রনিক্স-এর একটি মৌলিক উপাদান) নির্মিত হয়। আর এদের হাত ধরেই যাত্রা শুরু হয় আধুনিক ইলেকট্রনিক্স যুগের। তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স প্রকৌশলে এর বিশাল ভূমিকা রয়েছে। অর্ধপরিবাহীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একে উত্তপ্ত করা হলে তড়িৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়। তাই উচ্চ তাপমাত্রায় এটি সুপরিবাহীর মত আচরণ করে। অথচ সুপরিবাহীকে উত্তপ্ত করলে তার পরিবাহিতা কমে যায়। এর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কোন বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সঙ্গে নির্দিষ্ট কোনো অপদ্রব্যের খুব সামান্য পরিমাণ (এক কোটি ভাগের এক ভাগ) যোগ করলে তার রোধ অনেকগুণ কমে যায়, ফলতই পরিবাহিতা বেড়ে যায় অনেকগুণ। এভাবে অপদ্রব্য মেশানোর প্রক্রিয়াকে বলে ডোপায়ন। এই ডোপায়নের মাধ্যমেই ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা হয়। তবে অপদ্রব্যের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে অর্ধপরিবাহী গুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। n-টাইপ এবং p-টাইপ অর্ধপরিবাহী। যেমন সিলিকন বা জার্মেনিয়ামের কেলাসে আর্সেনিক বা ফসফরাসের উপস্থিতিতে n-টাইপ অর্ধপরিবাহীর সৃষ্টি হয় অন্যদিকে সিলিকন বা জার্মেনিয়ামের কেলাসে বোরন বা অ্যালুমিনিয়াম মৌল ডোপিং করা হলে p-টাইপ অর্ধপরিবাহীর সৃষ্টি হয়। পর্যায়- সারণিতে সিলিকন বা জার্মেনিয়াম অবস্থান অনুযায়ী এরা চতুর্যোজী মৌল এবং আর্সেনিক বা ফসফরাস পঞ্চযোজী মৌল। ডোপিং-এ উপস্থিত এই অতিরিক্ত ইলেকট্রন পরিবাহী ইলেকট্রন রূপে কাজ করে। কিন্তু বোরন বা অ্যালুমিনিয়ামের বাইরের কক্ষে তিনটি ইলেকট্রন উপস্থিত থাকে এবং একটি ইলেকট্রনের অভাব থাকায় চতুর্থ বন্ধনটি গঠিত হয় না। সেক্ষেত্রে একটি গর্তের সৃষ্টি হয়। এইরকম কেলাসে উপযুক্ত তড়িৎক্ষেত্র প্রয়োগ করলে গর্তগুলি কেলাসের মধ্য দিয়ে স্থানান্তরিত হয়ে তড়িৎ পরিবহন করে। এই প্রকার অর্ধপরিবাহীকে p-টাইপ অর্ধপরিবাহী বলে।

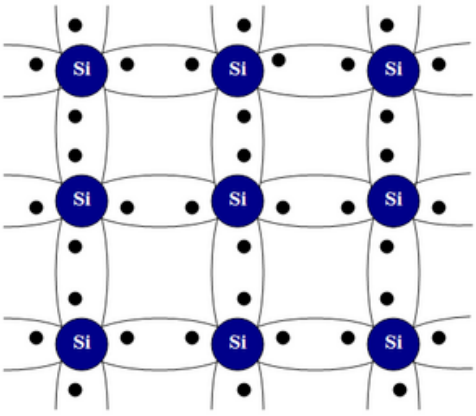

সিলিকন পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ স্তরে ইলেকট্রনের সমযোজী বন্ধন। ছোট বিন্দুগুলো ইলেকট্রন, বড় বৃত্তগুলো পরমাণুর কেন্দ্র এবং বাঁকা রেখাগুলো দ্বারা বন্ধন বোঝানো হয়েছে

পরিবাহী পদার্থের সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে একটি, দুটি বা সর্বোচ্চ তিনটি ইলেকট্রন থাকে। বহিঃস্তরের এই ইলেকট্রনগুলো পরমাণু কেন্দ্রের সাথে বেশ দুর্বলভাবে সংযুক্ত থাকে। এই সর্ববহিঃস্থ তথা যোজন স্তরের ইলেকট্রনগুলো অন্য পরমাণুর অসম্পূর্ণ কক্ষপথ পূর্ণ করার জন্য নিজ পরমাণু ছেড়ে চলে যায়। এভাবে আয়নীয় বন্ধন গঠিত হয়। এই কৌশলকে অবলম্বন করেই পরিবাহীর অভ্যন্তরের ইলেকট্রনগুলো এক পরমাণু থেকে আরেক পরমাণুতে ভ্রমণ করতে পারে। আর এ কারণেই এদের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, ইলেকট্রনের প্রবাহই তো আসলে বিদ্যুৎ। মূলত যোজন ইলেকট্রনের স্বাধীন চলাচলেই পরিবহন ঘটে। কিন্তু অপরিবাহী পদার্থের সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তর ইলেকট্রন দ্বারা প্রায় পূর্ণ থাকে। উল্লেখ্য, বহিঃস্থ স্তরে আটটি ইলেকট্রন থাকলে তা সুস্থিতি লাভ করে; আর অপরিবাহীতে আটটি বা এর কাছাকাছি সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে। তাই এদের যোজন ইলেকট্রন পরিবহনে অংশ নিতে পারেনা, তারা নিজ নিজ পরমাণুতে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে।

অপরদিকে অর্ধপরিবাহী পদার্থ যেমন জার্মেনিয়াম বা সিলিকন পরমাণুর বাইরের কক্ষে চারটি ইলেকট্রন থাকে। আটটি পূর্ণ করতে হলে তার প্রয়োজন আরও চারটি ইলেকট্রন। তারা বাকি চারটি ইলেকট্রন অর্জন করে আশেপাশের অন্য পরমাণু থেকে। তবে পাশের পরমাণু তাদের ইলেকট্রন একেবারে দিয়ে দেয়না বরং ভাগাভাগি করে। একে অপরের চারটি করে পরমাণু ভাগাভাগি করে। ফলে দু'জনেই বহিঃস্থ কক্ষে আটটি করে ইলেকট্রন পায় এবং স্থিতি অর্জন করে। এভাবে তাদের মধ্যে যে বন্ধনের সৃষ্টি হয় তাকে বলে সমযোজী বন্ধন। উল্লেখ্য কিছু পরিবাহী বা অপরিবাহীও সমযোজী বন্ধন তৈরি করতে পারে। এভাবে সমযোজী বন্ধন গঠনের মাধ্যমে জার্মেনিয়াম বা সিলিকন বিশুদ্ধ কেলাস তৈরি করে যাকে কঠিন অবস্থায় পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় অন্তর্জাত (intrinsic) কেলাস বলা হয়। এগুলোতে কোন মুক্ত ইলেকট্রন থাকেনা তাই স্বাভাবিক অবস্থায় এরা কোনো তড়িৎ পরিবহন করেনা। এ ধরনের বিশুদ্ধ কেলাসের তাপমাত্রা বাড়ালে কিছু কিছু সমযোজী বন্ধন ভেঙে যায় এবং গুটিকতক মুক্ত ইলেকট্রনের সৃষ্টি হয়। এভাবেই উচ্চ তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহী পদার্থ সাধারণ পরিবাহীর মত আচরণ করে।

ঋজুর কথায় উঠে আসে পদার্থ বিদ্যায় নোবেল জয়ীদের তালিকায় দেখা যায় বেশির ভাগ নোবেলজয়ীই তাত্ত্বিক পর্দাথবিদ। কিন্তু ২০০০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে যৌথভাবে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন একজন মার্কিন তড়িৎ প্রকৌশলী জ্যাক সেন্ট ক্লেয়ার কিলবি। সারাবিশ্বে ইলেকট্রনিক্স জগৎকে নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছেন জ্যাক সেন্ট ক্লেয়ার কিলবি এবং রবার্ট নয়েস। শুরুটা হয়েছিল ১৯০৪ সালে জন এমব্রোস ফ্লেমিং এর ডায়োড ভাল্ব আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। প্রাথমিক উদ্দেশ্য রেডিও সঙ্কেত সনাক্তকরন থাকলেও ধীরে ধীরে এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পরে অনেক ইলেকট্রনিক যন্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে। তারপর চলতে থাকে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নানা বিবর্তন। তারপর আসে ট্রানজিস্টর (Transistor)।

ট্রানজিস্টার তিন প্রান্ত বিশিষ্ট একটি অর্ধপরিবাহী যন্ত্র, যা সাধারণত অ্যামপ্লিফায়ার এবং বৈদ্যুতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত সুইচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটার, সেলুলার ফোন এবং অন্য সকল আধুনিক ইলেকট্রনিক্সের মূল গাঠনিক উপাদান হিসেবে ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা। ১৯৪৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর বেল ল্যাবরেটরির উইলিয়াম শকলি, জন বার্ডিন এবং ওয়াল্টার ব্রাটেইন পৃথিবীর প্রথম ব্যবহারিক পয়েন্ট-কন্টাক্ট ট্রানজিস্টর তৈরি করতে সক্ষম হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালে মানুষের চাহিদার উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানের অনেক দিকের অগ্রগতি ঘটেছে। গজিয়ে উঠেছে বেশ কিছু শিল্প সংস্থা এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। সেইরকমই একটি প্রতিষ্ঠান টেক্সাস ইনসট্রুমেন্টস। ১৯৫৮ সালে সেখানে যোগদান করেন কিলবি। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর মাথায় আসে এক অভিনব চিন্তা। কীভাবে এক চিলতে অর্ধপরিবাহীর মধ্যে ইলেকট্রনিকের বিভিন্ন উপাদান যেমন ধারক, রোধক, ট্রানজিস্টার ইত্যাদিকে একসঙ্গে স্থাপন করা যায়। যেমন ভাবা তেমন কাজ। অল্প সময়ের মধ্যেই কিলবি তাঁর নকশা প্রকাশ করেন। জার্মেনিয়াম ভিত্তিক অর্ধপরিবাহীর উপর ডাক টিকিট সাইজের বিশেষ বর্তনির উদ্ভাবন করেন। অন্যদিকে প্রায় সমসাময়িক সময়ে ফেয়ারচাইল্ড সেমিকন্ডাক্টর কর্পোরেশনের বিজ্ঞানী রবার্ট নয়েস-ও প্রায় একই রকম একটি যন্ত্রাংশের উদ্ভাবন করেন । বলা চলে এই দুই বিজ্ঞানীর হাত ধরেই চিপস (Chips) বা মাইক্রো চিপসের (Microchips) নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

সুবিনয়দার বিজ্ঞান বিষয়ে অল্প বিস্তর পড়াশুনা থাকায় ঋজুর সহজ সরল ভাষায় অর্ধপরিবাহী বিষয়টি বোঝাতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করে কর্ম সংস্থানের কিভাবে সুযোগ রয়েছে তা আরেকটু খতিয়ে দেখতে হবে। বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসে ব্যবহৃত চিপস তৈরির দিকে জোর দিয়েছে ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ থেকে শুরু করে শিল্পপতিরা। চিপ ডিজাইনে ভারতের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে, নতুন অনুমোদিত ইউনিটগুলি চিপ তৈরির ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশীয় প্যাকেজিং প্রযুক্তির অগ্রগতিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রস্তুত। এই উদ্যোগটি অসংখ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। চিপ ডিজাইন থেকে শুরু উৎপাদন সবটাই যদি দেশীয় প্রযুক্তিতে করা সম্ভব হয়ে ওঠে তাহলে অনেকাংশেই উপকৃত হবে ভারতের শিল্প মহল। ভারতে মোটরগাড়ি, ইলেকট্রনিক্স এবং টেলিকমের মতো নিম্নগামী শিল্পগুলিতে চাকরির সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করবে । বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ২০২৬ সালের মধ্যে ভারত টেস্টিং, ইঞ্জিনিয়ারিং, সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, সিস্টেম সার্কিট, ভ্যালিডেশন এবং অপারেশন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে বেশ কিছু কর্মসংস্থান তৈরি করবে । এই সম্প্রসারণ ভারতের প্রযুক্তিগত ভূদৃশ্যকে শক্তিশালী করার এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি দেয়। সেমিকন ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম একটি শক্তিশালী সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের দিকে ভারতের অগ্রগতিকে আরও শক্তিশালী করেছে। সিলিকন সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব, ডিসপ্লে ফ্যাব, কম্পাউন্ড সেমিকন্ডাক্টর, সিলিকন ফোটোনিক্স, সেন্সর ফ্যাব, সেমিকন্ডাক্টর প্যাকেজিং এবং ডিজাইনে নিযুক্ত কোম্পানিগুলিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সরকার ৭৬০ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করছে । এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম এবং ভারতে টেলিকম প্রবৃদ্ধিকে শক্তিশালী করা।

বাজারে গিয়ে আমরা যেকোনো ইলেক্ট্রনিক জিনিসের দুটো ধরন দেখতে পাই। কতগুলো বাইরের দেশ থেকে বিশেষ করে চিন থেকে আমদানিকৃত জিনিস, পাশাপাশি রয়েছে নিজের দেশের তৈরি। দোকানদার চিনা প্রোডাক্টের কোন গ্যারান্টি দিচ্ছেন না কিন্তু দাম কম নিচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ ঝুঁকে আছেন সেই দিকেই। গ্যারান্টি সহ দেশীয় উৎপাদনের দাম বেশি হওয়ার পেছনে একটি অন্যতম কারণ অপর্যাপ্ত চিপসের যোগান। হয়ত এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে অচিরেই। সেমিকন্ডাক্টর হাবগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে যোগান দিতে পারলে তাকিয়ে থাকতে হবে না বিদেশি প্রকৌশলীদের উপরে। আমাদের দেশও আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সফলতাও পাবে বলে আশা করা যায়। এই আলোচনা শেষে আশার আলো দেখছেন সুবিনয়দাও।

ইন্দ্রপতন

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

সৃষ্টিতত্ত্ববিদ, গণিতজ্ঞ, ভালো মানুষ, বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে নিরলস জে ভি এন চলে গেলেন। পিতা বিষ্ণু বাসুদেব নারলিকর গণিতজ্ঞ। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের শিক্ষক ছিলেন। মাতা সুমতি নারলিকর সংস্কৃত পণ্ডিত। এমন একটি আবহে ১৯৩৮ সালের ১৯ জুলাই মহারাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকর সংক্ষেপে জে ভি এন।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন, তারপর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। ম্যাথামেটিক্যাল ট্রাইপসে টাইসন মেডেল প্রাপ্ত হন। গণিতের অসাধারণ ব্যুৎপত্তির জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ফ্রেড হয়েল, একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, তাঁর সঙ্গে ষাটের দশকে যৌথভাবে হয়েল-নারলিকার তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই তত্ত্ব জনপ্রিয় 'বিগব্যাং' তত্ত্বকে

প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড় করাল। আলবার্ট আইনস্টাইন, আর্নেস্ট ম্যাকের তত্ত্বকে প্রায় এক জায়গায় দাঁড় করাল। ফ্রেড হয়েলের কাছেই জে ভি এনের পিএইচ-ডি। মাত্র ২৬ বছর বয়সে পেলেন পদ্মভূষণ।

১৯৭২ সালে জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকর ভারতে ফিরে আসেন। টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (টি আই এফ আর)-এ যোগ দেন। ছাত্র বৎসল নারলিকর খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব নিয়ে তাঁর গবেষণা তাঁকে ভারতের সৃষ্টিতত্ত্বের অন্যতম পথ প্রদর্শক পরিচয় দান করে। পারিবারিক সূত্রে পাওয়া জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য নারলিকর বহন করে গেছেন। সৃষ্টিতত্ত্বের পর তিনি উৎসাহিত হয়েছিলেন পৃথিবীর বাইরে থেকে প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল কিনা তা জানার জন্য। সিংহলের বিজ্ঞানী চন্দ্র বিক্রমাসিংহের সঙ্গে তাঁর তত্ত্ব পরবর্তীকালে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়।

জে ভি নারলিকর

তাঁর বিস্তৃত কর্মজীবনে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। ভারতে আন্তর্জাতিক মানের জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোর্তিপদার্থবিদ্যার গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে তাঁর অবদান এবং অগ্রণী ভূমিকার কথা দেশ মনে রাখবে। টি আই এফ আর-এ তাঁর কর্মজীবনের মাঝে পুনেতে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় ইন্টার ইউনিভার্সিটি সেন্টার অফ অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স (IUCAA)-এর। ১৯৮৮ সালে জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকরের নেতৃত্বেই IUCAA কাজ শুরু করে। বর্তমানে এটি একটি প্রথম সারির গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণা নয়, বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। মারাঠি ভাষায় সবার জন্য বিজ্ঞানের প্রবন্ধ লিখেছেন। ইংরেজিতে লেখা অসংখ্য জনপ্রিয় প্রবন্ধ, বিজ্ঞানের বই তাঁর মত মানুষের মাটির কাছাকাছি থাকার প্রচেষ্টাকে পরিস্ফুট করে। ছোটদের জন্যে মজা করে গণিত শেখার বই লিখেছেন স্ত্রীর সঙ্গে। মনে আছে, DREAM-2047এর একটি সংখ্যায় তাঁর একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হল 'Why Study Astronomy?' লেখাটি যাতে সব ছোট ছেলেমেয়েরা বাংলায় পড়তে পারে তাই অনুবাদ করার অনুমতির জন্য একটা চিঠি লিখলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই উত্তর পেয়েছিলাম। লিখেছিলেন আমাকে একটা কপি পাঠিও। এর আগেও যখনই ব্যক্তিগত কোনো কাজে আটকে গেছি চিঠি লিখেছি এবং তাড়াতাড়ি উত্তর পেয়েছি। বুঝেছি এই মানুষটি অন্যরকম।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে সম্মানিত। পদ্মভূষণ পেয়েছেন ১৯৬৫ সালে। ২০০৪ সালে পদ্মবিভূষণ। মহারাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার মহারাষ্ট্র ভূষণে সম্মানিত হয়েছেন। পেয়েছেন কলিঙ্গ পুরস্কার। মারাঠি ভাষায় আত্মজীবনী সাহিত্য পেয়েছে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার। শান্তি-স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৭৮ সালে।

তাঁর লেখা কয়েকটি গ্রন্থ—

* The Structure of the Universe (1977)
* Physics-Astronomy Frontier (with Sir Fred Hoyle)
* The Lighter Side or Gravity
* Philosophy of Science : Perspectives from Natural and Social Science
* Quasars and Active Galactic Nuclei : An Introduction
* An Introduction to Cosmology
* Fred Hoyle's Universe
* Current Issues in Cosmology

এছাড়া অনেক গ্রন্থ আছে যাদের নাম গ্রথিত হল না।

ইংরাজিতে FICTION লিখেছেন। সহজে বিজ্ঞানের জটিলতাকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। এমনই তিনটি বই :

The Return of Vaman
The Adventure
The Comet

তিন কন্যাও বিজ্ঞানী। ৮৭ বছর বয়সে ঘুমের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। ২১ মে ২০২৫। ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক ইন্দ্রপতন।

শোকজ্ঞাপন

- পাহেলগাঁও গণহত্যা, সামসেরগঞ্জ দাঙ্গা
- ছত্তিশগড়ের সাংবাদিক মুকেশ চন্দ্রাকর সহ সাংবাদিক হত্যা
- দিল্লি, কুম্ভমেলা, ব্যঙ্গালুরুতে পদপৃষ্টে হতাহতদের প্রতি
- রাশিয়া-ইউক্রেন, ইজরায়েল-হামাস-হিজবুল্লাহ-হুথি, ভারত-পাকিস্তান, ইজরায়েল-ইরান-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ডি আর সি-রুয়াণ্ডা, দ্রুজ-বেদুইন-ইজরায়েল ও কম্বোডিয়া-তাইল্যান্ড যুদ্ধে এবং কঙ্গো, সুদান, সাউথ সুদান, সিরিয়া, বালুচিস্তান, মায়ানমার, বাংলাদেশ, তুরস্ক, ভারতের মণিপুর, দণ্ডকারণ্য ও কাশ্মীরের গৃহযুদ্ধে হতাহত সাধারণ মানুষের প্রতি
- মায়ানমার, তুরস্ক, আফগানিস্তান, রাশিয়া, জাপানের ভূমিকম্পে হতাহতদের প্রতি
- আহমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় নিহত যাত্রী, ক্রু, হোস্টেলবাসী ও অন্যদের প্রতি

অর্ধেক আকাশ

সাংস্কৃতিক সেনাপতি সনজীদা খাতুন ও ছায়ানট

সুমনা সেনগুপ্ত

দুই বাংলার রুদ্ধশ্বাস পরিবেশের মধ্যে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী, পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক, বাংলা সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম সেনাপতি এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 'ছায়ানট' সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রাণভোমরা ডঃ সনজীদা খাতুন চলে গেলেন জাতির অভিভাবকের পদ ছেড়ে।

সনজীদা খাতুন

জন্ম ১৯৩৩-এ। পিতা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের প্রাণপুরুষ কাজী মোতাহার হোসেন। ঢাকার গৃহে মুক্ত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে রবীন্দ্র ও নজরুল সঙ্গীত শিক্ষা ও চর্চা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক, অন্য দিকে ঢাকা রেডিওর প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। ১৯৫৪-তে শান্তিনিকেতনে স্নাতকোত্তর পড়তে যান। তার সঙ্গে গান শেখা। শৈলজারঞ্জনের কাছে গান শিখেছেন। শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন প্রমুখ দিকপাল শিল্পীদের সাহচর্যে আসেন। ১৯৫৭-তে ঢাকায় ফিরে ইডেন মহিলা কলেজ ও কারমাইকেল কলেজে বাংলা সাহিত্য নিয়ে অধ্যাপনা করেন। এর সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা। 'গীতালি' সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ওহিদুল হকের সঙ্গে।

রমনা বটমূলে ছায়ানটের পহেলা বৈশাখ

সেই সময় পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাংস্কৃতির উপর দমন চালিয়ে উর্দু চাপিয়ে দিচ্ছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করেছিল। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দুর্জয় আন্দোলনের তিনি ছিলেন এক মুখর সেনানী। বিভিন্ন জায়গায় রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে তিনি এর প্রতিবাদ করেছিলেন। বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে, আরও ছড়িয়ে দিতে, অসাম্প্রদায়িক সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে বিশিষ্ট কবি ও জাতীয়তাবাদী নেত্রী সুফিয়া কামাল, ফারিদা হাসান, সায়েরা মহিউদ্দীন, মোকলেশুর রহমান, আমেদুর রহমান, ওহিদুল হক এবং সনজীদা খাতুন ১৯৫১-তে 'ছায়ানট' সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে তোলেন। অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, অনুশীলন, প্রতিযোগিতা ও উদ্‌যাপনের পাশাপাশি তাঁরা প্রতি বছর পয়লা বৈশাখে রমনা বটমূলে সঙ্গীতানুষ্ঠান আয়োজন করেন যা আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও স্বীকৃতি অর্জন করে।

১৯৭১ বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সমর্থনে তিনি সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে যুদ্ধের মধ্যে রংপুর থেকে ঢাকা যাত্রা করেন। সাভারের জিরাব গ্রামে অবস্থান করেন। পরে কুমিল্লা দিয়ে আগরতলায় পৌঁছন। সেখান থেকে কলকাতায় এসে শিল্পী ও কলাকুশলীদের সংগঠিত করে প্রতিষ্ঠা করেন 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'। স্বাধীন বাংলাদেশেও 'ছায়ানট'কে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। গড়ে তোলেন সঙ্গীত ও পারফর্মিং আর্টস এর বিভিন্ন শাখা নিয়ে চর্চা, গবেষণা, শিক্ষা কেন্দ্র, শিখর কর্মসূচি। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও বৃদ্ধদের নিয়েও কাজ করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও মৌলবাদী আক্রমণেও অটল ছিলেন। তাই ২০২১-এ মৌলবাদীরা 'ছায়ানটে'র অনুষ্ঠানে গ্রেনেড ছুঁড়ে ১০ জনকে হত্যা করলেও 'ছায়ানট' থামেনি। এবারও মৌলবাদী ফতোয়ার মধ্যেও যথাবিধি তাঁদের কর্মসূচী পালন করেছেন এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে সলিল চৌধুরির 'ও আলোর পথযাত্রী' ও রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' গেয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেছেন।

দুই দেশেই সনজীদা খাতুন আকাদেমি, একুশে, পদ্মশ্রী, দেশিকোত্তম সহ বহু সম্মাননা পেয়েছেন। রেখে গেছেন এক অসাধারণ পরম্পরার সঙ্গে ১৬টি রচিত মূল্যবান গ্রন্থ।

কৃতজ্ঞতা: সমীর ও মায়া সেনগুপ্ত

ধর্ষণ : মানসিক নয় সামাজিক ব্যাধি

মোহিত রণদীপ*

ধর্ষক কি মঙ্গল গ্রহ থেকে আসা জীব? হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে পাশের বাড়ির ছেলেটা ধর্ষক হয়ে গেল? এই প্রশ্নেরই উত্তর খুব সংক্ষেপে আমরা একটু খুঁজতে চেষ্টা করি।

ছেলেটির বাড়ি উত্তর ভারতের এক অজ গাঁয়ে। বেশ কয়েকটি ভাইবোন তারা। থাকে মায়ের সঙ্গে। বাবা গুরুতর মানসিক রোগী। স্কিৎজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত। মা লোকের বাড়ি কাজ করে সংসার চালান। কোনও দিন খাবার জোটে, কোনও দিন জোটে না। সাত কি আট বছর যখন বয়স, ছেলেটি ঘর ছাড়ে। লেখাপড়ার সুযোগ, শিক্ষিত হয়ে ওঠার সুযোগ, দু'বেলা খাবারের নিশ্চয়তা, সামাজিক নিরাপত্তা, আত্মসম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার কিছুই ছিল না তার।

ঘর ছেড়ে যাওয়া সেই ছেলেটির সন্ধান যখন পেলেন তার মা, পুলিশের মাধ্যমে; তার কিছু দিন আগে দিল্লিতে ঘটে যাওয়া চলন্ত

বাসে ধর্ষণ ও খুনের নৃশংস অপরাধটির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে তার নাম।

ধর্ষক সমাজেরই কেউ

ওপরের এই বঞ্চনা আর দারিদ্রের কথা বলে তার অপরাধকে যুক্তিগ্রাহ্যতা দেওয়া এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। যে নৃশংস অপরাধের সঙ্গে সেই ছেলেটির নাম জড়িয়েছে, তা এক কথায় মর্মান্তিক। এর জন্য আইন অনুযায়ী যা হওয়ার তা হবেই। কিন্তু, এই ঘটনা এক মাত্র ঘটনা নয়। একের পর এক ঘটে চলেছে আমাদের রাজ্যেও পার্ক স্ট্রিট, কাটোয়া, হাঁসখালি, কামদুনি, গাইঘাটা, বরাহনগর, কুশমণ্ডি, কৃষ্ণনগর, খরজুনা, ধূপগুড়ি, আরজিকর, বর্ধমান, কসবা...

অপরাধী কখনও ওপরের ছেলেটির মতোই কেউ, কখনও চেনা বা অচেনা কোনও প্রাপ্তবয়স্ক। কখনও পিছিয়ে থাকা আর্থসামাজিক বৃত্তের কেউ, আবার কখনও সমাজের ওপরতলায় তার বসবাস। কখনও পেশাগত কিংবা সম্প্রদায়গত বা দলীয় ক্ষমতায় বলীয়ান, কখনও আবার আপাত নিরীহ নিতান্ত ছাপোষা কেউ।

একটু ভেবে দেখা প্রয়োজন, কী সেই নেপথ্য কারণ, যা ওদের মধ্যে 'আপাত নিরীহ নিতান্ত ছাপোষা' মানুষটিকেও আগ্রাসী ধর্ষক করে তোলে। এ কি কোনও মনের অসুস্থতা। না অসুস্থ মানসিকতা? নাকি, এর বীজ নিহিত অন্য কোনওখানে।

মনের অসুখ না অসুস্থ মানসিকতা

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে ধর্ষণ কোনও মনোরোগের লক্ষণ বা পরিণতি হিসেবে চিহ্নিত হয় না। মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত কোনও ব্যক্তি ধর্ষক রূপে অভিযুক্ত হয়েছেন- এমনটা সচরাচর শোনা যায় না। যদি একটি বা দুটি ঘটনা ঘটেও থাকে, তা সামগ্রিকতার নিরিখে বিচ্ছিন্ন বা ব্যতিক্রম-ই। বরং, আমরা ধর্ষণের ক্ষেত্রে মনের অসুস্থতা নয়, অসুস্থ মানসিকতার প্রকাশ হিসেবেই গণ্য করতে চাইব। যে অসুস্থ মানসিকতার বীজ নিহিত থাকে- বিপন্ন-বিধ্বস্ত শৈশব অভিজ্ঞতায়, পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, আধিপত্যের বাতাবরণে বড় হয়ে ওঠায়। প্রশাসনিক অপদার্থতার কারণে, অপরাধ করেও 'ঠিক পার পেয়ে যাব'- এই বেপরোয়া মনোভাবে। শাসক (তা সে যে দলেরই হোক না কেন) তথা প্রভাবশালী দলের কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও পরোক্ষ প্রশ্রয়ের মধ্যে, মাদকের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া মানবিক বোধে, কোনও সশস্ত্র বাহিনী বা সম্প্রদায় বা দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার (সহজ) লক্ষ্য বেছে নেওয়ায়। সংঘবদ্ধ অপরাধ প্রবণতায়। এর সঙ্গে রয়েছে ব্লু-ফিল্ম, রেপ গেমের সহজলভ্যতা। অবৈধ সিডির অবাধ ব্যবসা আর ইন্টারনেটে অবাধ ডাউনলোডের দৌলতে খুব সহজেই তা পৌঁছে যায় স্কুল পড়ুয়াদের হাতের মুঠোয়।

বন্ধ হয়ে গিয়েছে খেলাধুলোর চল। সৃজনশীল কিংবা গঠনমূলক কাজের মধ্যে থাকা ছেলেরা আজ বিরল।

বরং, সামগ্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অবক্ষয়ের, আদর্শহীনতার ছবিটাই সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে আজ আমাদের সামনে।

এই সামগ্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অবক্ষয় কি হঠাৎ করেই। নাকি এরও নেপথ্যে হয়েছে দীর্ঘ প্রেক্ষাপট। প্রায় একযুগ আগে, রাজ্যের পটবদলের আগের পর্বেও ঘটেছে মরিচঝাঁপি, বানতলা, গাইঘাটা, বারাসত, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম। পরিববর্তনের পরেও বগটুই, সন্দেশখালি, সামসেরগঞ্জ সহ সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। বরং, বেড়েছে নারীদের ওপর যৌন আক্রমণের মাত্রা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শাসকের কণ্ঠে শোনা গিয়েছে, 'এ রকম তো কতই হয়', 'সব সাজানো', 'বিরোধীদের চক্রান্ত', 'সামান্য ঘটনা', 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা'। সেই এক ভাষা, সেই একই কণ্ঠস্বর। কোনও পরিবর্তন ঘটেনি শাসকের প্রতিক্রিয়ায়। আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ঘটনায় শাসকের ভূমিকা অতীতের সমস্ত 'রেকর্ড' ম্লান করে দিয়ে স্পষ্টতই হন্তারক ও ধর্ষকের পক্ষ নিল।

ওষুধ সমাজ-রাজনীতিতে

ধর্ষণের বীজ ঢুকে রয়েছে অসুখে। তবে সে অসুখ মানসিক অসুস্থতায় নয়। অসুস্থ মানসিকতায়। সেই বীজ নিহিত রয়েছে আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক বাস্তবতায়। যার চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। জরুরি ভিত্তিতে। সেই সদিচ্ছা কি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর রয়েছে? সংশয় হয়। কারণ, এর জন্য প্রয়োজন আন্তরিকতা, দীর্ঘ পরিকল্পনা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থা। অপরাধকে প্রশ্রয় না দেওয়ার মানসিকতা। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমাদের রাজ্যে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই তা চোখে পড়ে না। ভোটের সময় অপরাধ এবং অপরাধী দু'টোই অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

ফিরে আসি উত্তর ভারতের সেই ঘর ছেড়ে যাওয়া ছেলেটির কথায়। অজ গাঁয়ের সেই ছেলেটির 'ধর্ষক' হয়ে ওঠার জন্য কি শুধু সেই ছেলেটিই এক মাত্র দায়ী। তার তো এ রকম হওয়ার কথা ছিল না। সাত-আট বছরের ছেলেটির আত্মসম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার ছিল। শিক্ষা-খেলাধুলোর মধ্যে দিয়ে বিকশিত হওয়ারও সুযোগ ছিল। সমস্ত রকম অবহেলা-বৈষম্য-নির্যাতনের হাত থেকে সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্র তার দায়বদ্ধতার কথা ঘোষণা করেছিল ১৯৮৯-এ রাষ্ট্রসংঘের শিশু অধিকার সনদে। ওই শিশুটি কেন পেল না সেই সব অধিকার। কোন সামাজিক বাতাবরণে ওই শিশু হয়ে উঠল ধর্ষক। অপরাধী। এর দায় কার? কোন অজ্ঞাত কারণে ধর্ষক হয়ে ওঠার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বুনিয়াদটি স্বাধীনতার এত বছর পরেও টিকে রয়েছে। এই প্রশ্নে জবাবদিহির দায় আমাদের সবার ওপরেই বর্তায় এই বিষয়ে কোনও সংশয় নেই, তবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায় বিশেষ ভাবে বর্তায় রাষ্ট্রের ওপরেই।

সংবিধানে ঘোষিত, 'সার্বভৌম', 'সমাজতান্ত্রিক', 'ধর্মনিরপেক্ষ', 'গণতান্ত্রিক', 'সাধারণতন্ত্র' শব্দগুলো আলেয়া বলেই মনে হয় এখন।

*(লেখক : মনঃসমাজকর্মী)

উন্নয়ন প্রসঙ্গে

চা শিল্পে জমি, মজুরি ও মর্যাদার সঙ্কট

অভিজিৎ মজুমদার*

১৮৪০ সালে ডাঃ আর্চিবল্ড ক্যাম্পবেল দার্জিলিংয়ের স্যানিটোরিয়ামের প্রথম সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে যোগ দিলেন। এরপর পেশায় চিকিৎসক ও বোটানিস্ট এই মানুষটি নিজের উদ্যোগে কুমায়ুনের পাহাড়ি ক্ষেত্র থেকে চা গাছ এনে দার্জিলিং পাহাড়ে পরীক্ষামূলকভাবে চা-আবাদ শুরু করেন। ক্রমে ১৮৫৬ সাল থেকে পাহাড়ে টাকভার, হোপ টাউন, আলুবাড়ি, ধুতেরিয়া, গিং, আম্বুটিয়া, তাকদা, বাদামতাম, ফুবশেরিং এবং সমতলে নিউ চাম্পটা, সুকনা, দাগাপুর, মোহরগাঁ-গুলমা প্রভৃতি চা-বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং দার্জিলিং জেলায় বিগত ১৬৯ বছর ধরে চা-আবাদ চলছে। ডুয়ার্সের কিছু বাগান আরও বেশি দিন ধরে চা তৈরি করছে। ভারতে দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমনিবিড়, কৃষিভিত্তিক এই সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা আজও আইনসম্মত ন্যূনতম মজুরি থেকে বঞ্চিত। বিশাল অঙ্কের বিদেশী মুদ্রা আনয়নকারী এই শিল্পে মালিক-কর্তৃপক্ষ পুঁজির পাহাড় গড়লেও, তার কিয়দংশও অর্ধভুক্ত অথচ কঠিন পরিশ্রমী চা-শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ব্যবহৃত হয় না। বরং ২০১৪ থেকে গত ৮ বছর চা-শিল্পে ন্যূনতম মজুরি কাঠামো ঘোষণা, নিত্যব্যবহার্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির নিরিখে মজুরি বৃদ্ধি আর বাস্তুজমির পাট্টা-পর্চার দাবিতে উত্তাল গণআন্দোলন মালিক সংগঠন সিসিপিএ (কনসাল্টেটিভ কমিটি অব প্ল্যান্টারস্ অ্যাসোসিয়েশন)-এর সঙ্গে রাজ্য সরকারের আঁটঘাটে দাবি আদায় করতে সমর্থ হয়নি।

দার্জিলিঙের একটি চা বাগান

মুখ ঢেকে যায়...

গত ১৫ জুন ২০২২ বাণিজ্য বিষয়ক সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি তাদের ১৭১তম রিপোর্ট হাজির করেছে লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদদের সামনে। রিপোর্টটির শিরোনাম 'Issues Affecting Indian Tea Industry Specially in Darjeeling Region'।

রিপোর্টটি

শুরু হয়েছে এই কথা বলে যে, ভারতে চায়ের আবাদ ১৭০ বছরের পুরোনো এবং পৃথিবীর চায়ের মানচিত্রে ভারত হ'ল দ্বিতীয় বৃহত্তম চা উৎপাদনকারী দেশ। চা শিল্পে বাণিজ্য ও শ্রমিকদের সাম্প্রতিকতম সংকট কাটিয়ে উঠতে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে এই স্ট্যান্ডিং কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের সমক্ষে কিছু পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ পেশ করেছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে-

(১) প্রতিবেশী দেশ নেপাল থেকে নিম্নমানের চা-পাতার সীমান্ত পেরিয়ে অবাধে ভারতীয় বাজারে অনুপ্রবেশ ঘটছে। ভারতে প্রবেশ করার পর এই নেপালে প্রস্তুত চা ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে ও বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে খাঁটি দার্জিলিং চায়ের তকমা লাগিয়ে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বিশ্বে একমাত্র দার্জিলিংয়ে প্রস্তুত উন্নত মানের চা ২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে সেরা মান নির্দেশক জি.আই. (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন), এই দুর্লভ শিরোপা লাভ করেছে। নিম্নমানের চা এই জি. আই ট্যাগের সুবিধা নিয়ে বেআইনিভাবে বাজারজাত হওয়ার ফলে বিদেশে দার্জিলিং চায়ের কদর কমছে এবং দেশীয় বাজারেও চায়ের বিনিময়মূল্য নিম্নগামী । বিষয়টি নিয়ে চা-শিল্পের কর্পোরেট কর্তারা অনেকদিন ধরেই সোচ্চার। এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্ট্যান্ডিং কমিটি সুপারিশ করেছে যে ৬৮ বছর আগে ভারত ও নেপালের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্যচুক্তি পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় আমদানিকৃত চায়ের সম্ভারের ওপর নজরদারি বাড়াতে হবে । এই বিষয়ে সুপারিশের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, দার্জিলিং শহরে এনএবিএল (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) অনুমোদিত একটি চায়ের মান নির্ণায়ক ল্যাবরেটরি নির্মাণ করতে হবে। সেইসঙ্গে নেপাল কর্তৃক এই বেআইনি ডাম্পিং রুখতে ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব্ ট্রেড রেমিডিজ (DGTR) মারফত অনুসন্ধান চালিয়ে এই বাণিজ্য বিপর্যয় রোধ করা ও নেপাল থেকে আইনি-বেআইনি পথে আমদানিকৃত চায়ের ওপর অ্যান্টি-ডাম্পিং কর আরোপ করার সুপারিশ রয়েছে এই রিপোর্টে।

(২) চা উৎপাদক সংস্থাগুলি চা-পর্ষদের (Tea Board) কাছ থেকে তাদের বকেয়া প্রাপ্য ভর্তুকি না পাওয়াতে চা-শিল্পের উন্নয়ন ধাক্কা খেয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছে এই রিপোর্ট। আবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তর সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে চা-বাগানগুলি এখনও চা-পর্ষদের কাছ থেকে আইনি ছাড়পত্র আদায় করতে পারেনি, তাদের কোন বকেয়া প্রাপ্য ভর্তুকি দেওয়া হবে না। টি বোর্ডের এন.ও.সি না পাওয়াতে নাকি চা-শিল্পের উন্নয়ন থমকে গেছে এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ চা-উৎপাদকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। স্ট্যান্ডিং কমিটি সুপারিশ করেছে টি বোর্ডকে অবিলম্বে বাগানগুলি যাতে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই সুপারিশপত্রের কোথাও কিন্তু উল্লেখ নেই যে, গত ২০২১-২২ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন চা-শিল্পে নিয়োজিত মহিলা শ্রমিক ও পরিবারের শিশুদের

কল্যাণখাতে ১০০০ কোটি টাকা খুব জোরগলায় ঘোষণা করেছিলেন। তার কানাকড়িও যে শ্রমিক পরিবারগুলির হাতে এসে পৌঁছলো না, সে বিষয়ে এই রিপোর্ট নিশ্চুপ। রিপোর্টের প্রথম দু'টি বিষয় অবশ্যই মালিক কর্তৃপক্ষের 'সংকট' নিরসনের দাওয়াই। কথাতেও সেই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ বাতলানো হয়েছে।

(৩) দার্জিলিং, ডুয়ার্স-তরাইয়ের শ্রমিকরা তাদের বংশগত ভিটেমাটির পাট্টা-পর্চা এত যুগ বাদেও না পাওয়াতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এই প্রথম কোনো সরকারি রিপোর্টে চা-শ্রমিক বসতির জমিগুলিকে শ্রমিকদের বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত ভূমি বলে স্বীকৃতি দান অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নিয়ম অনুযায়ী চা-শিল্পের মালিক প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের কাছ থেকে লিজপ্রাপ্ত জমিতে চা-আবাদের অনুমতি পেয়ে থাকে। প্রতি ৩০ বছর অন্তর এই লিজের পুনর্নবীকরণ করতে হয়। কিন্তু চা শিল্পে আজও ঔপনিবেশিক শাসন-কাঠামো বজায় থাকায় মালিকেরা শ্রমিকদের আবাসনভূমিকে তাদের জমিদারির অংশ বলে মনে করেন। তাই প্রায়শঃই স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনার প্রাপক তালিকায় তাদের নাম ওঠা সত্ত্বেও চা-মালিকেরা প্রয়োজনীয় এন.ও.সি না দিতে চাওয়ায়, গরীব শ্রমিক পরিবারগুলি তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় । সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির পর্যবেক্ষণে এ কথাও উঠে এসেছে যে, শ্রমিকদের বসতজমির অধিকার শুধু নয়, শ্রমিক পরিবারের মৃত সদস্যদের জন্য শ্মশানভূমি বা কবরস্থানের জন্য নির্ধারিত জমির অধিকার থেকেও শ্রমিক সমাজকে দূরে সরিয়ে রাখতে মালিকেরা অতি সচেষ্ট। এই প্রসঙ্গে সংসদীয় কমিটি জোরালো সুপারিশ রেখেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারকে সঠিক ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়ন করে চা-শ্রমিকদের পরম্পরাগত বাসভূমিতে বসবাসের স্থায়ী অধিকার পাট্টা-পর্চার মধ্য দিয়ে দ্রুত কার্যকরি করে তুলতে হবে।

চা শ্রমিকরা বাগান থেকে ফিরছেন

(৪) এই কমিটি লক্ষ্য করেছে যে, উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি দেশের নির্দ্ধারিত ন্যূনতম মজুরির চাইতে অনেক নিচে অবস্থান করছে। এই সর্বনিম্ন মজুরিতে শ্রমিক জীবনযাত্রার মান দুর্বিষহ অবস্থায় থাকায় তা চা-শিল্পের উন্নয়ন সূচককে নিম্নগামী করে তুলেছে। মজার কথা হ'ল রিপোর্টের এই অংশের শুরুতে শ্রমিকদের স্বচ্ছন্দ জীবন ধারণের জন্য লিভিং ওয়েজে'র কথা বলা হয়েছে, অথচ শেষে, সরকারি উদ্যোগে চা-শ্রমিক সংগঠনগুলি ও মালিক-কর্তৃপক্ষের সম্মতিতে উত্তরবঙ্গের চা-শিল্প শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্মাণের সুপারিশ পেশ করা হয়েছে। সাথে সাথে একথাই বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে মজুরি কোড (কোড অন্ ওয়েজেস, ২০১৯) লাগু করার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে যার মাধ্যমে মজুরির দ্রব্য অংশ (In-kind component) ও শ্রমিকদের অন্যান্য প্রাপ্য অংশ শ্রমিকেরা আইনসিদ্ধভাবে পেতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে মজুরি সংক্রান্ত শ্রমকোডে চা শ্রমিকের দৈনিক কাজের ঘন্টা ৮ থেকে বাড়িয়ে ১২ ঘন্টা করার নিদানও আছে।

রিপোর্টের পরের অংশটিতে শ্রমিকদের ভিটেজমি ও মজুরি সংকটের নিরসনে প্রাপ্য সুবিধাগুলি টাকার মূল্যে পরিমাপের (monetisation) আইনি বাধ্যতা যাতে সুনিশ্চিত করা যায়। সে সব উঠিয়ে দিয়ে একজন কার্যকরী পরিচালককে পর্ষদের সর্বেসর্বা করা কথা বলা হয়েছে।

(৫) বাণিজ্য বিষয়ক সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটিতে চা-শ্রমিকদের বিষয় শীর্ষে রাখা উচিত। এতে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতার অবসান ঘটে চা-পর্ষদের স্বায়ত্বতা বজায় থাকবে। দার্জিলিং-এর চা-শিল্পের পুনরুজ্জীবনের স্বার্থে আধুনিকীকরণ, যান্ত্রিকীকরণ, নাবার্ড-এর মাধ্যমে আর্থিক প্যাকেজ প্রদানের ব্যবস্থা করার সুপারিশও রয়েছে এখানে।

বর্তমান কাজ ও বসবাসের অমানবিক দুর্দশাকে ব্রিটিশ আমলের শর্ত আবদ্ধ চা-মজুরদের দুরপনেয় দুরবস্থার সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে করেছে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, চা-শ্রমিকদের বিশেষত সংখ্যাগুরু মহিলা শ্রমিকদের জীবনধারণের ন্যূনতম সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার ফলে আর্থ-সামাজিক ন্যায়ের অবধারণাটি বিদ্রুপে পরিণত হয়েছে।

এখানে আরও বলা হয়েছে যে, 'চা-বাগিচা আইন ১৯৫১'-কে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরি করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত রাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তির অভাব বা অনুপস্থিতি চা-শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের অবনমনের অন্যতম কারণ। শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পগুলির সুবিধা পেতে, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও আবাস যোজনা এবং সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে এই কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জোরালো সুপারিশ করেছে।

শ্রমিকদের সরকারি কল্যাণ প্রকল্পের সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকারি উদ্যোগে একটি নথি ব্যাংক তৈরি করা এবং সেই সঙ্গে পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত শ্রম কোড ২০২০ অতি দ্রুত লাগু করার জন্য সুপারিশও আছে এই রিপোর্টে।

এই রিপোর্ট-এর উপসংহারে বলা হয়েছে যে, ক্ষুদ্র চা-বাগিচাগুলি যারা উৎপাদিত চায়ের ৫০ শতাংশের অধিক সরবরাহ করে চলেছে তাদের উৎসাহিত করতে চা পর্ষদের ভিন্ন কিছু উৎসাহ প্রকল্প চালু করা উচিত । চায়ের বিপণনে ভ্যালু চেইনের জ্ঞান বাড়াতে এই ক্ষুদ্র উৎপাদকদের জন্য সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করার সুপারিশ করা হয়েছে এই রিপোর্টে। দার্জিলিং জেলার ক্ষুদ্র উৎপাদক বাগিচা থেকে পাওয়া চা-পাতাকে ভৌগোলিক নথিভুক্তির স্বীকৃতি দেওয়া এবং ক্ষুদ্র উৎপাদকদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে উৎপাদক সংগঠন ও উৎপাদক কোম্পানি গঠন করে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা, সরকারি বিনিয়োগ, প্রযুক্তি ও উপকরণ হস্তগত করতে সমর্থ হয়ে উঠবার

পরামর্শ রয়েছে এতে। বিপণনের সম্পূর্ণ সুবিধা পেতে দার্জিলিং পাহাড়ে একটি ই-নিলাম কেন্দ্র স্থাপন করার কথাও বলা হয়েছে। চা যেহেতু একটি কৃষিজাত পণ্য তাই কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মতো প্রধানমন্ত্রী কৃষি সেচ যোজনার সুবিধা পেতে পারে চা-বাগিচাগুলি। রিপোর্টে এমনই মত প্রকাশ করা হয়েছে।

সুপারিশ করা হয়েছে যে, বর্তমানে চা-পর্ষদের কাঠামোয় চেয়ারম্যান ও সহ-চেয়ারম্যান-এর যে আলাদা পদগুলি আছে সেগুলিকে পূরণ করা। পরিশেষে চা-শিল্পে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের বর্ধিত সংখ্যাকে মাথায় রেখে তাদের সশক্তিকরণের জন্য শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে।

শ্রমিক ইউনিয়ন কাঠামোয় মহিলা শ্রমিকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত হলে মহিলা কল্যাণ ও উন্নয়নের বিষয়গুলি প্রাধান্য মূলক অবস্থানে উঠে আসবে । মহিলা শ্রমিকদের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দক্ষতা বৃদ্ধি কেন্দ্র এবং যথাযথ শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার কথাও রয়েছে এতে। এখানেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চা-পর্ষদের ভূমিকাকে পুনর্সংজ্ঞায়িত করে একে চা-শিল্প স্থাপনে লাইসেন্স প্রদানকারী সংস্থা থেকে একটি সাহায্যকারী সংস্থায় পাল্টে ফেলতে হবে।

প্রথমত আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশগুলিকে সম্পূর্ণভাবে মান্যতা দেওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের জীবনধারণের জন্য উপযুক্ত বর্ধিত মজুরি কাঠামো ঘোষণা বা বসতজমির পাট্টা প্রদানের সুপারিশ করা হলেও, বাস্তবে এই প্রস্তাবনা একটি প্রহসনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

উপরন্তু, উত্তর - ঔপনিবেশিক সময়ে যে সব জনকল্যাণমুখী এবং পুঁজি নিয়ন্ত্রক আইন চালু হয়েছিল, তার প্রায় সবগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হচ্ছে, কিংবা তা সংশোধন বা বাতিলের প্রক্রিয়া চলছে। যথা, ১৯৫৩-র ভারতীয় চা আইন (Tea Act 1953) বাতিলের চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্রের মোদী সরকার। এই আইনের ১৫ ও ১৬ ধারা, যেখানে চা বাগিচার যাবতীয় ভূমি ব্যবহার বিষয়ে সরকারি টি বোর্ডের অনুমোদন/ সম্মতির প্রয়োজনের কথা বলা ছিলো, ২০২১-এর মাঝামাঝি ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেগুলিকে 'মুলতুবি' বা সাসপেনডেড ঘোষণা করে। ফলে বাগান মালিকেরা বাগিচা মালিকেরা যেমন তাদের বাগিচার ফাঁকা জমিতে চা চাষ করতে পারবেন, বাগিচার বাইরের চাষজমিতে নতুন বাগিচা তৈরি করতেও কোন বাধা থাকছেনা। একইভাবে, সরকারের কাছ থেকে শর্তাধীনে ইজারা নেওয়া বাগিচার জমিতে চা চাষ ছাড়া অন্য যে কোন কাজও করা যাবে।

মজুরির প্রশ্ন

২০১৫ সাল থেকে বিগত ৯ বছর ধরে সার্ধ শতাব্দী প্রাচীন এই সংগঠিত শিল্পে প্রথমবারের জন্য ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে চলমান শ্রমিক আন্দোলনের চাপে রাজ্য শ্রমদপ্তর যে ত্রিপক্ষীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছিল, তা নবম বছরে এসেও কোনো সর্বসম্মত পরিণতি লাভ করতে পারেনি। রাজ্য সরকারের শ্রমমন্ত্রকের কাছে মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে দ্রব্যমূল্য সূচকের নিরিখে গণনালব্ধ হিসাব পেশ করলেও রাজ্য সরকার সেই কাঠামো ঘোষণা করতে তার অক্ষমতা প্রকাশ করছে । শ্রমমন্ত্রী এই মর্মে অনবরত হিসাব অপ্রাপ্তির মিথ্যা ভাষণ দিয়ে চলেছেন। এই ন্যায্য দাবিকে ঠাণ্ডা ঘরে সমাধিস্থ করতে সরকার বদ্ধপরিকর। এই সূত্রে মালিক-কর্তৃপক্ষ ও সরকারের অদৃশ্য আঁতাত ক্রমশঃ দৃশ্যমান হয়েছে। এক্ষেত্রে বাস্তবচিত্র এই পর্যবেক্ষণকে সমর্থন করে।

জমির প্রশ্ন

গত দু-তিন দশকের মধ্যে পাহাড়, সমতলের প্রায় সর্বত্র ভূমি তার শ্রমজীবী-কৃষিজীবী ব্যবহারকারীদের দখল থেকে বেরিয়ে পুরোপুরি পুঁজিবাজারের কবজায় চলে গেছে। এই পরিঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করছি অহরহ। বড় শহরের পাশে, যথা শিলিগুড়ি বা দার্জিলিং, একের পর এক চা-বাগিচার জমিতে অবৈধ নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। ২২ বছর আগে ২০০৩ এ বাম সরকারের আমলে শিলিগুড়ি সংলগ্ন চাঁদমণি চা-বাগান উচ্ছেদ হওয়ার পর থেকে, শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন বাগিচার জমিতে নির্বিচারে চা - চাষ ভিন্ন অন্য কাজ হচ্ছে।

২০১৯ সালে চা-শিল্পের জমির ১৫% চা-পর্যটন ও সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করার ছাড়পত্র দিয়ে এক নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি জমি যা বাগান কর্তৃপক্ষকে ৩০ বছরের লিজে হস্তান্তর করা হয়, তা এই নতুন আইনের বলে ৯৯ বছরের দীর্ঘ করায় ১৫০ একর অবধি সরাসরি চা-শিল্প বহির্ভূত পর্যটনকেন্দ্র, হোটেল, রিসর্ট, বেসরকারি স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। তরাইয়ের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী নিউ চামটা চা-বাগান (১৮৬৭)-এর জমিতে বহুজাতিক বিলাসবহুল হোটেল ব্যবসা চেইন এক প্রকাণ্ড পাঁচতারা হোটেল বানিয়ে ফেলেছে। একদিকে বাগানটিতে পূর্ববর্তী সময়ে আন্দোলনে তৎপর শ্রমিক সংগঠনগুলির বাগান ইউনিটের সচিবদের টাকার বিনিময়ে হাত করে শ্রমিকদের সম্মতি আদায় করেছে । অন্যদিকে, হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ে আসা স্যুট-বুট পরিহিত ঝাঁ চক্‌চকে বহিরাগত তরুণ-তরুণীর নিয়োগ হলেও কালো চামড়ার আদিবাসী চা-শ্রমিক পরিবারের বেকার সদস্যদের এখানে চাকরি তো দূরের কথা, প্রবেশাধিকার পর্যন্ত নেই। খাতাকলমে সাকুল্যে ৫ একর জমি দেওয়া হলেও, হোটেলটি বেআইনিভাবে গড়ে তোলা হয়েছে ২৪ একর জমিতে।

অর্থাৎ সর্বসমক্ষে জমি হরণ করা হলেও তা শাসক দলের নেতা ও কর্পোরেট সংস্থার যোগসাজশে পরোক্ষভাবে মান্যতা পেয়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকার প্রণীত এই আইনের সাহায্যে নিউ চামটার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাগডোগরা বাগান ৫ একর, মাটিগাড়া টি এস্টেট ৪০ একর, কমলা চা-বাগান ৫০ একর, সিংগিঝোরা ২২.২৬ একর, ওকাই টি ১০ একর, পাহাড়ের টাকভার বাগান ০.৮৪ একর,

মোহরগাঁ-গুলমা ১৪৫.৮৬ একর জমিতে চা-পর্যটনের নামে মুনাফার মৃগয়াক্ষেত্র গড়ে তোলার ছাড়পত্র পেয়ে চলেছে।

অতি সম্প্রতি রাজ্যের কোষাগারের শূন্যতা পূরণ করতে রাজ্য মন্ত্রীসভা অব্যবহৃত সরকারি লিজ-হোল্ড জমিগুলিকে ফ্রি-হোল্ড করে নিয়ে কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে চা-পর্যটন আইন মোতাবেক লিজপ্রাপ্ত ১৫০ একর অবধি চা-বাগানের জমি অচিরেই ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে রূপান্তরিত হওয়ার অশনিসংকেত নির্দেশ করছে।

যেখানে চা বাগিচার জমিতে হোটেল, রম্য রিসর্ট বা পর্যটন কেন্দ্র, এমনকি উচ্চবিত্তের জন্য চা চাষের চাইতে যা বেশি লাভজনক, সেখানে তাই ঘটছে। শিলিগুড়ি লাগোয়া দাগাপুর চা বাগানের দার্জিলিং সড়ক সংলগ্ন অংশটি বহু আগেই আবাসন প্রকল্পের গর্ভে গিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে চা গাছ উপড়ে ৩০ একর জমি খালাস করা হয়েছে আইটিসি'র বিলাসবহুল হোটেল তৈরির জন্য। অথচ বাগান শ্রমিকদের বৃহদাংশ এই জমিতে কেন চা গাছ উপড়ে ফেলা হলো তার কোন হদিশ অদ্যাবধি জানেন না। পাহাড়ে কার্শিয়াং মহকুমার সুপ্রসিদ্ধ মকাইবাড়ি বাগিচায় বড় হোটেল ও রিসর্ট গড়ে উঠছে। একইভাবে জংপানা বাগিচায় রিসর্ট বানানোর কাজ চলছে। শিলিগুড়ি লাগোয়া মাটিগাড়া, নিশ্চিন্তপুর বাগিচার জমিতে পূর্ণ উদ্যমে আবাসন নির্মানের কাজ চলছে।

২০২২-এর ২৮ জুলাই শিল্প মহলের সঙ্গে বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, "আমাদের অনেক জমি পড়ে আছে। সেগুলো নিলাম করবো। শিল্প, শপিং মল যে যা পারে তৈরি করুক। সেটা তাদের ব্যাপার। নীতি করা হবে, লিজ জমি না করে ফ্রি-হোল্ড করে দেব। এখানে, ওখানে ঘুরতে হবে না।"

এরমধ্যে চা-বাগানের জমির কথাও বলা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বিনিয়োগ টানতে সরকারি জমির দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। আর এখন তো আবাসনও শিল্প। জমি হরণের আরও অনেক প্রক্রিয়া চালু আছে। পরম্পরাগত ভাবে চা-বাগানের অব্যবহৃত জমিতে চাষাবাদ করার অধিকার রয়েছে স্থায়ী শ্রমিক পরিবারগুলির। এই জমির খাজনা এড়িয়ে চলে বাগান মালিকরা। এখন সরকারি মদতপুষ্ট প্রোমোটারদের সঙ্গে ব্লক বা মহকুমা ভূমি সংস্কার আধিকারিক, কোথাও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকদের আঁতাত এ চাষের জমিগুলি সর্বত্র দখল করতে শুরু করেছে। তরাইয়ের একটি চা-বাগানে উচ্ছেদের মুখে দাঁড়িয়ে চা-শ্রমিক প্রতিরোধ করতে চাইলে তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া চা-বাগান সংলগ্ন নদী, খাস জমি, তিস্তা সেচ প্রকল্পের কম্যান্ড এলাকার জমি, ডুয়ার্সের চামুর্চি, নাথুয়া, মাকড়াপাড়া, ঢেকলাপাড়া, বান্দাপানি – এই বাগানগুলির জমি বালি খাদান, ডলোমাইট খাদানের জন্য ক্রমাগত চুরি হয়ে চলেছে। একমাত্র তোতাপাড়া চা-বাগানে শ্রমিক প্রতিরোধে এহেন খাদানের কাজ বন্ধ করা গেছে। আবার চা-বাগান সংলগ্ন বনবস্তি থেকে আদিবাসী-নেপালী অস্থায়ী শ্রমিকদের উচ্ছেদ করে গরুমারা, বক্সা, রাজাভাতখাওয়া, বেঙডুবি ইত্যাদি এলাকায় জাতীয় পার্ক বা বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত অঞ্চল-এর তকমা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এভাবেই শ্রমজীবী জনজাতির মানুষজনকে তার জীবিকা অর্জনের কারখানা, বসবাসের কুলি লাইন, খেলার মাঠ, ধর্মস্থানের জায়গা থেকে উজাড় করার কর্মকাণ্ড চলছে। বেআইনিভাবে বাণিজ্যিক মুনাফার স্বার্থে জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে দার্জিলিং পাহাড়ে কাঞ্চনভিউ, ধোত্রে সহ অনেক বাগানে বুলডোজার আটকে দিয়েছে শ্রমিকদের সম্মিলিত শক্তি।

দার্জিলিংয়ে বনসালদের মালিকানায় থাকা ১০টি রুগ্ন চা-বাগানের মধ্যে ৬টি বাগান জিটিএ-র মধ্যস্থতায় সমঝোতা করে নতুন মালিক কর্তৃপক্ষের হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সমঝোতায় কোথাও শ্রমিকদের প্রাপ্য বকেয়া মজুরি, পি এফ, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি মিটিয়ে দেওয়ার কোনো উল্লেখ নেই। বাকি ৪টি বাগানে কোটি কোটি টাকার ব্যাঙ্ক লোন মিটিয়ে গ্রহণ করার মত ব্যবসায়িক সংস্থা মিলছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চা-বাগানের ১৫০ একর জমিতে আনুপাতিক হারে পাহাড়ে কাজ করে ৯০ জন শ্রমিক আর সমতলে কাজ করে ১৫০ জন শ্রমিক। রাজ্য সরকার চা-শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের আবাসন জনিত সমস্যা সমাধানে প্রচুর ঢক্কানিনাদ করে হাজির করেছে চা-সুন্দরী প্রকল্প। এই আবাসন স্কিমে শ্রমিক বসতিগুলিকে চা-বাগানের প্রান্তসীমায় স্থানান্তরিত করতে প্রতি শ্রমিক পরিবার পিছু ৩৫৮ বর্গফুটের মাপে এক কামরার পাকা ঘর তৈরি করছে। পায়রার খোপের মতো এই আবাসনগুলি অনেকটা উদ্বাস্তু ব্যারাকের মতো। পাকা ঘর, পাইপবাহিত পানীয় জলের সুব্যবস্থার প্রত্যাশা জাগানোর প্রয়াস থাকলেও চা-শিল্পের আম-মজদুর এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে উদ্বাস্তু হয়ে দৌড়ে আসছে না। কারণ বসতভূমি বলতে তাঁরা বোঝেন খোলা আকাশ, মুক্ত বাতাসে থাকা তাদের বাস্তুভিটের কথা – যেখানে হাঁস, মুরগী, গরু, শুয়োর বিচরণের জায়গা থাকবে, থাকবে একচিলতে সবজি ফলানোর জমি। এইসব অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক কার্যকলাপ চা-বাগানে হাড়ভাঙা খাটনির বিনিময়ে ন্যূনতম মজুরি না পাওয়ার বেদনাকে কিছুটা প্রশমিত করে কোনমতে দু'বেলা খাবার জোগাড়ে তাদের সমর্থ করে তোলে। শ্রমিক লাইনে প্রজন্মের পর প্রজন্ম একসাথে বসবাস করার সুবাদে গড়ে ওঠে এক অভিন্ন শ্রম ও কৌম চেতনা।

পূজা, হোলি, আদিবাসী উৎসবের দিনে মাদলের তালে নেচে ওঠার, হেসে ওঠার স্বাধীনতা হারিয়ে এই দম আটকানো বদ্ধ পাকা ঘরে তাদের মনগুলিকে পিষে মারতে তারা রাজি নয়। হয়তো অচিরেই চা-শিল্পে উৎপাদন সম্পর্কের দ্রুত পরিবর্তনের চাপে শ্রমিকদের বাধ্য করা হবে পায়রার খোপে নিজেদের বন্দী করে ফেলতে।

২০২৩-এর ১৩ জানুয়ারি চা-শিল্পে সক্রিয় ২৬টি ট্রেড ইউনিয়নের সম্মিলিত আন্দোলনের মঞ্চ জয়েন্ট ফোরাম বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নানান 'উন্নয়নের' অছিলায় চা-বাগানে শ্রমিক লাইন বা

সামান্য মাত্রায় কৃষিকাজ চালানোর এক চিলতে জমি মালিকের লেঠেল বাহিনী বা সরকারি চা-পর্যটন আইনের বলে জমি হরণের আইনি-বেআইনি সমস্ত অপচেষ্টাকে প্রতিহত করা হবে সর্বশক্তি দিয়ে। এক ইঞ্চি জমি বিনা প্রতিরোধে নিতে দেওয়া হবে না। ২০২৪-এর ২৯ জানুয়ারি দার্জিলিং, ১১ ফেব্রুয়ারি তরাইয়ের বাগডোগরা ও ১২ ফেব্রুয়ারি ডুয়ার্সের চালসায় চা-শ্রমিকদের কনভেনশনের মধ্য দিয়ে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে, ন্যূনতম মজুরি কাঠামো চালু করা এবং চা শ্রমিকদের বসতজমির পাট্টা-পর্চা প্রদানের দাবিতে যে নাছোড় আন্দোলনের দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছে, সেই লড়াই আজও অব্যাহত রয়েছে।

২০২৩-এর শেষ অঙ্কে কিছু নতুন পরিঘটনা চা-শ্রমিক সমাজকে আলোড়িত করতে শুরু করে। মুখ্যমন্ত্রীর সাধের চা-সুন্দরী প্রকল্প বিফল প্রমাণিত হতে এবারে ঘর বানাতে ইচ্ছুক পরিবারকে এককালীন ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার অনুদান ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এই নতুন ঘোষণা তেমন বড় মাপের সাড়া জাগাতে পারছে না, তার অন্যতম কারণ শ্রমিক পরিবারের বাস্তু জমির ওপর কোনো অধিকার না থাকা। সরকার এখন তার ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছে প্রত্যেক শ্রমিক পরিবার পিছু পাঁচ ডেসিমেল করে বাস্তু জমির পাট্টা দেওয়ার লক্ষ্যে জমি জরিপের কাজ শুরু করতে। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনগুলি এই নির্দেশ মানতে নারাজ। জয়েন্ট ফোরাম দাবি করেছে শ্রমিক পরিবারগুলি তাদের বস্তিগুলিতে যে যেখানে যতটুকু জমিতে কয়েক প্রজন্ম ধরে বাস করছে তাদের সেটুকু জমির মান্য অধিকার দিতে হবে। এই দাবির স্বপক্ষে চা-শ্রমিক সমাজ এককাট্টা হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ায় রাজ্য সরকার আপাতত পিছু হটছে। এবং অন্য কোনো সমাধান সূত্র হাতড়ে চলেছে। ইতিমধ্যে গত ১ আগস্ট, ২০২৩ কোলকাতার হাইকোর্ট চা-শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি সংক্রান্ত একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে মাননীয় বিচারপতি বলেছিলেন যে, পরবর্তী ছ'মাসের মধ্যে রাজ্য সরকারকে চা-শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি কাঠামো ঘোষণা করতে হবে। এই মেয়াদ শেষ হয়েছে মাত্র ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪। বিপদ বুঝে শ্রমমন্ত্রী সাত তাড়তাড়ি ২০১৫ সালের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী নির্ণিত মিনিমাম ওয়েজ অ্যাডভাইসারি কমিটির (MWAC) ১৮ ও ১৯তম (১লা ফেব্রুয়ারি, ২০২৪) বৈঠক ডেকে মজুরি বিবাদের নিষ্পত্তি করতে চাইলেও সমাধানের লক্ষ্যে কথাবার্তা ফলপ্রসূ হয়নি। এরপরে এক বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হলেও আজও এই দাবিপূরণ হয়নি। নাগরিক সমাজের অংশ, যাতে কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব জুড়ে আছেন, সেই মিনিমাম ওয়েজ ডিমান্ড কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে 'প্রতারণার ১০ বছর' নিয়ে ব্যাপকভাবে পোস্টার ক্যাম্পাইন করা হয়েছে উত্তরবাংলার সমগ্র চা বলয় ও মূল শহরগুলিতে। এরই পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে ৩০ মার্চ ২০২৫ 'জমি- জীবিকা- পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন'- এর পক্ষ থেকে চা-শ্রমিক, কৃষিজীবি জনতা, বনবস্তীবাসী মানুষ ও পাহাড়বাসীদের জমি, জীবিকা ও পরিবেশ বাঁচানোর মূল দাবি - যাতে উত্তরের নদীখাতগুলি বালি, পাথর মাফিয়াদের কবল থেকে মুক্ত করা, বিশেষ করে পুঁজির স্বার্থে তিস্তার ওপর তৈরি অসংখ্য নীচু বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত অপার্টি সংগঠনগুলিদের সম্মিলিত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক মহতী কনভেনশন। এই কনভেনশনের ১৩-দফা দাবি নিয়ে প্রাথমিকভাবে এলাকাস্তরে প্রচারপর্ব শুরু করা হয়েছে। জুনের প্রথম সপ্তাহে জয়েন্ট ফোরাম জরুরি মিটিং ডেকে চা শিল্পে জুন-জুলাই- আগস্টের আন্দোলনমুখি কর্মসূচি নিয়েছে।

অতএব আগামী মাসগুলিতে বাংলার চা-ক্ষেত্রটি যে আন্দোলনমুখর হয়ে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। পুঁজির আদিম সঞ্চয়নের নয়া কৌশলের বিরুদ্ধে শ্রমশক্তির প্রতিরোধের ডাক আবার এসেছে উত্তরের বিদ্রোহী প্রান্তর থেকে।

*অভিজিৎ মজুমদার
কার্যকরী সভাপতি
তরাই সংগ্রামী চা শ্রমিক ইউনিয়ন।

কুম্ভ নিকুম্ভ

বাপ্পাদিত্য রায়

অবশেষে এবারকার মহাকুম্ভের সমাপ্তি ঘটল। দেশের চতুর্থ বৃহত্তম ও সবচাইতে জনবহুল রাজ্য উত্তর প্রদেশের দক্ষিণ পূর্বে রাজ্যের সবচাইতে জনবহুল এলাহাবাদ জেলা এবং তার সদর ঐতিহ্যমণ্ডিত এলাহাবাদ শহর। অতীতে এই অঞ্চল কোশল, কনৌজ, মুঘল, আওধ প্রভৃতি রাজ্য ও সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ২০১৮ থেকে যার নামকরণ হয়েছে প্রয়াগরাজ। তার সন্নিকটে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী (বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নেই) নদীর সঙ্গম প্রয়াগে ১৩ জানুয়ারি '২৫ এর পৌষ পূর্ণিমায় অত্যন্ত ঘটা করে ও জাঁকজমক সহকারে শুরু হয়েছিল এবারের কুম্ভ মেলা এবং পুণ্যস্নান। ঘটনাবহুল ৪৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার এবং পৌষ পূর্ণিমা, মকর সংক্রান্তি, মৌনী অমাবস্যা, বসন্ত পঞ্চমী, মাঘী পূর্ণিমা ও শেষে ২৬ ফেব্রুয়ারি '২৫ শিবরাত্রির ভিড়েভিড়াক্কার শাহী বা রাজযোগী স্নানের পর এবারকার মেলা সংগঠনের প্রাণপুরুষ গোরক্ষনাথ মঠের প্রধান পুরোহিত এবং উত্তর প্রদেশের দীর্ঘতম মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ (অজয় মোহন বিস্ত)

মেলার 'সফল' পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলেন। তার সঙ্গে তিনি দাবি করলেন যে এই মহাতীর্থে এবার ৬৫ কোটি পুণ্যার্থী অর্থাৎ বিশ্বের সবচাইতে জনবহুল এই দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যার আগমন ঘটেছিল। এইসব দেখেশুনে তথাকথিত পুরাণ আর মহাকাব্যে বর্ণিত দেবতাদের পুষ্পবৃষ্টি করার কথা ছিল। কিন্তু ঘোর কলিকালে হেলিকপ্টার চালকের সহযোগীকে এই দায়িত্ব পালন করতে হল।

কুম্ভ স্নান

কিন্তু সমাপ্তি বললেই কি সমাপ্তি ঘটে? ইভেন্ট ও মিডিয়া ম্যানেজমেনটের যুগ্ম বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এই যে মহা আয়োজন, তাকে ঘিরে প্রবল প্রচার (Hype) এবং সব মিলিয়ে যে লাভজনক ব্যবসা ও ভোট রাজনীতির ফায়দা তার শেষ বিন্দু অবধি ব্যবসাদার আর রাজনীতিকরা ছাড়তে নারাজ। অন্যদিকে এই ভাঙ্গা মেলাতে এতদিন যাঁরা কোনভাবে পৌঁছতে পারেননি তাঁদের মনজগতে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া চলছে যে তাঁরাই বা কেন তাঁদের জীবদ্দশার মধ্যে একমাত্র সুযোগ এই যাবতীয় পাপ স্খলন সহ মহাপুণ্য বা মহামোক্ষ লাভ থেকে বঞ্চিত থাকবেন? সুতরাং তাদের অনেকেও অবশিষ্ট অমৃতের সন্ধানে প্রয়াগরাজে ছুটছেন। আর যে কোন বড় ব্যবসার অনুসারী ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলির মত এই সুযোগে ভাগ্য ফেরাতে যত হোটেলওয়ালা, দালাল, খাবার দোকানদার, গাড়ি ও বাইক ট্যাক্সি চালক, নৌকোর মাঝি, পুরোহিত, নাপিত, ফুল বিক্রেতা, ভানুমতীর খেলের কলাকার, মোদক, ড্রাগ পেডলার, দেহোপজীবিনী, বৃহন্নলা, ঠগ, গাঁটকাটা, ভিখিরি ... সকলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ঠিকাদার ও ধর্ম ব্যবসায়ীরা তো জমিয়ে ব্যবসা করছেনই। পুলিশ, পুরসভার আধিকারিক, নেতা গোছের লোকজনদেরও ভাল আয়-রোজগার হচ্ছে। এত ভিড় ও পুণ্যলাভের প্রতি এত উন্মাদনা (Craze) যে প্রচণ্ড ভিড়ে নিয়মিত পদপৃষ্ট হওয়া ও তজ্জনিত মৃত্যুর খবর তুচ্ছ হয়ে গেছে। অব্যবস্থা ও ভিড়ে পদপৃষ্ট হয়ে নিউ দিল্লি রেল ষ্টেশনেও বেশ কিছু পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। লোকসানে চলা ভারতীয় রেল রেকর্ড টিকিট বিক্রি করেছে। টিকিট না কেটে চলাফেরা করা সাধুসন্ত ও আম জনতার কথা বাদ দিয়েই। উত্তর ভারত গামী এবং উত্তর ভারত দিয়ে যাতায়াত করা ট্রেনের সমস্ত সংরক্ষিত আসন পূর্ণ ছিল। ট্রেনগুলিতে ছিল উপচে পড়া ভিড়। ট্রেনগুলি অস্বাভাবিক দেরিতে চলাচল করেছে।

কুম্ভের ইতিবৃত্ত: কুম্ভ শব্দের অনেক ব্যাখ্যা থাকলেও মূল অর্থ মাটির কলস। বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ, লোক গাথা ইত্যাদিতে কুম্ভ নিয়ে যে দীর্ঘ, জটিল, ধোঁয়াশা ভরা অতিকথার আখ্যানটি (Mythical Narrative) তুলে ধরা হয়েছে সেটি হল - স্বর্গে বসবাসকারী সুদর্শন, বুদ্ধিমান, কৌশলী এবং ক্ষমতাধর দেবতারা পাতালে বসবাসকারী কুদর্শন, বুদ্ধিহীন, ক্রোধী এবং শক্তিধর অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে কিছুতেই এঁটে উঠতে না পেরে অসুরদের ঠকিয়ে অমরত্ব লাভের পরিকল্পনা করলেন। তাঁরা তিন প্রধান দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্য নিলেন। বহু রকম ঘটনার পর ক্ষীর সাগরের বুকে কূর্ম অবতারের পিঠে মন্দর পর্বতকে চাপিয়ে শেষ নাগ তাকে বেষ্টন করে মন্থন শুরু করেন। সেই সময় নানারকম উদ্ভূত সমস্যা নারায়ণ, গরুড় প্রমুখরা মিটিয়ে দেন। অন্যদিকে দুর্বাসা মুনিরা জটিলতা সৃষ্টি করেন। যাইহোক, দীর্ঘ মন্থনের পর দই, ঘি, চাঁদ, লক্ষ্মী, কৌস্তভমণি, পারিজাত, শ্বেত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, সুন্দরী অপ্সরার দল উঠে এলে দেবতারা অসুরদের সঙ্গে সেগুলি ভাগ বাটোয়ারা করে নেন। এরপর তীব্র হলাহল কালকূট উঠে এলে নীলকণ্ঠ সেটি গলাধঃকরণ করে পরিস্থিতি সামাল দেন। সমুদ্র মন্থনের শেষে ধন্বন্তরের হাতে মাটির কলসে উঠে আসে অমৃত। সঙ্গেসঙ্গে অমৃতের কলস নিয়ে দেবতারা ছুট দেন স্বর্গের দিকে। অসুররা তাদের তাড়া করেন। শেষমেশ ইন্দ্র পুত্র জয়ন্ত অসুরদের ফাঁকি দিয়ে অমৃত ভরা কলস স্বর্গে নিতে সমর্থ হন। যাত্রাপথে দেবতারা চারটি জায়গায় বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সেই জায়গাগুলিতে কিছুমাত্রায় অমৃত উপছে পড়েছিল। প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী ও নাসিক, সেই চারটি স্থানে প্রতি বারো বছরে একবার পর্যায়ক্রমে বৃহস্পতি, সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান দেখে কুম্ভ মেলার আয়োজন হয়।

অতীতে প্রয়াগে প্রতি বছর মাঘী মেলা অনুষ্ঠিত হত। সপ্তম শতাব্দীতে বিশিষ্ট চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য ভ্রমণকালে সেটি পরিদর্শন করেন। অষ্টম শতাব্দীতে জনপ্রিয় বৌদ্ধ দর্শন থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের পুনরুত্থানের সময় শঙ্করাচার্য এই মেলার মাধ্যমে সাধু সন্তদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে মোঘল সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল ফজল রচিত 'আইন ই আকবরি' গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। ওই সময় রামবোলা দুবে ওরফে তুলসিদাস রচিত 'রামচরিতমানস' গ্রন্থেও এর উল্লেখ আছে। ভারতীয়দের এই ধর্মীয় উন্মাদনা দমন করতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা এই মেলার উপর বিধিনিষেধ লাগু করলে ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে হরিদ্বারের আখড়াগুলি বিদ্রোহ করে। সেনা নামিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে হয় এবং ব্রিটিশ সেনাদের গুলিতে পাঁচ শতাধিক সাধু সন্ত নিহত হন। ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে একের পর এক কৃষক ও জনজাতি বিদ্রোহের পর ১৮৫৭ - '৫৮-তে মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়ে সাময়িকভাবে ব্রিটিশ শাসনকে উচ্ছেদ করে। তদানীন্তন আওধ রাজ্যে শক্তিশালী ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহ হয়েছিল এবং এলাহাবাদ ছিল মহা বিদ্রোহের অন্যতম ঘাঁটি। অনেক প্রচেষ্টায় মহাবিদ্রোহকে দমন করে ব্রিটিশরা তাদের সবচাইতে লাভজনক উপনিবেশ ভারতে ক্ষমতা সংহতকরণের উদ্দেশ্যে ভারতীয়

ধর্মগুলিকে ছাড় দিতে শুরু করে। সেইসময় ব্রিটিশের তত্ত্বাবধানে ১৮৭০ থেকে সংগঠিতভাবে কুম্ভ মেলার সুত্রপাত। এরপর প্রতিবছর মাঘমেলা, প্রতি চার বছর পর কুম্ভ মেলা, প্রতি ছয় বছর পর অর্ধকুম্ভ মেলা, প্রতি ১২ বছর পর পূর্ণকুম্ভ মেলা এবং প্রতি ১৪৪ বছর পর মহাকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তবে ১৪৪ বছরের গল্পটি মাঝেমাঝেই শোনা যায়। বছর দুয়েক আগে হুগলির ত্রিবেণী এবং নদীয়ার কল্যাণীর গঙ্গার ঘাটে আরেকটি ১৪৪ বছরের কুম্ভের প্রচারে কাতারে কাতারে পুণ্যার্থী উপস্থিত হয়েছিলেন। এছাড়াও তামিলনাড়ুর কুম্বাকোনামে কাবেরি নদীতীরে মহামহাম জলাশয়ে মাঘমেলা উপলক্ষে দক্ষিণী কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয় কুরুক্ষেত্র, সোনিপাত, রাজিম, পানাউটি (নেপাল) প্রভৃতি ধর্মস্থানে।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন থেকে শুরু করে ২০২৫-এ স্টিভ জোবসের বিধবা পত্নী লরেন পাওয়েল বহু বিদেশী কৌতূহলবশত অথবা প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক শান্তির খোঁজে কুম্ভ দর্শন করেছেন। ইউনেস্কো ২০১৭-এ কুম্ভ মেলাকে বিশ্ব ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানের তালিকায় সংযোজিত করে। কুম্ভ মেলাকে বলা হতে থাকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ শান্তিপূর্ণ জনসমাবেশ। অতীতে শাস্ত্র অথবা অস্ত্রধারী মহানির্বাণ, অটল, নিরঞ্জনি, আনন্দ, জুনা, আবাহন ও অগ্নি সাতটি শৈব আখড়া; নির্বাণী ও দিগম্বরী বৈষ্ণব আখড়া এবং দত্তাত্রেয় ত্রিদেব আখড়া কুম্ভ মেলা আয়োজন করলেও এখন সরকার নির্বাচিত মেলা কমিটি মেলার যাবতীয় আয়োজন করে। তবে পরম্পরাগতভাবে আখড়াগুলি কিছু সুবিধা পায়। সঙ্গমের কাছে আখড়ার তাঁবু ফেলার জায়গা, ব্রাহ্ম মুহূর্তে সবার আগে সাধু সন্তদের শাহী স্নানের সুযোগ ইত্যাদি। তারাও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, কীর্তন, ধর্মোপদেশ, লঙ্গর প্রভৃতির আয়োজন করে। নাগা সন্ন্যাসী, নাগিন সন্ন্যাসিনী, আইআইটি বাবা থেকে সাধ্বী মমতা কুলকারনি ইত্যাদি রোমাঞ্চকর বিষয়গুলি থাকে কুম্ভের বিশেষ আকর্ষণ।

একদিকে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় মাত্রাতিরিক্ত মানুষের ভিড়, সেখানে খাওয়া থাকা মলমূত্র ত্যাগ, ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের কারণে কুম্ভে স্নান নিয়ে তাদের পাগলপারা মনোভাব; অন্যদিকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, রাজ্য ও জেলা প্রশাসন, পৌরসভা, মেলা কমিটি কর্তৃক উপযুক্ত পরিকাঠামো, ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা ও পুণ্যার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব; দায়িত্বশীল আধিকারিক, পুলিশ, কর্মী, স্বেচ্ছাসেবকদের একাংশের সংবেদনশীলতার অভাব, অবহেলা ও দুর্নীতি কুম্ভ মেলায় একের পর এক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। ১৯৫৪ ও ১৯৮৬-তে পদপৃষ্ট (Stampede) হয়ে বহু পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়। ২০২১ এর কুম্ভ মেলা থেকে কোভিড রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে (Super spreader)। এবারের মেলায় পরিকাঠামো ও স্বাস্থ্যবিধির (Sanitation) খাতে উত্তর প্রদেশ সরকার সাত হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে এবং কৃত্রিম মেধা, চ্যাটবট, লেজার, অ্যাপস প্রভৃতি আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়েছে। এছাড়াও ১৪২৮.৬৮ কোটি টাকার ৮৩ টি প্রকল্প সম্পূর্ণ করেছিল। ধনী, প্রভাবশালী, নেতাদের জন্য ভাল ও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তাই প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রী নেতা ও সাংসদ, মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্যের মন্ত্রী নেতা আধিকারিক, শিল্পপতি, ধনী ব্যাবসায়ী, ধনী বিদেশী ও এনআরআই, সেলিব্রিটি, দুই ভারত বিধাতা মুকেশ আম্বানি ও গৌতম আদানিদের প্রতি আপ্যায়নের ত্রুটি ছিলনা এবং তাদের মহাকুম্ভে এয়ারপোর্ট থেকে কনভয় নিয়ে ভিআইপি এলাকা দিয়ে যাতায়াত, ফাইভ স্টার প্লাসে থাকা - খাওয়া এবং একদম সঙ্গমে ভালভাবে নাওয়ার কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু বিপদে পড়েছেন আম জনতা। না ছিল পর্যাপ্ত যানবাহন, না ছিল থাকা খাওয়া স্নান ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা। মাঝ রাত্তিরে উঠে পুলিশ - স্বেচ্ছাসেবকদের ঘাড়ধাক্কা ও ভিড়ের চাপ সহ্য করে, বালি কাদা নোংরার মধ্যে দিয়ে অনেকটা পথ হেঁটে, সঙ্গম থেকে দূরে কলুষিত নদীর দূষিত জলে ঠেলাঠেলি করে কোনরকমে একটি ডুব দিয়ে তারা অমৃত লাভ করেছেন কিনা জানা নেই, তবে নিদারুণ কষ্ট পেয়েছেন সেরকম খবর নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। পদপৃষ্ট হয়ে, দুর্ঘটনায়, যাতায়াতের ধকলে, প্রবল ঠাণ্ডায়, সংক্রমণে, বয়সজনিত কারণে বহু পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। সঠিক সংখ্যা জানানো হয়নি। বহুক্ষেত্রে মৃতদেহের ময়না তদন্ত হয়নি, ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি, মৃতদেহকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কয়েকবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

কুম্ভের লাভ লোকসান: ৩৬৫ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের প্রয়াগরাজ শহরের আনুমানিক জনসংখ্যা ১৬,২৫,০০০। সেখানে ৪৫ দিন ধরে হলেও ৬৫ কোটি মানুষের আগমন সম্ভব কিনা বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন। তবে কেন্দ্র ও উত্তর প্রদেশের বিজেপি সরকার যে এবার সুপরিকল্পিতভাবে ও দক্ষ প্রচারের ঢেউ তুলে মহাকুম্ভের প্রতি ধর্মপ্রাণ ভারতীয়দের, বিশেষ করে পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতের হিন্দিভাষী রাজ্যগুলির বাসিন্দাদের, প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে এবং তাদের প্রয়াগরাজে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে একথা অস্বীকার করার কোন জায়গা নেই। মহাকুম্ভ নিয়ে এবার সংবাদ মাধ্যমে এবং জনমানসে যা প্রচার ও চর্চা হয়েছে রাম মন্দির ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তা হয়নি। ফলে নিঃসন্দেহে বিজেপি জাতীয় স্তরে এবং হিন্দি বলয়ে তার হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিতে লাভবান হয়েছে যা সঙ্ঘ পরিবারের হিন্দু পাদশাহীর কর্মসূচি রুপায়নে আরও কার্যকর হবে। আসন্ন বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি বিধানসভা নির্বাচনে ভোট বাক্সেও এর কিছু প্রতিফলন দেখা যেতে পারে। পাশাপাশি রামমন্দিরের মত কুম্ভ মেলার অতি পবিত্রস্থানকে ঘিরে বারাণসী - প্রয়াগরাজ - অযোধ্যা সার্কিটে ধর্মীয় পর্যটন ব্যবসার দিক থেকেও উত্তর প্রদেশ সরকার লাভবান হচ্ছে এবং আরও হবে।

ব্রাহ্মণ্যবাদ (Brahminism), পিতৃতন্ত্র (Patriarchy), বর্ণাশ্রম প্রথা (Caste System) এবং উচ্চবর্ণ বা বর্ণহিন্দুদের কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব (Higher Caste Control and Supremacy) অটুট রেখে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (RSS) বিগত ১০০ বছর ধরে যে হিন্দুত্ব (Hindutva) ও হিন্দু ঐক্যের (Hindu Unity) অনুশীলন এবং সামাজিক পরিবর্তন (Social Engineering) চালিয়ে যাচ্ছে এবং পশ্চাদপদ (OBC), দলিত (ST) ও জনজাতিদের (ST) একেকটি

জাতিকে ধরে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের বৃহত্তর সঙ্ঘ পরিবারের ছাতার নিচে জড়ো করতে পেরেছে একইভাবে কুম্ভর ক্ষেত্রেও তারা সফল। আরএসএসের ৪৪ টি প্রান্তের ১৬ হাজারের বেশি স্বয়ংসেবক এবং সঙ্ঘ পরিবারের অন্যান্য শাখা সংগঠনের বেশ কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক দিনরাত এক করে কুম্ভে কাজ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে উপবিতধারী পূজাপাঠ করা একদা বামপন্থী বর্তমানে তৃণ - বিজেপি দক্ষিণপন্থীরা এবার সমাজমাধ্যমে কুম্ভের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। এক্ষেত্রে একদা মার্ক্সবাদী পরবর্তীতে ভোগবাদী বিশিষ্ট সাহিত্যিক কালকূটের বিখ্যাত 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' বইটি তাদের সহায়ক হয়েছে। যদিও তারা বইটির শেষের বক্তব্য "যে অমৃতে এত বিষ, কি প্রয়োজন সেই অমৃতে?" এড়িয়ে গেছেন। সঙ্ঘ পরিবার ১৯৮৯ এর কুম্ভ থেকে রাম জন্মভূমি আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে। ২০১৩-র কুম্ভে নরেন্দ্র মোদীকে তাদের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ নির্বাচিত করে। আর আরএসএসের শতবর্ষে ২০২৫ এর মহাকুম্ভে কাশী - মথুরাকে মুক্ত করার কর্মসূচি জোরদার করেছে। প্রসঙ্গক্রমে ১৯৫৪ সালের কুম্ভ মেলাকে নিয়ে কংগ্রেস বড় ধরনের রাজনৈতিক প্রচার চালিয়েছিল এবং তখনও ১৪৪ বছরের গল্পটা চাউর করা হয়েছিল।

বিজেপির আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যোগী আদিত্যনাথের মূল উদ্যোগ থাকলেও উদ্বোধনী মঞ্চে মোদী একক অনুষ্ঠান করে সমস্ত প্রচার ও কৃতিত্ব কেড়ে নিয়েছিলেন। তাই মোদী সহ অন্য নেতারা কুম্ভে এলেও যোগী আদিত্যনাথ একবারের জন্যও এবার রাশ ছাড়েননি। যদিও মোদী বক্তৃতায় ও এক্স হ্যান্ডেলে যথারীতি কৃতিত্ব দাবি করেছেন। অন্যদিকে যোগী আদিত্যনাথও বেশ কিছু অঘটনকে পাত্তা না দিয়ে এবারের কুম্ভের রেকর্ড জনসমাগমের কৃতিত্ব দাবি করেছেন। তাঁর পাখির চোখ পরবর্তী উত্তর প্রদেশ নির্বাচন সহ মোদী পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর কুর্শি।

ভারতীয় পরিস্থিতি এবং বাস্তব রাজনীতি (Realpolitik) সম্পর্কে এখনও অজ্ঞ থেকে যাওয়া রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বিজেপির এই সফল ও সংগঠিত ধর্মীয় রাজনীতির কোন বিকল্প দাঁড় করাতে পারছে না। এবারও গান্ধী পরিবার কুম্ভে ডুব দেবে কি দেবে না ভাবতে ভাবতেই কুম্ভ চলে গেল। অরবিন্দ কেজরিওয়াল নরম হিন্দুত্ব নিয়ে বিজেপির সঙ্গে পেরে না উঠে সাম্প্রতিক দিল্লি নির্বাচনে পরাস্ত হয়ে কুম্ভ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেননি, দেখাননি স্বভাবসুলভ অতিসক্রিয়তা। কুম্ভের অব্যবস্থা নিয়ে, বহু মানুষের মৃত্যু এবং নিউ দিল্লি স্টেশনের দুর্ঘটনা নিয়ে কংগ্রেস বা আপ সেভাবে কোন প্রতিবাদ গড়ে তুলতে পারেনি। একদা হিন্দি বলয়ে শক্তিশালী সমাজবাদীদের তরফে অখিলেশ ও লালু যাদব কিছুটা বিরোধিতা করেন। মৃত্যু, অব্যবস্থা ও ক্ষতিপূরণ নিয়ে তার দৃষ্টিআকর্ষণীয় সমালোচনা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে জাতীয় স্তরে বিরোধী নেত্রী হিসাবে স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের ৩৫% এককাট্টা মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক এবং তার অনুপ্রেরণালব্ধ তথাকথিত 'বিদ্বজ্জন' ও 'বিপ্লবী'দের আশ্বস্ত করেছেন। বামেরা কখনই ধর্মের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেনি। ভোটের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে মুসলিম মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে। আর আজ দেশজুড়ে আরএসএস - বিজেপির আগ্রাসী ধর্মীয় রাজনীতির কাছে তারা একেবারেই অসহায়।

কুম্ভ ও পরিবেশ: একদিকে সবুজ ধ্বংস, শিল্পের ক্ষতিকর বর্জ্য, ফসিল ফুয়েলের অতি ব্যবহার, যুদ্ধ প্রভৃতি কারণে বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global Warming), অন্যদিকে সরকারি মদতে উত্তরাখণ্ডের গঙ্গা যমুনার উৎসস্থল থেকে আরম্ভ করে হৃষীকেশ ও ডাক পাথরের কাছে গঙ্গা ও যমুনা যেখানে সমতলে পৌঁছেছে সেখানে উন্নয়নের দোহাই দিয়ে যেভাবে সামগ্রিক পরিবেশ ধ্বংস করা হয়েছে এবং হয়ে চলেছে তার ফলে হিমবাহের জলধারাপুষ্ট গঙ্গা ও যমুনা নদী মাতাদের ভবিষ্যতও বিলুপ্ত হওয়া সরস্বতী মাতার মত। এগুলি বুঝেও না বোঝার ভান করে কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যেগুলির বিভিন্ন দলের একের পর এক সরকার, বিভিন্ন পুরসভা, জেলা ব্লক ও গ্রাম প্রশাসন, শিল্প - কারখানা এবং এক শ্রেণির মানুষ যেভাবে নদীগুলির উপর অত্যাচার করছে, নদী প্রবাহের গতিকে যেভাবে রুদ্ধ করছে, নদীর জলকে যেভাবে কলুষিত করছে, তাতে পবিত্র নদী গঙ্গা - যমুনার অবশিষ্ট জল আজ চূড়ান্ত দূষিত, বিষাক্ত বর্জ্যপূর্ণ এবং গ্রহণের অযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পবিত্রতার নামে সেই জল পান, ব্যবহার ও সেই জলে স্নান চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, বিভিন্ন পরিবেশ সংগঠন এবং পরিবেশবিদরা বারবার সতর্ক করলেও কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টিকে ক্রমাগত অবহেলা করে চলেছে। উত্তর প্রদেশের যোগী সরকারও কুম্ভ নিয়ে তাদের ধর্মীয় - রাজনীতি ও ধর্মীয় ব্যাবসার কারণে কুম্ভের জল দূষণ নিয়ে দূষণ পর্ষদের রিপোর্ট ও সুপারিশগুলি চেপে রেখেছিল। বাস্তবিক কুম্ভে স্নান করলে বর্তমানে অমৃতের পরিবর্তে কালকূট পাওয়ার সম্ভবনা বেশি। হতে পারে নানারকম চর্ম ও পেটের রোগ এবং সংক্রমণ। এছাড়াও প্রথমে উত্তরাখণ্ডে গঙ্গা-যমুনা এবং তাদের শাখানদীগুলিতে বাঁধ দিয়ে; সমতলে গঙ্গার উপর হরিদ্বার, নারোরা, বিজনৌর ও কানপুরে এবং যমুনার উপর হাতনিকুন্ড, ওয়াজিরাবাদ ও ওখলায় ব্যারাজ দিয়ে; অসংখ্য ব্রিজ নির্মাণ করে ও নদী দুটির দু'পাড়ে অজস্র সেচের খাল কেটে নিয়ে ভারতীয় সভ্যতার প্রধান ধারক - বাহক এই নদী দুটিকে ক্ষতবিক্ষত করে তাদের প্রবাহকে স্তিমিত এবং নাব্যতাকে অগভীর করে দেওয়া হয়েছে। তাই প্রয়াগরাজেও দেখা যাবে নদী খাতের পরিবর্তন এবং চর পড়ে যাওয়া।

কুম্ভ ও হিন্দুত্ব: প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যাযাবর আর্যরা খাদ্য ও নিরাপদ বাসস্থানের সন্ধানে যখন মধ্য এশিয়া থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে তখন সিন্ধু উপত্যকা সহ বিস্তৃত অঞ্চলে সাত হাজার বছরের এক প্রাচীন সভ্যতা বিদ্যমান। তারও প্রাচীন বর্তমান বালুচিস্তান অঞ্চলের মেহেরগড় সভ্যতা। আরও অনেক অনেক প্রাচীন পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের জনজাতি এবং দ্রাবিড় সভ্যতা। অনার্য সিন্ধু ও জনজাতি সভ্যতা আর্যদের থেকে অনেক উন্নত হলেও উন্নত সমর কৌশল এবং অশ্বারোহী সৈন্যের ব্যবহারে

আর্যরা সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস করে জনজাতিদের আরাবল্লি, বিন্ধ্যের পাহাড় অরণ্যের দিকে হটিয়ে দেয়। এরপর প্রথমে তারা বর্তমান দুই পাঞ্জাবের পঞ্চনদ উপত্যকায় থিতু হয় এবং ক্রমশ পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে প্রসার ঘটায়। এই পর্বে আর্য এবং বিভিন্ন অনার্য জাতির মধ্যে যেমন সংঘর্ষ হয় তেমনই তাদের মধ্যে মিশ্রণ ঘটে চলে ভারতীয়রা এক সংকর জাতিতে (Mixed Race) পরিণত হয়। এই সময়কার তাদের বিশ্ববীক্ষা বা আদি দর্শন চর্চা প্রকৃতির উপাসনা ও সরল নিবেদন এবং সেইসঙ্গে অজানা শক্তিগুলির রহস্য সন্ধান। আদি ঋক বেদের সময়। সমাজ শৃঙ্খলিত নয়, তবে গোষ্ঠী কেন্দ্রিক। নারী অনেক স্বাধীন। সমস্ত সম্পদ গোষ্ঠীর। এরপর একে একে এল অন্যান্য বেদ ও বেদান্ত। মেধাতিথি গৌতমের 'ন্যায়', কণাদের 'বৈশেষিক', কপিলের 'সাংখ্য', পতঞ্জলির 'যোগ', জৈমিনির 'পূর্ব মীমাংসা' এবং বদ্রায়নের 'উত্তর মীমাংসা' - শক্তিশালী ষড়দর্শন। দর্শনের জগতও বস্তুবাদী (Materialistic)। তার সঙ্গে বেদের পদ্য নিয়ে 'সংহিতা', গদ্য নিয়ে 'ব্রাহ্মণ', অরণ্য সংক্রান্ত 'আরণ্যক', বেদের সারসংকলন 'উপনিষদ'। তখন ধর্মের উৎপত্তি হয়নি। আর এর আগে থেকে, সেই সময় এবং পরে জনজাতিদের মধ্যে ছিল অনৈতিকতাবাদী (Amoralist), নিয়তিবাদী (Fatalist), শাশ্বতবাদী (Eternalist), অজ্ঞেয়বাদী (Agonist) এবং যুক্তিবাদী (Rationalist) দর্শন অনুশীলনকারী আজীবক, তপস্বী ও চার্বাক সম্প্রদায়।

নদী হ্রদের মিষ্টি জল সহ অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, উর্বর আদিগন্ত উপত্যকা, মনোরম জলবায়ু, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, কৃষি পদ্ধতি আবিষ্কার, ধাতুর সরঞ্জামের ব্যবহার এবং সব মিলিয়ে উৎপাদিকা শক্তির ব্যাপক বিকাশ ঘটে এবং ভূ, কৃষি, ধাতু, গাভী, স্ত্রী (বিজিত গোষ্ঠীর নারীদের দখল সহ) এবং দাস সম্পদের অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি হয়। সেগুলি ভোগ দখলে রাখতে, কষ্টকর শ্রম থেকে অব্যহতি পেতে এবং মৃত্যুর পর দখল করা সম্পদ পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে প্রবাহিত করতে উৎপত্তি হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পিতৃতান্ত্রিক পরিবার, সামাজিক বিধিনিষেধ এবং বর্ণাশ্রম প্রথা। ব্রাহ্মণ কেন্দ্রিক জাত ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে অঞ্চলের সম্পদের উপর কর্তৃত্বের জন্য সৃষ্টি হল রাজতন্ত্র। এবার এই ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও ক্ষত্রিয় রাজারা তাদের স্বার্থ ও শ্রেষ্ঠত্বকে চিরস্থায়ী করতে 'ব্রহ্মসুত্র' এবং যাজ্ঞবল্ক্য, মনু প্রমুখের তাদের সহায়ক বিধানগুলি নিয়ে তৈরি করলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম। যার নিগড়ে বেঁধে ফেলা হল সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ক্রিয়াকলাপে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পরবর্তী সময়ে দুটি শক্তিশালী দর্শন - (১) নিরীশ্বর ও বহুত্ববাদী জৈন এবং (২) অনিত্য, অনাত্মা ও অভৌতিকবাদী বৌদ্ধ, বিশেষত বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হন। বৌদ্ধ দর্শন জম্বুদ্বীপের বাইরেও বহু দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

সিন্ধু নদের পশ্চিমপাড়ের অধিবাসীরা সিন্ধকে হিন্দ্ উচ্চারণ করত। সেখান থেকে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি ধরা হয়। হিন্দু কোন একমুখী দর্শন নয়। মানবতাপ্রেমী, উদারপন্থী বহু দার্শনিক ধারার সমাহার। তাদের কেউ ঈশ্বরবিশ্বাসী, কেউ ঈশ্বরবিশ্বাসী নন, কেউবা ঈশ্বরউদাসীন। তাদের কেউ পৌত্তলিক, কেউ নন, আবার কেউ একেশ্বরবাদী। কেউ শৈব, কেউ শাক্ত, কেউ বৈষ্ণব, কেউবা মাতৃসাধক। কেউ গৃহী, কেউ সন্ন্যাসী। বহুরূপী ভারতীয় দর্শন এবং প্রকৃতি ও মানবপ্রেমী ভক্তিরসে সিঞ্চিত সনাতনী দর্শনের সঙ্গে জাতপাত ও নিয়মতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদের সম্পর্ক নেই। সংঘ পরিবার এই আগ্রাসী জনবিরোধী ব্রাহ্মণ্যবাদকেই হিন্দুত্ব বলে চালাতে চাইছে। প্রাচীনকালে প্রয়াগ সহ বহু স্থানে মানুষের মিলন মেলা ছিল। সেখানকার জল ও জীবন প্রদানকারী স্বচ্ছতোয়া নদীগুলি মানুষের কাছে ছিল অতি পবিত্র। মানুষ সেখানে স্বেচ্ছায় অংশ নিয়ে স্নিগ্ধ, ঋদ্ধ এবং সমৃদ্ধ হত। কোন রাষ্ট্রীয় প্রচারে জীবন হাতে নিয়ে পশুর মত যেতে হত না। হত না মেলা বা স্নান নিয়ে ধর্মীয় রাজনীতি, ভোটের মহড়া কিংবা কর্পোরেট ব্যবসা।

কুম্ভ ও বাণিজ্য : যোগী আদিত্যনাথ কুম্ভের তাৎক্ষণিক বাণিজ্যের যে ফিরিস্তি দিয়েছেন সেটি এরকম—তিন লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে। হোটেল ব্যবসা ৪০ হাজার কোটি, খাবার ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে ব্যবসা ৩৩ হাজার কোটি, পরিবহন ব্যবসা দেড় লক্ষ কোটি, পুজো দেওয়া ও পুজোর সামগ্রী নিয়ে ব্যবসার ২০ হাজার কোটি, অনুদান ৬৬০ কোটি, টোল ট্যাক্স বাবদ ৩০০ কোটি এবং অন্যান্য ব্যবসা থেকে ৬৬ হাজার কোটি টাকা আয় হয়েছে। একটি মাঝি পরিবারই নাকি ৩০ কোটি টাকা আয় করেছে। এর কতটা সত্য, আর কতটা অতিশয়োক্তি জানার উপায় নেই। তবে ব্যবসা যে ভালই জমেছে বলাইবাহুল্য। আর সবচাইতে বেশি জমেছে ধর্মীয় রাজনীতির ব্যবসা।

অ্যাসিড হামলায় ক্ষতিপূরণ (সূত্র: স্টেট লিগাল সার্ভিস অথরিটি)

- ন্যূনতম ক্ষতিপূরণ তিন লক্ষ টাকা
- ১৮ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে ৫০% বেশি
- অ্যাসিড হামলার এক মাসের মধ্যে এক লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে
- মুখ বিকৃতি হলে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ
- আক্রান্তদের চাকরি অথবা পেনশন প্রকল্প

সহায়তা: ব্রেভ সোল ফাউণ্ডেশন (০৯৬৫৪২৪০০৫৭), (https://bravesoulsfoundation.org)

ওয়াকফ সংশোধনী আইন—বিভাজনই লক্ষ্য

অনুপম কাঞ্জিলাল

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিজেপি এদেশে ক্রমাগত হিন্দু মুসলমানের বিভাজনকেই যে পাখির চোখ করে তুলেছে, তা বুঝতে কোন তাত্ত্বিক বোধ লাগে না, সাধারণ পরিসংখ্যানের দিকে চোখ রাখলেই তা পরিষ্কার হয়ে যায়। তিন তালাক রোধ দিয়ে শুরু হয়ে, কাশ্মীরে এক তরফা ৩৭০ ধারা তুলে নেওয়া, এখন ওয়াকফ সংশোধনী আইন, সব কিছুর পশ্চাতেই ওই এক লক্ষ্য নির্দিষ্ট, হিন্দু মুসলমান বিভাজনের ধারাটা অক্ষুণ্ণ রাখা। বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম-মন্দির নির্মাণ এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনা। আর বাবরি মসজিদ প্রসঙ্গ এলেই, বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা লালকৃষ্ণ আডবানির কথা মনে পড়ে, রাম-মন্দির নির্মাণের ইস্যুকে গোটা দেশজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার অন্যতম কারিগর, এই মানুষটি একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, এক ইস্যুতে বার বার নির্বাচনী সাফল্য আসে না। বর্ষীয়ান এই নেতার কথাকে গুরুত্ব দিয়েই তাঁর দলের অন্যান্য নেতা-নেত্রীরা, মুসলিম-বিভাজনের লক্ষ্য স্থির রেখে, ইস্যু পাল্টে যাচ্ছেন বার বার। তিন তালাকের পড়েই কাশ্মীর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া, তার সঙ্গে রাম মন্দির নির্মাণ আর এখন ওয়াকফ সংশোধনী আইন। বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় ইস্যু পাল্টে গেলেও লক্ষ্যটা স্থির। ধারাবাহিকভাবে হিন্দু মুসলমানের বিভাজনকে টেনে নিয়ে চলা।

নতুন ওয়াকফ আইন নিয়ে বিক্ষোভ

ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে এই আইন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে। ওয়াকফ সম্পত্তি নাকি এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী করায়ত্ত করে রেখেছেন তাদের থেকে তা উদ্ধার করে সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের উপকারে লাগানোর জন্যই নাকি এই আইন। আসলে এটা একটা প্রচারের মোড়ক। এর আগে তিন তালাক রোধের সময়ও এমন একটা প্রচারের মোড়ক ছিল। ভেবে, দেখুন সে সময়ও বলা হয়েছিল মুসলিম মহিলাদের স্বার্থেই এই ব্যবস্থা। অথচ মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই তালাক বিষয়টি কীভাবে কার্যকর হয়, নারী-পুরুষের মধ্যে তালাকের ভূমিকা কি, তার সামগ্রিক আলোচনা সামনেই আনা হয়নি। অনেকেই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত না হয়েই, সরকারের পক্ষে সায় দিয়েছেন। আইন কিংবা রীতির অপপ্রয়োগ সব জায়গাতেই হয়, তার জন্য নির্দিষ্ট একটি ধর্মকে টার্গেট করাটা সমীচীন কি?

ওয়াকফ বিষয়ে আলোচনায়, প্রথমেই জেনে নেওয়া দরকার ওয়াকফ সম্পত্তি কাকে বলে? ওয়াকফ সম্পত্তি হল মূলত ধনবান মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ যে সম্পত্তি পেছিয়ে পড়া গরীব, অনুন্নত মানুষের জন্য দান করেন। মুসলিম ধর্ম যারা অনুশীলন করেন, তাঁরা নিজেদের বেশি ধন সম্পত্তি থাকলে, তা ভাল কাজের জন্য দানের রীতি মানেন। সেই রীতি অনুযায়ী, ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিল এই সম্পত্তি রক্ষণাবক্ষণের দায়িত্বে থাকেন।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনেরাই এই বোর্ড ও কাউন্সিলের সদস্য হন। দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা এই রীতি, তাই ওয়াকফ সম্পত্তির পরিমাণ অনেক। মুসলিম সম্প্রদায়ের পেছিয়ে পড়া মানুষজনদের এই সম্পত্তি দিয়ে সাহায্য করাটা নিয়ম। ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিলে যে কোন ধর্মনিষ্ঠ মানুষই সম্পত্তি দান করতে পারেন, এটাও স্বীকৃত, এবং ওয়াকফ সম্পত্তি দিয়ে ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিল যে কোন ব্যক্তি, তিনি যদি দুরবস্থার মধ্যে পড়েন, তাকে সাহায্য করতে পারবে। অর্থাৎ বোঝা দরকার ধর্মীয় অনুসঙ্গ থাকলেও এই ওয়াকফ সম্পত্তি পেছিয়ে পড়া, আর্থিক দুরবস্থায় থাকা মানুষজনদের সাহায্য করার লক্ষ্য নিয়েই গচ্ছিত রাখা হয়।

ভারতীয় সংবিধান যেহেতু সব ধর্মের মানুষের ধর্মাচারণ রীতিকে মান্যতা দেয়, সেই রীতি মেনে ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিল ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে আসছিল। তবে এই সম্পত্তির ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন ওঠা শুরু হয় অনেক আগেই, বিভিন্ন ভাবে সম্পত্তি, বিশেষ করে, স্থাবর-সম্পত্তি ভোগ-দখল করার ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল, সেই কারণেই এই সম্পত্তি যাতে যথার্থভাবে ব্যবহৃত হতে পারে সেই লক্ষ্যে, ১৯৯৫ সালে ওয়াকফ আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইন দ্বারাই ওয়াকফ সম্পত্তি বিষয়ে কোন অনিয়মের অভিযোগ উঠলে, তার মীমাংসা করা সম্ভব বলে, জানাচ্ছেন, এদেশের অভিজ্ঞ-আইন বিশারদরা।

যে অজুহাতে নতুন আইন আনা হচ্ছে, তা আদৌ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসক দলের লক্ষ্য অন্য, তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে বুঝিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর যে তারা এদেশে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। সেই লক্ষ্যেই এই নতুন সংশোধনী। যা অনিবার্যভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশের মানুষকে আর্থিকভাবে দুর্বল করবে।

নতুন আইনে বলা হয়েছে, ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিলে ছ'জন করে অ-মুসলিম সদস্য থাকবেন। এখন প্রশ্ন ধর্মীয় এক সংস্থায় অন্য ধর্মের সদস্য রাখার নিদান কেন? বলা হচ্ছে এর ফলে স্বচ্ছতা আসবে। প্রশ্ন উঠবে না কেন যে কোন মন্দির সংশ্লিষ্ট কমিটি বা

ট্রাস্টের মধ্যে তবে কি মুসলিম-সদস্য থাকাটাও যুক্তিসিদ্ধ হয়ে ওঠে না? ওয়াকফ সম্পত্তি নির্ধারণে কোন বিতর্ক উঠলে, জেলা প্রশাসনের আধিকারিক সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী, নতুন আইন অনুসারে। প্রশ্ন বহু বছরের পুরোনো জমি-জায়গা নিয়ে বিতর্ক তো থাকবেই, সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের প্রধান আধিকারিক সিদ্ধান্ত নিলে, তিনি তো সরকারের পক্ষই নেবেন। বলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আদালতে বিচারের আবেদন জানানো যাবে! এখানেও প্রশ্ন অনেক বছরের পুরোনো জায়গা জমির কাগজপত্র না দেখাতে পারলে, আদালত তো সেটা সরকারের বলেই রায় দেবে। অর্থাৎ প্রথা অনুযায়ী ব্যবহারের রীতিকে একেবারে বাতিল করে দেওয়া হল। ওয়াকফ এ্যাজ ইউজার বা ব্যবহারিক রীতি বাতিল হওয়ায় দীর্ঘদিনের সম্পত্তি ওয়াকফ বোর্ডের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার রাস্তা প্রশস্ত হল। এটাই মূল লক্ষ্য বর্তমান শাসকের, যে কোন উপায়ে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ জারি করা। এদেশের স্বাধীন ধর্মাচারণের যে সাংবিধানিক রীতি তাকে লঙ্ঘণ করেই এই আইন আনা হয়েছে। আইনজীবীদের একটা বড় অংশই মনে করছেন, সুপ্রিম কোর্টে এই সংশোধনী একটা বড় ধাক্কা খাবে।

ইতিমধ্যে এই সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিলে অ-মুসলিম সদস্য রক্ষার বিষয়ে সরকারের কাছে, ব্যাখ্যা চেয়েছে। সম্পত্তি হস্তগত করার বিষয়ে, জেলা প্রশাসনের অধিকারের উপর স্থগিতাদেশও জারি হয়েছে। তবে বর্তমানে সরকার ও তার অনুগতরা যেভাবে কোর্টের উপর চাপ তৈরি করছে, যেভাবে সুপ্রিম কোর্টকেও তাদের প্রতিপক্ষ বলে চিহ্নিত করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে, তাতে শেষ পর্যন্ত কী হবে তা নিয়ে সংশয় থাকা খুব স্বাভাবিক। তবে এখন সব বিতর্কের উর্দ্ধে, এই সিদ্ধান্তটা অমোঘ যে, হিন্দু-মুসলমান বিভাজনের আবহ বজায় রাখতেই, এই ওয়াকফ সংশোধনী আইনটি হাতিয়ার করেছে কেন্দ্রীয় শাসক দল।

কাশ্মীর: ভূস্বর্গ যখন কাঁটার মুকুট

সরফরাজ বুখারি

অপরূপ নিসর্গের জন্য খ্যাত ভূস্বর্গ কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদী হানা, ক্ষয়ক্ষতি এবং হত্যালীলা নতুন কিছু নয়। অতীতেও ছিল, বিগত ৩৬ বছর এর বাড়বাড়ন্ত। কিন্তু ২০১৯ থেকে কেন্দ্রের অধীনে পাঁচ স্তর নিরাপত্তার চাদরে মোড়া, ২০২৪ এ নির্বাচনের মাধ্যমে বিধানসভা ও সরকার গঠনের পর এবং কেন্দ্র সরকারের প্রচারের ফলে বাকি ভারতের ধারণা হয়েছিল কাশ্মীর স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তাই গত বছরের মত এবছরও পর্যটকদের ঢল নেমেছিল কাশ্মীর উপত্যকা এবং লাদাখ মালভূমিতে। শ্রীনগর, সোনমার্গ, গুলমার্গ ইত্যাদি অঞ্চল ঘুরে হাজারে হাজারে তারা আসছিলেন দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার নয়নাভিরাম লিডার নদী - উপত্যকা সংলগ্ন পাহালগাঁওতে। সেখান থেকে তাদের অনেকে যাচ্ছিলেন মাত্র ছয় কিলোমিটার দূরে তুষারশুভ্র শৃঙ্গরাজি এবং ঘন সবুজ পাইন বনের পটভূমিকায় সবুজ ঘাসের গালিচায় ঢাকা প্রসিদ্ধ কাশ্মীরি বুগিয়াল বৈসারণ উপত্যকাকে দেখতে। তারা ঘুণাক্ষরে ভাবতে পারেননি রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে যথাক্রমে ১৫০ ও ২০০ কিমি অভ্যন্তরে এরকম নিরিবিলি প্রান্তরে সন্ত্রাসবাদী ঘাতকবৃন্দ অপেক্ষারত। গত ২২ এপ্রিল 'রেজিস্ট্যান্স ফোর্স (TRF)' নামে লস্কর-ই-তইবা (LeT) র ছায়া কাশ্মীরি জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা অমুসলমান বেছে বেছে অন্য রাজ্য থেকে আসা ২৪ জন হিন্দু ও একজন খ্রিস্টান নিরপরাধ পর্যটক এবং বাধা দেওয়ায় একজন কাশ্মীরি মুসলমান সহিসকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিল।

এই ভয়ঙ্কর ও বিকারময় ঘটনায় সারা দেশ শোকে যেমন মুহ্যমান এবং তেমনই ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পর্যটকদের নিরাপত্তা দিতে এবং অপরাধীদের তৎক্ষণাৎ তো নয়ই, দীর্ঘ সময় পরেও ধরতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ কেন্দ্র সরকার নিজেদের ভুল ও দায় স্বীকার না করে এবং কোন তদন্ত শুরু হওয়ার আগেই পাকিস্তানের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে এবং সর্বস্তরে উগ্রজাতীয়তাবাদ ছড়িয়ে নিজেদের আড়াল করার চেষ্টা করল। আর সরকার কর্তৃক উত্তাপ ছড়ানোর ফলে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে দুই পরস্পর বৈরী প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্টি হল প্রবল উত্তেজনা, সংঘর্ষময় পরিস্থিতি এবং পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা। যদিও ৭ থেকে ১০ মে ঘটে যাওয়া চারদিনের ধ্বংসাত্মক 'অপারেশন সিদুর ও বনিয়ান' এর মধ্যে দিয়ে বিষয়টির গভীরে প্রবেশের আগে আমরা বানিহাল টানেল ধরে কাশ্মীরের জটিল ও অনন্য ভূ - রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটা সংক্ষেপে একবার ঝালিয়ে নেই।

কাশ্মীরিয়াত ও ইনসানিয়াত এর জন্ম : বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান কাশ্মীরের উল্লেখ আছে। অতীতে কারকাটা, উতপলা, লহরা প্রমুখ হিন্দু রাজবংশ বর্তমান কাশ্মীরে রাজত্ব করত। যার মধ্যে রাজা ললিতাদিত্য, অবন্তীবর্মণ কিংবা রানি দিদ্দা, কোটা রানি প্রমুখ খ্যাতিমান। এই সময় থেকেই গান্ধার ও কাশ্মীরে উদারপন্থী শৈব ভক্তি আন্দোলনের এবং কাশ্মীরিয়াতের সূত্রপাত। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে চার্বাকপন্থীদের মত তাঁরা বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী ছিলেন, বেদ মানতেন না, জাতিভেদ মানতেন না, তাঁদের কাছে সব মানুষ সমান ছিলেন। তাঁরা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথা বলতেন। তাঁদের ৬৪ টি অগমিক প্রথা ছিল। এরপর হল বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার যা মৌর্য এবং কুশান দের সময় খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিল। সম্রাট কণিষ্কর সময় কাশ্মীরে তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন হয়। কলহন, অস্ব ঘোষ থেকে দ্রিধিবালা, সিতিকান্ত দর্শন, শিল্প, সাহিত্যেও কাশ্মীরকে শীর্ষে পৌঁছে

দেন। রেশম পথে যাতায়াত ও বাণিজ্য ছিল তিব্বত, চিন, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে।

সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য, কম্বোজ, সিন্ধ এবং ভারতভূমিতে ইসলামের বিজয়ের পর্বে কাশ্মীরেও ইসলামের প্রবেশ। ১৩৩৯ এ শাহ মীর প্রথম কাশ্মীরের সুলতান হন। সেই সময় থেকে ধর্মান্তরের শুরু। অন্য জায়গাগুলির মত তিনভাবেঃ (১) বলপূর্বক, (২) উচ্চবর্ণের সামন্তপ্রভু, মহাজন ও পুরোহিত দের শোষণ ও অত্যাচারে জর্জরিত দরিদ্র কৃষক, কারিগর ও শ্রমজীবীদের সমতাভিত্তিক ও সরল নতুন ধর্মে প্রবেশ এবং (৩) সুফি তারিকা ও খানকা গুলির প্রভাব। সেইসময় থেকে উচ্চবর্ণের রাজা ও সামন্তপ্রভুদের শাসন ও শোষণে সর্বস্বান্ত হতদরিদ্র কাশ্মীরি ভূমিদাসরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ১৫৮৬ - ১৭৫১ অবধি ছিল মুঘল শাসন। কাশ্মীর জাহাঙ্গীরের ছিল খুব পছন্দের। মুঘল শাসকরা কৃষির জন্য জলসেচের ব্যবস্থা এবং বেশ কিছু উদ্যান নির্মাণ করেন। চাক বিদ্রোহীরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে ব্যর্থ হন। এরপর আফগান দুরানি রা ১৮১৯ অবধি শাসন করেন। মুঘল যুগে স্থিতাবস্থা বজায় থাকলেও আফগানদের সময়কার অরাজকতা এবং হিন্দুদের উপর অত্যাচার অনেক হিন্দুকে কাশ্মীরছাড়া করে।

কাশ্মীর উপত্যকা

এতসবের মধ্যেও প্রসিদ্ধ কাশ্মীরি শৈব ধারা স্বগর্বে বিরাজ করছিল। যার একজন প্রধান যোগিন ও সন্ত কবি ছিলেন লাল্লেশ্বরী অথবা লাল দেব। তাঁর রচিত প্রায় ৩০০ জনপ্রিয় কাব্য বা 'বখ' বা 'বাতসুন' এর সন্ধান পাওয়া যায়। এর পাশাপাশি মুসলমান ভক্তি সাধকরা ঋষি আন্দোলন গড়ে তোলেন। মধ্য যুগের উদারতাবাদী ভক্তি ও সুফি আন্দোলনের প্রভাবে মানবতাবাদী সৌভ্রাতৃত্বের কাশ্মীরিয়াত ও ইনসানিয়াত দৃঢ়বদ্ধ হয়। এর মহান প্রচারকরা ছিলেন হাব্বা খাতুন, রূপা ভবানী, আরনিমল, মামুদ গামি, রসুল মির, পরমানন্দ প্রমুখ।

খালসা থেকে ব্রিটিশ : শক্তিশালী শিখ নৃপতি মহারাজা রঞ্জিত সিংহ লাহোর, মুলতান, পেশোয়ারের পর ১৮১৯ এ কাশ্মীর দখল করে নেন। শিখ সাম্রাজ্যে প্রজাদের উপর নিপীড়ন বাড়ে। শিখ ও বর্ণহিন্দু জায়গিররা কৃষকদের রক্তচুষে আরও সম্পদশালী হয়ে ওঠেন। মুসলমানদের উপর দমন পীড়ন চলে। গোহত্যায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। রঞ্জিত সিংহের মৃত্যুর পর ব্রিটিশরা ১৮৪৬ এ শিখদের পরাজিত করে সাত বছরের বালক রাজা দলীপ সিংহের সঙ্গে অপমানজনক লাহোর চুক্তি করে এবং জম্বুর সুযোগসন্ধানী ডোগরি রাজা গুলাব সিংহের সঙ্গে অমৃতসরের চুক্তি করে বিভিন্ন সুবিধা ও সমর্থনের বিনিময়ে তাকে কাশ্মীরের সিংহাসনে বসায়। ব্রিটিশ সহযোগী গুলাব সিংহ ১৮৫৭ এর মহাবিদ্রোহে ব্রিটিশের পাশে দাঁড়ান। তাঁর চতুর্থ প্রজন্মের উত্তরাধিকারী হরি সিংহ ১৯২১ এ কাশ্মীরের রাজা হন।

ওয়াল্টার লরেন্স, টিন্ডেল বিস্কাও, প্রেমনাথ বাজাজ, গয়াশলাল কল, রবার্ট ডাল, অ্যালস্টেয়ার ল্যাম্ব, ইশাক খান, রিতা মানচন্দা প্রমুখ কাশ্মীর বিষয়ক মিশনারি, ভূপর্যটক, লেখক, বিশেষজ্ঞ প্রমুখের প্রতিবেদনগুলি থেকে জানা যায় রাজতন্ত্রের অনুগত বর্ণহিন্দু অনুপস্থিত ভূস্বামী এবং তাদের দালালদের অত্যাচারে বেগার খাটা হতদরিদ্র মুসলমান ভূমিহীন কৃষি মজুররা নীরবে খেটে যেত (Dumb Driven Cattle)। অমলিন পোশাকে ঘিঞ্জি নোংরা মহল্লাগুলিতে বাস করত। তারা নিরক্ষর ছিল। তাদের দেখার কেউ ছিলনা। কিছু কাশ্মীরি যুবক বাইরে থেকে শিক্ষিত হয়ে এসে ১৯৩০ নাগাদ 'রিডিং রুম এসোসিয়েশন' এবং 'ইয়ং মেন মুসলিম এসোসিয়েশন' গড়ে তোলেন। তাঁদের নেতা ছিলেন জম্বু, লাহোর ও আলিগড় থেকে উচ্চশিক্ষা করে আসা স্কুল শিক্ষক শেখ আবদুল্লা। ১৯৩১ এ তাঁরা কৃষকদের দাবি নিয়ে রাজাকে অভিযোগপত্র জমা দিতে গেলে পুলিশ সমাবেশে গুলি চালিয়ে ২১ জনকে হত্যা করে। অত্যাচারী ডোগরি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই প্রথম সাধারণ মানুষ গর্জে ওঠেন। শ্রীনগরের মাইসুমা বাজারের মহিলারা প্রতিবাদ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন যাদের আবার একই ভুমিকায় দেখা যায় ১৯৮৯ এর ইন্তিফিদায়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৩২ এ শেখ আবদুল্লা, ইউসুফ শাহ ও গুলাম আব্বাসের নেতৃত্বে 'অল জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্স (AJ&KMC)' গড়ে উঠে ভূমি সংস্কারের দাবিতে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলে।

তার সময়ে কৃষক বিদ্রোহ এবং 'ডোগরি রাজা হটো' আন্দোলন চলায় রাজা হরি সিংহ বাঙ্গালি মন্ত্রী এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি লালগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রজারঞ্জক সংবিধান প্রবর্তন এবং চতুর্থ পত্নী তারা দেবী সাহেবার প্রভাবে কিছু শাসন সংস্কার করতে বাধ্য হন। হরি সিংহ লন্ডনের গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত থেকে ভারতীয় রাজ্যগুলির কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব দেন।

ভূস্বর্গের প্রতি শ্যেন দৃষ্টি : প্রায় ২,২৪,৭৩৯ বর্গ কিলোমিটার চারিদিকে স্থলবেষ্টিত স্বাধীন পাহাড়ি রাজ্য কাশ্মীর ভূ রাজনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উত্তর - পশ্চিম থেকে দক্ষিণ - পূর্ব আড়াআড়ি চলে যাওয়া পশ্চিম হিমালয় এবং তাকে চিরে বিবিধ উপনদী সমেত পশ্চিম প্রবাহিনী সিন্ধ, ঝিলাম আর চেনাব নদী ও তাদের উপত্যকা, গিরিবর্ত্ম, সবুজ বনানী; পশ্চিমে তুষারাবৃত পীরপাঞ্জাল থেকে দক্ষিণে অন্তরহিমালয় ও ধউলাধর পর্বত বেষ্টিত এই বিচ্ছিন্ন, জনবিরল, শান্তিপূর্ণ রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে ছিল আফগানিস্তান ও তাজিকিস্তান সহ কারাকোরাম, হিন্দুকুশ ও পামির পর্বত শ্রেণী। পশ্চিমে পাস্তুন সহ উপজাতি প্রধান ব্রিটিশ ভারতের

'উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ' এবং দক্ষিণে পাঞ্জাব। উত্তর ও পুবে অল্পকিছু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তিব্বতী ও শিয়া মুসলমান জনজাতি বাস করা লাদাখ মালভূমি যার উত্তরে সালতর সহ একের পর এক তুষারাবৃত শৈলশিরা চিরে পূর্ববাহিনী নুব্রা, শায়ক ও জাস্কর নদী। তার উত্তর পূর্বে কুয়েনলুন পর্বত ও চিন। পূবে তিব্বত। সেই কারণে ব্রিটিশ, চিন, আফগানিস্তান সবার দৃষ্টি ছিল এই সীমান্তবর্তী রাজ্যের প্রতি। অন্যদিকে ব্রিটিশের সমর্থন পেয়ে উপমহাদেশে বেড়ে ওঠা বিবাদমান দুই নেতা নেহরু ও জিন্নার অভিলাষ ছিল কাশ্মীর উপত্যকাকে তাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করা।

কাশ্মীরি পণ্ডিত নেহরুর প্রপিতামহ রাজ কাউল কাশ্মীর থেকে দিল্লিতে আসেন। ব্রিটিশের সঙ্গে দেশ ভাগাভাগির বৈঠকে উভয়েই কাশ্মীরকে দাবি করেন। সেই থেকে কাশ্মীর উচ্চাকাঙ্খী ভারতীয় ও পাক শাসকদের কাছে যথাক্রমে 'অটুট অঙ্গ' (Integral Part) এবং 'শাহ রগ' (Jugular Vein)। ১৯৪১ এ ব্রিটিশ সরকার যে সেন্সাস করিয়েছিল তাতে জম্বু ও কাশ্মীরের ৩৯.৪৫ লক্ষ অধিবাসী। যার মধ্যে মুসলমান ধর্মাবলম্বী ৭৫.৯৭%, হিন্দু ২০.৪৮%, বৌদ্ধ ২.১৬%, শিখ ১.৩৯% ছিলেন। কাশ্মীরি মুসলমানদের মধ্যে বেশি ছিলেন সুন্নি ধারার। কাশ্মীরি হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কাশ্মীরি পণ্ডিত, রাজপুত, ক্ষত্রী এবং ঠক্কর। কাশ্মীর উপত্যকার তুলনায় জম্বুর জনঘনত্ব বেশি ছিল। সেখানকার পাহাড়ি অঞ্চলে শিয়া মুসলমান পশুপালক গুজ্জর, বাকেরওয়াল ও ধর্মান্তরিত রাজপুতরা এবং সমতলে শিক্ষা ও অর্থনীতিতে তুলনামূলক এগিয়ে থাকা হিন্দু আর শিখরা প্রধানত বাস করতেন।

পাহেলগাঁও

ঘটনাবহুল চল্লিশের দশক : সেই সময় পৃথিবী জুড়েই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ঘনঘটা। ভারতে তার প্রভাব সহ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা। স্বাধীনতা সংগ্রাম জোরালো হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে ভারত ছাড়ো আন্দোলন। এছাড়াও তেভাগা, তেলেঙ্গানা, কায়ুর, পুন্নাপ্রা ভায়লার প্রভৃতি জায়গায় কৃষক সংগ্রাম; সাতারার প্রতি সরকার; আজাদ হিন্দ বাহিনীর বর্মার জঙ্গল পাহাড় ভেদ করে মণিপুর - নাগাল্যান্ডে আগমন; নৌ বিদ্রোহ। আবার এগুলিকে প্রতিহত করতে ব্রিটিশ পরিকল্পনায়, মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার সক্রিয় সহায়তায় এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের নীরব প্রশ্রয়ে একের পর এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রক্তবন্যা। এর সঙ্গে ব্রিটিশ ও ইস্পাহানি সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। বহু প্রাণহানী। এইসব ঘটনার প্রভাব সুদূর উত্তরের পাহাড় ঘেরা ঠাণ্ডা আবহাওয়ার গরীব কৃষিজীবী ও পশুপালক অধ্যুষিত এই রাজ্যের জনজীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারল না। তবে এই আন্দোলনগুলির প্রভাবে 'ন্যাশনাল কনফারেন্স (NC)' শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে রাজতন্ত্র বিরোধী 'কুইট কাশ্মীর' রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ভূমি সংস্কার নিয়ে জোরালো কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলল। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ এ AJ&KMC NC হয়েছে এবং গুলাম আব্বাস গোষ্ঠী বেরিয়ে গিয়ে মুসলিম কনফারেন্স (MC) তৈরি করে মুসলিম লীগে যুক্ত হয়। পরে তাদের একাংশ 'জম্বু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (JKLF) গঠন করে 'আজাদ কাশ্মীরের' দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। অন্যদিকে NC, কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (CPI) এবং কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির (CSP) কর্মসূচিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৪৪ এ 'নিউ কাশ্মীর ম্যানিফেস্টো' প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও মুনাফা বজায় রেখে বিশাল ভারতীয় উপনিবেশকে ছেড়ে যাওয়া মনস্থ করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা। একইসঙ্গে ভারতীয়দের ঐক্য চিরতরে ধ্বংস করতে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও দাঙ্গা ঘটিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্র বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ এবং দেশটিকে তিন টুকরো করে সহযোগী কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্রিটিশ উপনিবেশ সরকার কর্তৃক সহযোগী - জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা; রাজা, জমিদার, সামন্তপ্রভু এবং বিড়লা, ঠাকুরদাস, ইস্পাহানি, হাজি দাউদজী প্রমুখ বড় ব্যবসায়ীদের সহায়তায় দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে টুকরো করে ১৫ ও ১৬ আগস্ট ১৯৪৭ এ জন্ম দেওয়া হয় জন্মবৈরী দুটি দেশ - ভারত ও পাকিস্তান। এতদিন অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজে লাগালেও জিন্নার ভাগ্যে জোটে তার ভাষায় পোকায় খাওয়া পাকিস্তান। বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকা কাশ্মীর বাদে ৫৬৫ টি করদ রাজ্যের (সমগ্র ভারত ভূখণ্ডের ৪৫%) মধ্যে হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড় বাদে বাকিরা ভারতে অন্তর্ভুক্ত হতে চায়। সেনা পাঠিয়ে এবং কূটনৈতিক দৌত্যে হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড়কেও ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হওয়া এডুইনা-বান্ধব জওহরলাল নেহরু খুশি হয়ে ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পরও মাউন্টব্যাটনকে ১৯৫০ অবধি তিন বছর ভারতের গভর্নর জেনারেল করে রাখেন। অন্যদিকে লিয়াকত আলি খানকে প্রধানমন্ত্রী করে জিন্না পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হন। একমাত্র কাশ্মীর রাজ্য কোন দিকে যোগ না দিয়ে স্বাধীন থেকে যেতে চায়।

কাশ্মীরে জঙ্গি হানা, কাশ্মীরের ভারত ভুক্তি এবং ভারত - পাক যুদ্ধ : এরপর ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মীরকে অন্তর্ভুক্তির জন্য চাপ দিতে থাকে। রাজা হরি সিংহ এই প্রবল চাপের কাছে নতজানু না হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আবস্থান নেন। তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে 'স্ট্যান্ড স্টিল' চুক্তি করেন, ভারত চুক্তিবদ্ধ হতে অস্বীকার করে। পাকিস্তানের 'কায়েদ-ই-আজম' ও 'বাবা-ই-কোয়াম' জিন্না যিনি দুরারোগ্য যক্ষ্মায় ভুগছিলেন, পাকিস্তান গঠনের এক বছরের মধ্যেই মারা যাবেন, কাশ্মীর নিয়ে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। দেশভাগের পরপরই পাকিস্তানি সেনা কয়েক হাজার পাস্তুন ও অনান্য উপজাতির জঙ্গিদের অস্ত্র দিয়ে কাশ্মীর দখল করতে পাঠিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত সেই

সময় ভারত ও পাকিস্তানের সেনা প্রধান ছিলেন দুই ব্রিটিশ জেনারেল। জঙ্গিরা খুন, ধর্ষণ, লুঠপাট, অগ্নি সংযোগ করতে করতে বারামুল্লা অবধি পৌঁছে যায়। চূড়ান্ত বিপদ বুঝে হরি সিংহ মাউন্টব্যাটনের সাহায্য চান, শ্রীনগর থেকে জম্বু চলে যান এবং ২৬ অক্টোবর, ১৯৪৭ ভারতভুক্তিতে সই করেন। ভারত সরকার তার তরুণ পুত্র কর্ণ সিংহ কে কাশ্মীরের আশ্রিত রাজার মর্যাদা দিয়ে জম্বুতে রেখে হরি সিংহ কে বম্বেতে নির্বাসিত করে।

এরপরে ভারত বিমানে করে কাশ্মীরে সেনা পাঠায়। ততদিনে অত্যাচার ও ধ্বংস করতে করতে জঙ্গিরা শ্রীনগর বিমানবন্দর অবধি পৌঁছে গেছে। তাদের সেখান থেকে কিছুটা পিছু হটিয়ে দেওয়া হয়। ভারতের সেনাদের সঙ্গে শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে কাশ্মীরি স্বেচ্ছাসেবকরাও পাকিস্তানি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। ১৯৪৭ - '৪৮ এর প্রথম ভারত-পাক যুদ্ধে পাক মিলিশিয়া ও সেনারা ভারতীয় সেনা বাহিনীর কাছে পরাজিত হলেও কাশ্মীরের যে অঞ্চলগুলি দখল করে রাখে সেগুলি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পাকিস্তানের উত্তর ও উত্তর - পূর্বে (১) গিলগিট - বাল্টিস্তান এবং পূর্বে (২) আজাদ কাশ্মীর নামে দুটি প্রদেশের সৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলকে ভারত 'পাক অকুপাইড কাশ্মীর' (POK), বাকি বিশ্ব 'পাক অ্যাডমিনিস্টারড কাশ্মীর' (PAK) নামে অভিহিত করে। এদের সীমান্তই হয়ে যায় ভারত - পাক সীমান্ত (LOC থেকে LAC)। এভাবে কাশ্মীরের ৮৫,৮৪৬ বর্গ কিমি চলে যায় পাকিস্তানের দখলে এবং ভারতের দখলে থাকে ১,০১,৩৩৮ বর্গ কিমি (IAK)। এরপর কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান ১৯৪৮ - '৪৯ পর্যায়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে খুব সক্রিয় হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ একসময় কাশ্মীরে গণভোটের (Plebiscite) প্রস্তাব দেয়। ভারত সেটি এবং কাশ্মীর নিয়ে কোন তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা খারিজ করে। অন্যদিকে পাকিস্তান আমানুল্লা খান প্রমুখের নেতৃত্বে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে 'আজাদ কাশ্মীর' (সমগ্র কাশ্মীরের স্বাধীনতা) আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করে পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর উপত্যকায় ভারত বিরোধী জঙ্গি আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদ এবং ছায়া যুদ্ধে (Proxy War) মদত দিতে থাকে। ভারতীয় কাশ্মীরে একদিকে সাধারণের দারিদ্র এবং ভুস্বামী, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার দের শোষণ, প্রশাসনের দুর্নীতি ও সামরিক বাহিনীর দমন, অন্যদিকে সীমানার দুদিকেই একই কাশ্মীরি জাতি ও একই ইসলাম ধর্ম হওয়ায় পাকিস্তানের এই কাজটা সহজ হয়ে যায়।

ভারতের কাশ্মীর : নেহরু - প্যাটেল দের সঙ্গে দীর্ঘ দর কষাকষির পর মেহের চাঁদ মহাজনকে সরিয়ে শেখ আবদুল্লাকে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী করা হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ অবধি কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি স্বায়ত্বশাসন (Self-determination) এবং আমূল ভূমি সংস্কারের উপর জোর দেন। ১৯৫২ তে কাশ্মীরের জন্য ৩৭০ এবং ৩৫ এ ধারা জারি হয় যাতে কাশ্মীর বিশেষ মর্যাদা; নিজস্ব - সংবিধান, আইন, পতাকা, স্বায়ত্বশাসন এবং আভ্যন্তরীণ শাসন ক্ষমতা অর্জন করে। কাশ্মীরে কোন অকাশ্মীরি স্থায়ীভাবে থাকার অধিকার হারায়। জনসঙ্ঘ নেতা সাংসদ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই ধারার বিরোধিতা করে কাশ্মীর অভিযান করে ১৯৫৩ তে রহস্যজনকভাবে মারা যান। একটি পর্যায়ে আবদুল্লাহ NC কে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মিশিয়ে দেন। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে এই মাখামাখি অচিরেই বন্ধ হয়। কারণ তার আগেই তিনি ১৯৫০ এ 'বিগ ল্যান্ডেড এস্টেটস এবলিশন অ্যাক্ট' চালু করে কংগ্রেস আশ্রিত ভুস্বামীদের রুষ্ট করেছেন। দেশ বিরোধিতার অভিযোগে কাশ্মীরের এই জনপ্রিয় নেতা ১৯৫৩ - ১৯৬৪ কারাবন্দী এবং ১৯৬৫ - ১৯৬৮ গৃহে অন্তরীণ থাকেন। পরে নির্বাচিত হয়ে ১৯৭৫ - ৮২ অবধি জম্বু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী থাকেন।

তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র ফারুক আবদুল্লা তিনবার এবং পৌত্র ওমর আবদুল্লাহ দুবার NC র তরফে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ - ৬৫ অবধি NC এর বকশি গুলাম মহম্মদ তিনবার ও খাজা সামসুদ্দিন একবার এবং কংগ্রেসের গুলাম মহম্মদ সাদিক একবার প্রধানমন্ত্রী থাকেন। ১৯৬৫ থেকে পদটি মুখ্যমন্ত্রী হলে নয়বার NC, চারবার কংগ্রেস, তিনবার PDP এবং একবার ANC সরকার গঠন করে। ১০ বার গভর্নরের শাসন লাগু করতে হয়। ২০১৯ থেকে জম্বু কাশ্মীর কে কেন্দ্রশাসিত রাজ্য এবং লাদাখকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল করা হয় এবং ৩৭০ ধারার বিশেষ মর্যাদা তুলে দেওয়া হয়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে বিগত ৭৮ বছরে কাশ্মীর নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং তথাকথিত উন্নয়নের কাজ হয়েছে, কিন্তু তাতে ক্ষমতাসীন ও তাদের সহযোগী কিছু মানুষ উপকৃত হলেও ব্যাপক সাধারণ কাশ্মীরিরা বিচ্ছিন্ন থেকেছেন। এতদিন কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, সঙ্গে ছিল কাশ্মীরিদের একাংশ। এখন ভারতীয় সেনাদের কাশ্মীরিদের একাংশের এবং পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। কাশ্মীর ধারাবাহিকভাবে অশান্ত থাকছে এবং দেশি - বিদেশি সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গি কার্যকলাপের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। কার্যত সামরিক বাহিনী দিয়েই কাশ্মীরকে ধরে রাখা হয়েছে।

চিনা আগ্রাসন : ১৯৪৯ সালের সফল বিপ্লবের পর কম্যুনিস্ট চিন ১৯৫০ -'৫১ তে ১২.৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের বিশাল আয়তনের ১৬ হাজার ফুট গড় উচ্চতার তিব্বত দখল করে নেয়। চিন কখনই ব্রিটিশকৃত ভারত - তিব্বত কল্পিত সীমান্ত 'ম্যাকমোহন লাইন'কে মান্যতা দেয়নি। চাচা নেহরুর 'হিন্দি - চিনি ভাই ভাই' প্রগলভতাকে নস্যাৎ করে ১৯৬২ এর যুদ্ধে চিন ভারতকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে এবং কাশ্মীরের লাদাখ সংলগ্ন ৩৭,৫৫৫ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের আকসাই চিন দখল করে নেয়। চিন, কাশগড় - খুঞ্জেরাব পাস AH4 মহাসড়ককে কারাকোরাম ট্র্যাক্ট এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট - বাল্টিস্তানের মধ্যে দিয়ে আরও বাড়িয়ে (N35) পাকিস্তানের বালুচিস্তানের গ্বাদর আরব সাগরের গভীর বন্দর পর্যন্ত নিয়ে যায়। ৩১০০ কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ এই হাইওয়ে নির্মাণ ১৯৫৯ এ শুরু হয়ে ১৯৭৯ তে শেষ হয়। অন্যদিকে চিন আকসাই চিন ও গালওয়ানের মধ্যে দিয়ে জিন জিয়াং (সিন কিয়াং) - জি জ্যাং (তিব্বত) G219 মহাসড়ক নির্মাণ করে।

১৯৬৩ তে পাকিস্তান পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৫,১৮০ বর্গ

কিলোমিটার আয়তনের শাক্সগ্রাম অঞ্চলকে চিনের হাতে তুলে দেয়। ১৯৬৭, '৭১, '৭৫, '৮৭, ২০১৩ ও ২০১৭ তে চিনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত সংঘর্ষ হয়। নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পাঁচবার এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চারবার মোট নবার চিনে গিয়েও, চিনের সর্বোচ্চ নেতা শি জিনফিং কে ভারতে দুবার এনেও এবং ভারতীয় বাজারকে চিনা পণ্যের জন্য অবারিত করেও চিনা আগ্রাসনের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে পারেননা। ২০২০ তে চিন লাদাখের গালওয়ান ও প্যাঙ্গং হ্রদ অঞ্চলে পুনরায় সীমান্ত সংঘর্ষের পর বেশ কিছুটা ঢুকে পড়ে। এরফলে সরু সুতোর মত একখণ্ড জমি দিয়ে সংযুক্ত ভারতের কাশ্মীরের উত্তর প্রান্তিক বায়ুসেনা ঘাঁটি দৌলত বেগ ওল্ডির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। চিন নিজেদের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক সামরিক নির্মাণ করলেও ভারতীয় অংশে নির্মাণে বাধা দিতে থাকে।

পরবর্তী ভারত – পাক যুদ্ধগুলি : লাল বাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৬৫ তে জঙ্গিদের সামনে রেখে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করলে দ্বিতীয় ভারত - পাক যুদ্ধ শুরু হয়। ভারতীয় সেনারা প্রবল পরাক্রমে পাক সেনাদের হটিয়ে দিয়ে লাহোর অবধি পৌঁছে যান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের স্ট্রাটেজিক হাজি পীর দখল করে নেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্ততায় যুদ্ধ বন্ধ হয়। তাসখন্দ চুক্তি অনুযায়ী ভারত সমস্ত দখলিকৃত জমি ফেরত দেয়।

ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৭১ এ পাকিস্তান একদিকে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের আটটি বায়ুসেনা ঘাঁটি আক্রমণ করে এবং অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে নারকীয় অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চালায়। পূর্ণ মাত্রায় যুদ্ধ শুরু হলে পশ্চিম রণাঙ্গনে পাকিস্তান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং ভারত ১৫,০১০ বর্গ কিলোমিটার জমি দখল করে। পূর্ব রণাঙ্গনে মাত্র ১৩ দিনের মধ্যে পাক সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশের জন্ম হয়। আত্মসমর্পণকারী প্রায় এক লক্ষ পাক সেনাকে ভারত ফেরত দেয়। সিমলা চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তানকেও সব জমি ফেরত দেয়।

১৯৮৪ থেকে লাদাখের উত্তরে সালতরা রেঞ্জের সিয়াচেন হিমবাহের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অতি উচ্চতায় ভারত - পাক যুদ্ধ শুরু হয় যা বহু ক্ষয়ক্ষতির পর ২০০৩ এ ভারত পাক সেনাদের হটিয়ে হিমবাহের নিয়ন্ত্রণ নেয়।

প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী প্রতিবেশী চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্কের উদ্যোগ নেন। অকস্মাৎ ১৯৯৯ তে পাকিস্তান শ্রীনগর ও লেহ এর মধ্যবর্তী কার্গিল, দ্রাস, বাতালিক প্রভৃতি অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে ভারতের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ শৃঙ্গ ও আউট পোস্ট দখল করে নেয়। ভারতীয় সেনা অনেক কৃতিত্ব দেখিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের হটিয়ে দেয়।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হতে পারত যদি ভারত পাকিস্তানের মধ্যে মৈত্রী হত। কিন্তু পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করা মার্কিন, পাক সেনা বাহিনী ও মোল্লারা যেমন তা চাননি, ভারতীয় রাজনীতিকরাও চাননি। কারণ উভয়ের ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রধান অস্ত্র পরস্পর বিরোধিতা, মার্কিনের উদ্দেশ্য দুপক্ষকে অস্ত্র বিক্রি। ফলে দুই গরীব দেশের জনগণ কে বঞ্চিত করে উভয়ের সামরিক বাজেট বেড়েই চলেছে। ব্যতিক্রমভাবে বাজপেয়ী, মনমোহন সিংহ ও ইমরান খান সুসম্পর্কের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, মুসারফ ও মোদী তা ব্যর্থ করেন। উপরোক্ত যুদ্ধগুলি ছাড়াও ১৯৮০ সহ বহু সময় দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এর উপর ভারত ১৯৭৪ এ এবং পাকিস্তান ১৯৭৮ এ পরমাণু অস্ত্র অর্জন করে।

১৯৮৯ – '৯০ এর ইন্তিফিদা এবং পরবর্তী সন্ত্রাস : ১৯৮৯ - '৯০ এ বাম ও বিজেপি সমর্থিত কেন্দ্রের ভিপি সিংহ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন কাশ্মীরের মুফতি মহম্মদ সইদ এবং কাশ্মীরের প্রশাসক ছিলেন জগমোহন। এই সময় JKLF এর নেতৃত্বে 'আজাদির' দাবিতে এক সশস্ত্র গণ বিদ্রোহ সংগঠিত হয় যা সাধারণ কাশ্মীরিদের সমর্থন পায়। হাজার হাজার মহিলাও অংশ নেন। গেরিলা লড়াই চলতে থাকে। দীর্ঘ প্রচেষ্টায় সামরিক বাহিনী তা প্রশমিত করলেও ১৯৯২-'৯৩ থেকে তাদের জায়গা নেয় পাকিস্তানপন্থী ইসলামি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিজব-উল মুজাহিদীন। তারা সামরিক বাহিনী ছাড়াও বেছে বেছে হিন্দু, শিখ, অন্য রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক এবং পুণ্যার্থীদের হত্যা করতে থাকে। সেই সময় কাশ্মীরের স্থায়ী বাসিন্দা অবশিষ্ট তিন লক্ষ কাশ্মিরী পণ্ডিত কাশ্মীর ছাড়তে বাধ্য হন। ২৩০ জন কাশ্মিরী পণ্ডিতকে হত্যা করা হয়। এদের পাশাপাশি মৌলবাদী লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ, হরকত-উল-মুজাহিদিন প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি পাকিস্তানের আইএসআই ও সেনা বাহিনীর মদতে কাশ্মীর উপত্যকায় শক্তিবৃদ্ধি করে জঙ্গি হামলা এবং নির্বাচিত নরহত্যা শুরু করে। ওয়ানধামা, চাপনারি, প্রাণকোট, চাম্বা, কালুচক, নান্দীমার্গ প্রভৃতি জায়গায় একের পর এক নির্বাচিত গণহত্যা সংঘটিত হতে থাকে। পুরো দশক জুড়েই জঙ্গিদের তাণ্ডব চলতে থাকে যাতে অংশ নেয় পাক, আফগান, চেচেন প্রভৃতি পেশাদার জঙ্গিরাও। আর এদের দমন করতে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীও দমন পীড়ন চালায়। একটি সরকারি সূত্রে জানা যায় যে এই সময় ১৫,৯৩৭ জন জঙ্গি, ১৩,৫০০ নিরপরাধ মানুষ এবং ৪,৬০০ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য মারা যান। নিখোঁজের সংখ্যা আট হাজার। কোন কোন মতে ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা দ্বিগুণ।

১৯৯৯ তে জঙ্গিরা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এর বিমান ছিনতাই করে কাবুলে নিয়ে গিয়ে বেশ কিছু জেলবন্দী জঙ্গি নেতাকে ছাড়িয়ে নেয়। ২০০০ সালে চিত্তিসিংপুরার একটি শিখ গ্রামকে পুরুষ শূন্য করে দেওয়া হয়। ২০০১ এ ভারতের সংসদ আক্রান্ত হয়। বিভিন্ন সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প আক্রান্ত হতে থাকে। উরিতে ২০১৬ তে আর্মি ক্যাম্প এর উপর জোরালো আঘাত হানা হয়। ১৯ জন সেনার মৃত্যু ঘটে। ভারত নিয়ন্ত্রণরেখা ছাড়িয়ে এক কিলোমিটার ঢুকে সার্জিকাল স্ট্রাইক চালায়। ২০১৯এ পুলয়ামায় সিআরপিএফ কনভয়ে বড়সড় আক্রমণ ঘটে। ৪০ জন সিআরপিএফের মৃত্যু হয়। ভারতীয় বায়ুসেনা বালাকোটে হামলা চালায়। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় ও সামরিক

দমন পীড়নে বহু মানুষ হতাহত হন, বহু মানুষ বন্দী থাকেন, মানব অধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগ আসে। জঙ্গিপনা ও রাষ্ট্রের অভিঘাতে গণতান্ত্রিক ও প্রতিবাদী কণ্ঠগুলি স্তব্ধ হয়। সুজাত বুখারির মত সাংবাদিকদের হত্যা করা হয়।

২০২৫ এর ষষ্ঠ ভারত – পাকিস্তান যুদ্ধ : ২২ এপ্রিল পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের পাহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের জন্য ভারত পাকিস্তানকে দায়ী করে। ভারত সরকার সিন্ধু চুক্তি বাতিল সহ কিছু কঠোর পদক্ষেপ নেন। পাল্টা আকাশসীমা বন্ধ সহ পাকিস্তানও কিছু পদক্ষেপ নেয়। দেশের মধ্যে যুদ্ধযুদ্ধ আবহ তৈরি এবং সংবাদ মাধ্যমে ভারতের প্রবল যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখানো চলতে থাকে। জম্বু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখায় দু পক্ষের গোলা বিনিময় শুরু হয়। এরপর ভারতীয় বায়ুসেনা ৬/৭ মে মধ্য রাতে 'অপারেশন সিন্দুর' অভিযান চালিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র (Missile) ও ড্রোন (Drone) দিয়ে POK এর পাঁচটি এবং পাক পাঞ্জাবের চারটি মোট নয়টি জঙ্গি ঘাঁটি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ধ্বংস করে দেয়। পাকিস্তানের পাল্টা আক্রমণে ভারতের কয়েকটি যুদ্ধ বিমান ধ্বংস হয়। নিয়ন্ত্রণরেখায় পাক গোলা বর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং ৭/৮ মে সারারাত পাকিস্তান জম্মু-পাঠানকোট ও জয়সলমীর থেকে শুরু করে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ১৫টি ক্যান্টনমেন্ট শহর সহ বসতি অঞ্চলে মিশাইল হানা চালালে ভারতীয় এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সেগুলির বেশিরভাগ নিষ্ক্রিয় করে এবং ভারত পাকিস্তানের লাহোর সহ ১৫টি ক্যান্টনমেন্ট শহরে মিশাইল হানা চালায়।

এরপর ৮/৯ সারা রাত পাকিস্তান শ্রীনগর থেকে ভুজ শয়ে শয়ে চিনা ও তুর্কি ড্রোন ছুঁড়ে সীমান্তবর্তী জম্বু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও গুজরাট রাজ্য আক্রমণ করলে পুরদস্তুর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ভারতীয় নৌবাহিনী করাচী বন্দর অবরুদ্ধ করে। পাকিস্তান শুরু করে 'অপারেশান বুনিয়ান-আন-মারসুস' এবং ভারত ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র চালিয়ে পাকিস্তানের ১১টি বায়ুসেনা ঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্ত করে। এরপর পাকিস্তানের বড় পাল্টা হানার হুমকির প্রেক্ষিতে পরমাণু যুদ্ধ নিবারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ ৩২টি দেশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে ৯ তারিখ বিকেল থেকে 'সংঘর্ষ বিরতি'র (Ceasefire) ব্যবস্থা করে। এই যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ছিল বিপক্ষের জমি ও আকাশসীমায় না ঢুকে উন্নত প্রযুক্তির মানববিহীন ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রের সফল ব্যবহার যেখানে মার্কিন, ফ্রেঞ্চ ও ইজরায়েলি অস্ত্রে সজ্জিত ভারতের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়েছে চিনা অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তান।

ভূস্বর্গ যখন কাঁটার মুকুট : একের পর এক কাশ্মীরি দলগুলির সরকার, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প (প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন তহবিল থেকে ৬৩ টি প্রকল্পে ৮০,০০০ কোটি; বর্তমান আর্থিক বছরে ১৫,৭১৯.৪০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ; শিল্প উন্নয়নে পৃথক ২৮,০০০ কোটি; বারামুল্লাহ অবধি রেল, জোজিলা টানেল সহ উন্নত যোগাযোগ প্রকল্প ইত্যাদি), ৩৭০ ধারা লাগু কিংবা তোলা, ১৯৭২ ও ১৯৭৬ এ প্রযুক্ত 'জে অ্যান্ড কে অ্যাগ্রারিয়ান রিফরম অ্যাক্ট ১ ও ২', ধারাবাহিক সেনা অভিযান (ভারতীয় সেনার তিন বাহিনী এবং তাদের ParaSF, MARCOS, AFSOD, NSG, Garud প্রমুখ এলিট কমান্ডো; Rashtriyo Rifles; CAPF. (BSF, CRPF, SSB, ITBP); JK Police ও তার Special Operation Force সমেত সাত লক্ষের বেশি নিরাপত্তা কর্মী), তাদের Search and Cordon, ২০১৬ ও '১৯ এর নাটকীয় সার্জিকাল স্ট্রাইক ও বালাকোট অভিযান ইত্যাদি কোনভাবেই দিল্লির শাসকরা কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদকে আটকাতে পারছেননা। ১ কোটি ২৫ লক্ষ জনসংখ্যার, দুনিয়ার সবচাইতে বেশি সামরিক শক্তির অবস্থানপূর্ণ এবং উপর্যুপরি সন্ত্রাসবাদে জর্জরিত, কাশ্মীর তাই অন্ধকারে মুক্তির পথ হাতড়াচ্ছে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কাশ্মীরিয়াত ও ইনসানিয়াত এর পরিবর্তে প্রবল ভারত বিরোধিতা এবং ইসলামি মৌলবাদ সমাজ - রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করেছে। বিরোধী রাজনৈতিক ধারাগুলির মধ্যে ১৯৯৩ তে বিভিন্ন ইসলামি, প্রাক্তন জঙ্গি প্রমুখ ২৬ টি সংগঠনকে নিয়ে মিরয়াজ ওমর ফারুক ও আলি শাহ গিলানির নেতৃত্বাধীন পাকপন্থী 'হুরিয়াত কনফারেন্স' সমগ্র উপত্যকায় খুবই প্রভাবশালী। এছাড়াও সংসদীয় JKNC, JKPDP, CPIM, JKANC প্রমুখ সংগঠন কে নিয়ে ২০১৯ এ ঘোষিত হয়েছে 'গুপকার ডিক্লারেশন'। বিজেপি, জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি জাতীয় দল হিন্দু প্রধান জম্বু ছাড়া কাশ্মীর উপত্যকার জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন পাঞ্জাবের কৃষক আন্দোলন আসলে পাঞ্জাবের ধনী কৃষকদের সঙ্গে ভারতীয় বৃহৎ পারিবারিক পুঁজির দ্বন্দ্ব, সেরকমই কাশ্মীরের নতুন করে সন্ত্রাস বৃদ্ধি আসলে ৩৭০ ধারা অবসানে কাশ্মীরের ধনী ব্যবসায়ী, বাগিচা মালিক এবং পর্যটন ব্যবসার মালিকদের সঙ্গে কাশ্মীরে থাবা বসানো ভারতীয় বৃহৎ পারিবারিক পুঁজির দ্বন্দ্ব। যাই হোক না কেন, জটিল কাশ্মীর সমস্যার আজ অবধি সমাধান মেলেনি। তাই স্বাধীনতার সময় থেকে ভূস্বর্গ কাশ্মীর ভারতীয় শাসকদের যেমন কাঁটার মুকুট, তেমনই পাকিস্তানি শাসকদের অধরা স্বপ্ন এবং সাধারণ কাশ্মীরিদের কাছে বধ্যভুমি হিসাবেই রয়ে গেছে। তাই 'অপারেশন সিন্দুরে'র পরেও কাশ্মীর উপত্যকার পাইন বনগুলি থেকে নিরাপত্তা রক্ষী আর জঙ্গীদের একটির পর একটি গুলির লড়াইয়ের খবর পাওয়া যাচ্ছে। 'অপারেশন মহাদেব', 'অপারেশন শিবশক্তি'... নতুন নতুন কথা শোনা যাচ্ছে। ৬ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জম্বুর কাটরা স্টেডিয়াম থেকে প্রায় ৪৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে চেনাব ও অঞ্জি সেতু এবং উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেল লিঙ্ক ও দুটি বন্দে ভারত ট্রেন উদ্বোধন করে সারা ভারত ও জম্বুর সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকার রেল সংযোগ ঘটালেন। তবে কাশ্মীর উপত্যকার মানুষের প্রাণ ছুঁতে পারলেন কিনা আগামী দিনগুলি বলবে।

অনুবাদক: দীপ্তাংশু ঘটক

সূত্রঃ ১)*Kashmir: Roots of Conflicts, Paths to Peace - Sumantra Bose;* ২)*Kashmir: The Partition Trilogy - Monreet Sodhi;* ৩)*Kashmir: Untold Story - Iqbal Chand Malhotra;* ৪)*Kashmir: Untold Story - Christopher Snedden;* ৫)*Kashmir: Untold Story - Humra Qureshi;* ৬)

Solving Kashmir - Mohan Bhandari; ৭)*Kashmir at the Crossroads - Sumantra Bose;* ৮)*The Generation of Rage in Kashmir - David Devadas;* ৯) *Kashmir The Troubled Frontiers - Afsir Karim;* ১০)*Kashmir in Conflict - Victoria Schafield;* ১১)*Understanding Kashmir and Kashmiris - Christopher Snedden;* ১২) *Kashmir Dispute - Shabir Chowdhury;* ১৩) A Dismantled State—Anuradha Bhasin

অপারেশন কাগার: দেশের মধ্যে যুদ্ধ

শিমূল সোরেন

অপারেশন গ্রিন হান্ট ও সালয়া জুড়ুমঃ দেশের অভ্যন্তরীণ প্রধান বিপদ হিসাবে নকশালবাদকে চিহ্নিত করে জাতীয় কংগ্রেসের ইউ.পি.এ. সরকার মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানকে ২০০৯ সালে শক্তিশালী করে দেশের মধ্য ও পূর্ব ভাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ১১ টি রাজ্যের ২২৩ টি জেলায় যে 'অপারেশন গ্রিন হান্ট' শুরু করেছিল সেটি সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনী ও মাওবাদীদের মধ্যে বিশাল দণ্ডকারণ্য অর্থাৎ ছত্তিসগড়, অন্ধ্র প্রদেশ, ওড়িশা ও মহারাষ্ট্র - র বিস্তীর্ণ গহন বনানী অঞ্চল (প্রায় ৯৩,০০০ বর্গ কিমি যা পশ্চিমবঙ্গের আয়তনের চাইতে বেশ কিছুটা বড়) এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে (ঝাড়খণ্ড, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ) এক ধারাবাহিক ভয়ঙ্কর সামরিক সংঘাত ও হিংসার জন্ম দেয় যাতে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেখানকার ভূমিপুত্র গোন্ড, মারিয়া, মুরিয়া, অবুঝমাড়িয়া, মাদিয়া, হালবা, ধুরিয়া, ভাতরা, কিরকু, মৌরজা, গান্ডা, সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, ভুঁইয়া, ভূমিজ, পারদান, কোলাম, কয়া, কোন্দ, পারাজা, বোন্দা, মিরধা, বাগাটা, কোটিয়া, খারয়ার প্রমুখ জনজাতির দরিদ্র মানুষ। তারও আগে মাওবাদীদের দমন করতে ২০০৫ এ জনজাতি যুবকদের একাংশকে সশস্ত্র করে 'সালয়া জুড়ুম' গড়ে তোলা হয়। মাওবাদী - সালয়া জুড়ুম সংঘর্ষ ছাড়াও সালয়া জুড়ুম সাধারণ জনজাতি গ্রামবাসীদের উপর এত বীভৎস অত্যাচার চালায় যে বহু অভিযোগের পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০১১ তে সালয়া জুড়ুম কে নিষিদ্ধ করে দিতে হয়। ঐ সময় থেকে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে রাজ্যগুলির পুলিশ ও পুলিশের বিশেষ বাহিনীগুলি, সালয়া জুড়ুম ছাড়াও 'স্টেট আর্মড পুলিশ ফোর্স' (এস.এ.পি.এফ.), 'সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স' (সি.আর.পি.এফ.)এর 'কমান্ডো ব্যাটালিয়ন ফর রেজলিউট অ্যাকশন' (কোবরা), নাগাল্যান্ডের প্রাক্তন জঙ্গিদের নিয়ে গঠিত পাহাড়ি জঙ্গল যুদ্ধে দক্ষ 'ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন' (আই.আর.বি), 'ইন্দো - টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশ' (আই.টি.বি. পি.), আর্মি কমান্ডো বাহিনী বড় সংখ্যায় সমাবেশিত করে এবং বায়ু সেনার হেলিকপ্টার বাহিনী, এন.টি.আর.ও. এর মানববিহীন আকাশযান (ইউ.এ.ভি.), ইসরো - র কৃত্রিম উপগ্রহ প্রভৃতির সহায়তা নেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী সরকার - মাওবাদী যুদ্ধে এই পর্বে দেড় হাজার নিরাপত্তা বাহিনী, আড়াই হাজার মাওবাদী এবং আড়াই হাজার সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়। প্রায় দশ হাজার মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেন এবং ১১ হাজার মাওবাদীকে গ্রেফতার করে কারাবন্দী করা হয়। ২০১৮ এর মধ্যে অপারেশন গ্রিন হান্ট এর বৃত্ত ৯০ টি জেলার মধ্যে কমিয়ে আনা হয় এবং মাওবাদীদের সক্রিয়তা মূলত ছত্তিসগড় রাজ্যের দণ্ডকারণ্যর বস্তার ডিভিশন এবং ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভুম অরণ্য পাহাড়ময় জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

অপারেশন কাগার

অপারেশন কাগার ও অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্টঃ ২০১৪ ও ২০২২ এ যথাক্রমে কেন্দ্রে ও ছত্তিসগড় রাজ্যে কংগ্রেসকে হারিয়ে ক্ষমতা দখল করে বিজেপি-র কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এই অভিযানকে আরও সংগঠিত ও তীক্ষ্ণ করে মাওবাদীদের উপর লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করে এবং মাওবাদীদের সক্রিয়তার কেন্দ্র কাঁকের, কোন্দাগাঁও, নারায়ণপুর, বস্তার, বিজাপুর, দান্তেওয়াড়া ও সুকমা - এই সাতটি জেলা নিয়ে সমগ্র বস্তার ডিভিশনের ৪০,০০০ বর্গ কিমি (যা কেরল রাজ্যের চেয়ে বড়) ঘন অরণ্যময় অঞ্চল থেকে সংকুচিত করে নিয়ে আসে ইন্দ্রাবতী নদী অববাহিকার নারায়ণপুর, বিজাপুর ও দান্তেওয়াড়া - তিনটি জেলার সীমান্তে অবস্থিত অবুঝমাড়ের ৪,০০০ বর্গ কিমি (যা গোয়া রাজ্যের চেয়ে বড়) দুর্ভেদ্য পাহাড় জঙ্গলে। এরপর ২০২৬ এর মার্চের মধ্যে মাওবাদীদের নির্মূল করে আদিবাসীদের উৎখাত করে এই খনি সমৃদ্ধ অঞ্চলকে বৃহৎ পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য শুরু হয় 'অপারেশন কাগার'। এর অঙ্গ হিসাবে পরিকল্পনা করে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে এবং বিপুল সামরিক সমাবেশ ঘটিয়ে তিন সপ্তাহের যুদ্ধ 'অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট' চালিয়ে সেখানকার খাঁড়াই স্ট্র্যাটেজিক পজিশনে অবস্থিত মাওবাদীদের অন্যতম ঘাঁটি কারেগুটটা কালো পাহাড় দখল করে নেন মাওবাদীদের থেকে। তারপর মাড় অঞ্চলে তাঁদের সামরিক

কেন্দ্রে আঘাত হেনে ২১ মে হত্যা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় মিলিটারি কমিশনের কমান্ডার ইন চিফ নাম্বালা কেশভ রাও ওরফে বাসবরাজু ওরফে গগন্না (১৯৫৫ - ২০২৫) এবং অন্যান্য পার্টি আধিকারিক, ক্যাডার ও 'পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি' (পি.এল.জি.এ.) এর যোদ্ধাদের। মণিপুর থেকে কাশ্মীর সর্বত্র ব্যর্থ মোদী সহযোগী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উচ্ছসিত হয়ে ওঠেন। সফল 'অপারেশন সিঁদুরের' পর সফল 'অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট' নরেন্দ্র মোদীর মুকুটে আরেকটি পালক সংযোজিত হয়।

একটু আগে থেকেঃ সত্তর দশকের প্রথমে নকশাল আন্দোলন ধাক্কা খাওয়ার পর বিভিন্ন পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় তেলেঙ্গানা সংগ্রামে যুক্ত প্রাক্তন শিক্ষক অন্ধ্রের গুরুত্বপূর্ণ নেতা কোন্ডাপল্লী সীতারামাইয়া(১৯১৪ - ২০০২), আপ্পাল্লাসুরি, সত্যমূর্তি প্রমুখের সঙ্গে সি.ও.সি. সি.পি.আই.এম.এল. গঠনের পর ১৯৮০ তে গঠন করেন সি.পি.আই.এম.এল. পিপলস ওয়ার। সশস্ত্র জনযুদ্ধ প্রাধান্য পেলেও বিভিন্ন গণ সংগঠন সক্রিয় ছিল এবং অন্ধ্রপ্রদেশে ছাত্র, জনজাতি, সাংস্কৃতিক ও মানবাধিকার কর্মী প্রভৃতিদের মধ্যে ভালো জনভিত্তি ছিল। ওয়ারাঙ্গাল ইঙ্গিনিয়ারিং কলেজে পড়ার সময় বাসবরাজু 'পিপলস ওয়ার গোষ্ঠী'র ছাত্র সংগঠন আর.এস.ইউ. এর সম্পাদক ছিলেন।

১৯৯১ তে সীতারামাইয়াকে অপসারিত করে প্রাক্তন শিক্ষক মুপাল্লা লক্ষণ রাও বা গণপতি (১৯৪৯ -)সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পর 'পিপলস ওয়ার গ্রুপ' এর ক্রমশঃ সম্প্রসারণ এবং সামরিকভাবে প্রবল শক্তিশালী হয়ে ওঠা। একসময় পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, বিহার, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র রাজ্যগুলিতে তাদের সশস্ত্র দলম গুলির দাপিয়ে বেড়ানো ছাড়াও অসম, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, কর্ণাটক, কেরল, উত্তরপ্রদেশ, মুম্বাই, দিল্লি প্রভৃতি রাজ্যে ও অঞ্চলে বিস্তার। একদা 'আর.এ.ডব্লিউ.' ও 'মোসাদে'র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুর্ধর্ষ তামিল গেরিলা বাহিনী 'এল.টি.টি.ই.' এর কাছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পি.ডব্লিউ.জি. দলমগুলি অজেয় হয়ে ওঠে পাহাড় জঙ্গলে গেরিলা যুদ্ধে এবং 'ইম্প্রভাইসড এক্সপ্লসিভ ডিভাইস' (আই.ই.ডি.) ব্যবহারে। ছত্তিশগড় এ ৭৬ জন সি.আর.পি.এফ. হত্যা, সালয়া জুড়ুম প্রধান মহেন্দ্র কর্মা সহ ছত্তিশগড় এর পুরো কংগ্রেস নেতৃত্বকে একটি অ্যামবুশে হত্যা, লাতেহার বিস্ফোরণে মৃত সি.আর.পি.এফে.র দেহে আই.ই.ডি. পুঁতে আরও বড় বিস্ফোরণ ঘটানো ইত্যাদি সাড়া জাগানো একের পর এক আর্মড অ্যাকশান তাঁর নেতৃত্বে এবং গগন্নার পরিচালনায়। দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রাণে বাঁচা।

মাঝে অন্ধ্রের জনপ্রিয় কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী রাজশেখর রেড্ডির কুশলী চালে অন্ধ্রে সংগঠন, বহু নেতা ও ক্যাডার এবং নাল্লামালা জঙ্গলের প্রধান ঘাঁটিটি হারালেও তেলেঙ্গানা - ছত্তিশগড় সীমান্তে আবুঝমাড় কে কেন্দ্র করে ঘাঁটি গেড়ে সমগ্র দণ্ডকারণ্য ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মাওবাদীদের ছড়িয়ে পড়া। 'দণ্ডকারণ্য স্পেশাল জোনাল কমিটি' সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা। রাষ্ট্রের কার্যত অনুপস্থিতিতে জনবিরল দুর্গম পাহাড় জঙ্গলে শোষিত জনজাতিদের নিয়ে প্লাটুন, কোম্পানি, এমনকি কয়েক সহস্র নিয়মিত লালযোদ্ধাদের কয়েকটি ব্যাটেলিয়ান এবং উত্তর ও দক্ষিণ বস্তারে দুটি ডিভিশনাল কমান্ড গঠন করে ফেলা। জনজাতিদের মধ্যে থেকে অসংখ্য গেরিলা যোদ্ধা শুধু নয় মাদভি হিদমা, গণেশ উইকে প্রমুখের মত দুর্ধর্ষ কমান্ডার গড়ে তোলা। ইতিমধ্যে মধ্য বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র ও পাঞ্জাবে সক্রিয় নারায়ণ সান্যাল, ভবানী রায়চৌধুরী, আপ্পালাসুরি, প্রশান্ত বোস প্রমুখের নেতৃত্বাধীন 'সি.ও.সি. সি.পি.আই. এম.এল. পার্টি ইউনিটি' পিপলস ওয়ার গ্রুপ এর সঙ্গে ১৯৯৮ এ সংযুক্ত হয়। এর ফলে পিপলস ওয়ার গ্রুপ এর উত্তর ও পূর্ব ভারতে সম্প্রসারণ। এরপর পিপলস ওয়ার গ্রুপ ঝাড়খণ্ড, মধ্য বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় অমূল্য সেন ও কানাই চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং সুশীল রায়, সঞ্জয় দুশাদ, প্রমোদ মিশ্র প্রমুখের নেতৃত্বাধীন 'মাওইস্ট কমিউনিস্ট সেন্টার' বা এম.সি.সি. - র সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ২০০৪ এ 'সিপিআই (মাওইস্ট)' গঠন করে ঝাড়খণ্ডেও প্রবল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এরসঙ্গে সম চরিত্রের নেপাল, ফিলিপিন্স, পেরুর ও অন্যান্য মাওবাদী পার্টিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। কোবাড গান্ধীর মত তাত্বিক আন্তর্জাতিক সংযোগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় তিরুপতি থেকে পশুপতি (নেপাল) এক বিস্তৃত রেড করিডোর গড়ে ওঠে। এগুলি ১৯৯১ থেকে ২০১৭ অবধি ২৭ বছর প্রথমে পি.ডব্লিউ.জি. ও পরে ২০০৪ থেকে ২০১৭ অবধি সি.পি.আই. (মাওইস্ট) দলের সাধারণ সম্পাদক গণপতির এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রিয় কমিটি, পলিটব্যুরো এবং সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের অন্যতম কৃতিত্ব। এছাড়াও বেশ কিছু বুদ্ধিজীবীদের তিনি যুক্ত করেন। আবার তাঁর সময় থেকেই বড় বড় সাংগঠনিক ও সামরিক ধাক্কা খেতে খেতে সি.পি.আই. (মাওইস্ট) তাদের আগুয়ান অঞ্চলগুলি থেকে ক্রমশ পিছু হটতে থাকে এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও কর্মীকে হারায়। গণপতির মাথার দাম তিন কোটি টাকা হলেও ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনী আজও তার হদিশ পায়নি। ইতিমধ্যে কাটাকাম সুদর্শন, প্রশান্ত বোস (কিষানদা), আক্কিরাজি হরগোপাল, দেওকুমার সিংহ (অরভিন্দ), সামসের সিংহ, নারায়ণ সান্যাল (নবীন), সুশীল রায় (সোম), প্রমোদ মিশ্র (বনবিহারী), অমিতাভ বাগচি, বাচ্চা প্রসাদ সিংহ, অনুকূল নস্কর, অখিলেশ যাদব, আশুতোষ টুডু, কোবাড গান্ধী, কিষেনজী, আজাদ - ২০০৪ এর অক্টোবর এর পার্টির ঐক্য কংগ্রেসে নির্বাচিত বেশিরভাগ পলিটব্যুরো সদস্য হয় মৃত নয় ধৃত।

ব্যাটন পরিবর্তনঃ এইরকম পরিস্থিতিতে ২০১৭ তে (জানানো হয় ২০১৮তে) গণপতির থেকে সি.পি.আই. (মাওইস্ট) দলের সাধারণ সম্পাদক এর দায়িত্ব নেন তারই সহযোগী, প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার এবং রাজ্যস্তরের ভলিবল ও কবাডি খেলোয়াড়, দলের সামরিক বাহিনী এবং সামরিক উৎপাদন ও গবেষণা শাখার প্রধান, পলিটব্যুরো সদস্য নিম্বলা কেশব রাও ওরফে বাসবরাজু ওরফে গগন্না ওরফে

দারাপু নরসীমা রেড্ডি ওরফে কৃষ্ণ ওরফে প্রকাশ। বিভিন্ন অ্যাকশানে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সবমিলিয়ে তাঁর মাথার দাম হয়ে ওঠে ১০ কোটি টাকা। ইতিমধ্যে অন্ধ্রের গ্রে হাউন্ড, মহারাষ্ট্রের সি ৬০, ঝাড়খণ্ডের কোবরা, ছত্তিসগড়ের ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড, ওড়িশার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপস, পশ্চিমবঙ্গের স্ট্রাকো, মধ্যপ্রদেশের হক ফোর্স প্রভৃতি আধা সামরিক উন্নত অস্ত্র সজ্জিত ও প্রশিক্ষিত নিরাপত্তা বাহিনীগুলির লাগাতর অপারেশনে মৃত্যু হয়েছে মিলিন্দ বাবুরাও তেলতুম্বলে, প্যাটেল সুধাকর রেড্ডি, রামচন্দ্র রেড্ডি (চলপতি) প্রমুখ গুরুত্বপুর্ণ নেতা ও ক্যাডার দের। চেরুকুরি রাজকুমার (আজাদ), মল্লাজুলা কোটেশ্বর রাও (কিষেনজী) প্রভৃতি নেতাদের আলোচনার জন্য ডেকে এনে হত্যা করা হয়। ম্যালেরিয়া, কোভিড প্রভৃতি রোগে মৃত্যু হয় কেন্দ্রীয় কমিটির তাত্ত্বিক নেত্রী অনুরাধা শেনবার্গ গান্ধী প্রমুখের। কোবাড গান্ধীর মত অনেকে ধরা পড়ে কারাবন্দী। অনেকে আত্মসমর্পণ করেন। আবার সব্যসাচী পন্ডা ও কোবাড গান্ধীর মত কেউ কেউ মতপার্থক্যে পার্টি থেকে বিতাড়িত হন। সব্যসাচী ওড়িশায় সিপিআই (মার্কসিষ্ট-লেনিনিষ্ট-মাওইষ্ট) নতুন দল গড়লে মাওবাদীদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ শুরু হয়। সবমিলিয়ে মাওবাদীদের রক্তক্ষরণ চলছিলই। আগেই জনযুদ্ধের নামে শক্তিশালী গণআন্দোলনকে জলাঞ্জলি দিয়ে এতবড় এক শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং তার বিশাল ও শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্গম কিছু পাহাড় জঙ্গলে গেরিলা যুদ্ধকে প্রধান কর্মসূচি করায় প্রবল উদ্যোগ, শক্তিশালী সংগঠন ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী - যোদ্ধারা থাকা সত্ত্বেও মাওবাদীরা কেবলমাত্র সশস্ত্র অ্যাকশনের কানাগলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। এর উপর গণপতির সময়কার বেশ কিছু রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক উদ্যোগের বিপরীতে গগন্নার সময়ে সামরিক কার্যকলাপে কেন্দ্রিভুত হওয়া তাঁদের জনজীবন ও রাজনীতির মূলস্রোত থেকে আরও বিচ্ছিন্ন এবং রাষ্ট্রের খুবই সুবিধা করে দেয়। গত দেড় বছরে ৫০০ এর বেশি মাওবাদীকে হত্যা করা হয়েছে এবং ১৫০০ এর মত মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন। পুরনো পলিটব্যুরো সদস্যদের মধ্যে কেবল জীবিত আছেন থিপ্পিরি তিরুপতি (দেব), মাল্লাজুলা ভেনুগোপাল রাও (অভয়) এবং মিশির বেসরা (সাগর)। তবে সমাজকর্মী সোনি সোরি, হিমাংশু কুমার, বেলা ভাটিয়া, শুভজিত বাগচি প্রমুখের মতে মাওবাদীদের নামে অনেক সাধারণ জনজাতি মানুষকে হত্যা এবং তাঁদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে যাতে দেশি বিদেশি শিল্পপতিদের এই বিস্তীর্ণ খনি ও অরণ্য সমৃদ্ধ অঞ্চল তুলে দেওয়া যায়।

এছাড়াও অবিরত সন্ত্রাস, হিংসা, খুন ও রক্তপাত; প্রভাবসম্পন্ন এলাকায় কোন বিরুদ্ধ স্বর রাখতে না দেওয়া; ব্যবসায়ী ও ঠিকাদারদের থেকে তোলাবাজি; কোন কোন ক্ষেত্রে আদিবাসীদের উপর জুলুম; তাঁদের ঢাল হিসাবে ব্যবহার; কোন উন্নয়নমূলক কাজ করতে না দেওয়া; কিছু কিছু নেতার নৈতিক পদস্খলন; অন্ধ্রে কংগ্রেস, ঝাড়খণ্ডে ঝাড়খন্ডি দলগুলি এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে সুবিধাবাদী আঁতাত প্রভৃতিও তাঁদের বিরুদ্ধে গেছে। ফলে তাঁদের নেতা ও কর্মীদের একের পর এক হত্যা এবং অপারেশন কাগার ও ব্ল্যাক ফরেস্ট এর রাষ্ট্রীয় নৃশংসতা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মধ্যে সেভাবে প্রতিবাদ শোনা যায় নি। সি.পি.আই.এম.এল. লিবারেশন, সি.পি.আই.এম., সি.পি.আই. - বাম দলগুলি এবং কিছু মানবাধিকার সংগঠন মাওবাদী এবং জনজাতিদের হত্যার প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং ভারত সরকারকে অবিলম্বে এই হত্যালীলা বন্ধ করে মাওবাদীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছেন। শোনা যায় গগন্না শেষদিকে সরকারের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অতীতে তাঁরাও যেমন ভুল বুঝিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীকে ফাঁদে ফেলে বোমা, আই.ই.ডি., গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিতেন, এক্ষেত্রে পুলিশও তাঁকে আলোচনা করতে ডেকে ঘিরে ফেলে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়। তার পরপরই সংলগ্ন ইন্দ্রাবতী অভয়ারণ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নরসিমা চলম (সুধাকর), মাইলারাপু আদেলু (ভাস্কর) সহ আরও বেশ কিছু মাওবাদী নেতা নিহত হন। এই প্রবল বর্ষার মধ্যেও নিরাপত্তা বাহিনীর অপারেশন জারি থাকে ঝাড়খণ্ডের লাতেহার, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, মহারাষ্ট্রের গাদচিরলি, অন্ধ্রের আলুরি সীতারামা রাজু প্রভৃতি মাওবাদী 'উপদ্রুত' এলাকায়। অন্ধ্র-ওড়িশা সীমান্তে নিহত হন জি.রবি, অরুণা প্রমুখ নেতানেত্রী। এছাড়াও লাতেহার এর আরেকটি মাওবাদী গোষ্ঠী 'ঝাড়খণ্ড জন্ মুক্তি পরিষদ' (জে.জে.এম.পি.)-র প্রধান ও দ্বিতীয় প্রধান পাপ্পু লোহারা ও প্রভাত গঞ্জুকে সহযোগীদের সঙ্গে এনকাউনটারে হত্যা করা হয়। সংগঠনে যাদব প্রাধান্যর আভিযোগে বেরিয়ে আসা ঝাড়খণ্ডের চাতরা, পালামৌ ও লাতেহার অঞ্চলে সক্রিয় ব্রজেশ গঞ্জুর নেতৃত্বাধীন আরেকটি মাওবাদী সংগঠন 'তৃতীয় প্রস্তুতি কমিটি' (টি.পি.সি.), সি.পি.আই.(মাওইস্ট) দের সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষরত।

কেন এমনটা হল? এটি ঘটনা যে পিপলস ওয়ার গ্রুপ অন্ধ্রতে জাতপাত বিরোধিতা, ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের জমিবণ্টন, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ও মহিলাদের সম্মানে সামাজিক আন্দোলন, গণসংস্কৃতি আন্দোলন, সশস্ত্র স্কোয়াড বা দলম গঠন করে সামন্তপ্রভু ও মাফিয়াদের প্রতিরোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। পরে দণ্ডকারণ্যে ঠিকাদার, কেন্দু পাতা ব্যবসায়ী, খনি মাফিয়া প্রভৃতিদের নিষ্পেষণ থেকে স্থানীয় জনজাতিদের রক্ষা করেছেন। কিন্তু দেশ, রাজ্য ও জনজীবনের মূল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থেকে দুর্গম জঙ্গল পাহাড়ের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী এক আধুনিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে চিনে মাও জে দং অনুসৃত গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লাইন অতীতের মত আবার ব্যর্থ হয়েছে। সাম্প্রতিককালে কাম্বোডিয়া, ফিলিপাইন্স, পেরু, নেপাল - মাওবাদীদের এই প্রচেষ্টা কোথাও সফল হয়নি। এছাড়া তাঁদের দিক দিয়ে অন্যান্য কারণ আগেই আলোচনা করা হয়ে গেছে। অন্যদিকে সমাজের বিভিন্ন দিক থেকে বড় পরিবর্তন হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী নয়া- উদারনৈতিক বাজার অর্থনীতির অংশ হিসাবে সমাজে অর্থনীতিবাদ অর্থাৎ সবকিছুর আর্থিক মূল্যায়ন,

বাজারদরের তারতম্য, মুদ্রাস্ফীতি - দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও একইসঙ্গে রোজগার ও মজুরি বৃদ্ধি, শ্রমের পরিব্রজন, ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য, উপভোক্তাবাদ, আরও ভালভাবে থাকার উচ্চাকাঙ্খা ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে যা বিভিন্ন মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতেও পৌঁছে গেছে। পাশাপাশি বিগত একশো বছর ধরে আর.এস.এসে.র ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং ২০১৪ থেকে মোদীর নেতৃত্বে বি.জে.পি.র উত্থান ও ধারাবাহিক কর্মসূচি এক দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয় হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে।

তাই তীব্র সামরিক অভিযানে তত সাফল্য না পেয়ে সরকারের তরফ থেকে যখন সামরিক অভিযানের সঙ্গেসঙ্গে জনসংযোগ ঘটানো হয়েছে তখন থেকে সফলতা মিলেছে। গ্রামবাসীদের সাহায্য পাওয়া গেছে। তার উপর দাঁড়িয়ে 'ট্যাকটিকাল কাউন্টার অফেন্সিভ ক্যাম্পেন' (টি.ও.সি.) চালিয়ে একেকটা এলাকা ধরে ধরে মাওবাদী প্রভাবমুক্ত করে এবং পার্শ্ববর্তী জঙ্গলগুলিতে নিয়মিত তল্লাসি চালিয়ে গ্রামগুলিতে স্থায়ী সি.আর.পি.এফ. ক্যাম্প বসান হয়েছে। এখন অবধি ৫০০ এর মত ক্যাম্প বসেছে। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে ভয় দূর করার পর যখন রেশনের ব্যবস্থা, টিউবওয়েল বসানো, বিজলির ব্যবস্থা, পাকা রাস্তা ও কালভারট তৈরি, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সহায়তা, কর্মসংস্থান, স্কুল নির্মাণ ও বন্ধ স্কুলগুলি চালু করা, সরকারি অফিস ও ব্যবস্থাগুলি চালু করা, মোবাইল টাওয়ার নির্মাণ, হেলথ ক্যাম্প সংগঠন, খেলাধুলার ব্যবস্থা ইত্যাদি করা হল তখন বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত থাকা মানুষ এগুলি গ্রহণ করলেন। এরসঙ্গে চালু হল বস্তার অলিম্পিক, জনজাতি উৎসব, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। মাওবাদীদের বাধায় এতদিন করা যাচ্ছিল না, এখন পুলিশি পাহারায় ছত্তিশগড় - মহারাষ্ট্র জাতীয় সড়ক নির্মাণ শুরু করা গেছে। এতদিন ঋতু ভিত্তিক তেঁতুল, কন্দ, পুটু বা প্রাকৃতিক মাশরুম, মহুল ফুল, কেন্দু পাতা, জংলি আম ইত্যাদি সংগ্রহ করে অল্প দামে বিক্রি করে, সামান্য পশুপালন এবং বর্ষায় অল্প জমিতে ধান, ভুট্টা চাষ করে কায়ক্লেশে এবং সবসময় মাওবাদী ও পুলিশের নির্দেশ পালনের ভারসাম্য রাখার আপ্রাণ চেষ্টায় প্রাণ হাতে করে যে জীবন চলছিল আপাতত তার থেকে তাঁদের এক সাময়িক হলেও অবকাশ মিলেছে। এর সঙ্গে মোবাইলের ব্যবহার এবং গঞ্জ ও শহরে যাতায়াতের সুযোগ জীবনকেও অনেকটা বদলে দিয়েছে।

মাওবাদীদের সবচাইতে বড় আঘাতটি দেওয়া হল স্থানীয় জনজাতির নির্বাচিত যুবক - যুবতী, প্রাক্তন সালয়া জুডুম সদস্য এবং আত্মসমর্পণকারী মাওবাদী গেরিলা যোদ্ধাদের সংগঠিত ও আরও প্রশিক্ষিত করে এবং আধুনিক অস্ত্র দিয়ে 'ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড' (ডি. আর.জি.), 'বস্তার ফাইটারস' এবং 'দান্তেশ্বরী লড়াকে' (প্রমিলা কাউন্টার ইন্সারজেন্সি ইউনিট) বাহিনী গঠন করে। সরকারি মাওবাদ দমন সংক্রান্ত গবেষণায় দেখা গেল চাকরি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং ভাল পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করতে পারলে শুধু স্থানীয় গরীব জনজাতির যুবক যুবতীরাই নন কঠোর জঙ্গল বাসের অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবন ছেড়ে অনেক মাওবাদী ক্যাডার ও পি.এল.জি.এ. যোদ্ধাও মূলস্রোতে যোগ দেবেন। ডি.আর.জি. ২০০৮ থেকে থাকলেও ২০১৯-এ এর খোলনলচে পাল্টে দেওয়া হল। এদের প্রথমে রাজ্যের বাইরে আর্মি প্রশিক্ষণ শিবিরে উন্নত প্রশিক্ষণ, তারপর অন্ধ্রের গ্রে হাউন্ড প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জঙ্গল যুদ্ধের প্রশিক্ষণ এবং শেষে কাঁকের এর প্রশিক্ষণ শিবিরে কাউন্টার টেররিজম ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। পি.এল.জি.এ. যোদ্ধারা আগে থেকেই প্রশিক্ষিত ছিলেন। নিয়োগ করা হল ন্যুনতম কন্সটেবল পদে। এরসঙ্গে আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীরা আর্থিক প্যাকেজ এবং শহরে কোয়ার্টার পেলেন। সবাই অবশ্য পাননি বলে অভিযোগ, আবার আগে থেকে অনেক নিষ্ক্রিয় মাওবাদী প্যাকেজের আশায় আত্মসমর্পণ করেন।

তথ্য বলছে এত দিনকার এলিট কমান্ডো দিয়ে বস্তারের বিশেষ করে অবুঝমাড়ের দুর্গম টেরেনে মাওবাদীদের গেরিলা রণনীতির মোকাবিলা ঠিকমত করা যাচ্ছিল না এবং প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ও বেশ কিছু বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় ভাষা, পরিবেশ, পরিস্থিতি জানা; জঙ্গলের প্রতিটি শুঁড়ি পথ চেনা এবং মাওবাদীদের পদ্ধতি, লুকনোর জায়গা, কলাকৌশল সম্পর্কে অবহিত ডি.আর.জি-কে সামনে রেখে নিরাপত্তা বাহিনী সফল হলেন। সাম্প্রতিক মাওবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁদের দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত ঘাঁটি গুলিতে একটির পর একটি যে সফল অভিযান সংঘটিত হয়েছে তার কুশীলব এরাই।

তাহলে কি দণ্ডকারণ্যে শান্তি ফিরে এল? প্রথমতঃ, যতদিন অন্যায়, শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার থাকবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নতুন নতুন রূপে উঠে আসবে। দ্বিতীয়তঃ, সরকার এই অঞ্চলে তিন দশক ঢুকতে না পেরে এখন কিছু ভাল উদ্যোগ নিচ্ছেন। কিন্তু সরকার ও রাষ্ট্র পরিচালক দুর্নীতিগ্রস্ত সুযোগসন্ধানী রাজনীতিক ও আমলা এবং তাদের সহযোগী শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, মহাজন, সাউকার, মাফিয়াদের পদার্পণ ঘটলেই পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে যাবে। এর উপর এখানে খনির কাজ শুরু হলে জনজাতিদের বহু গ্রাম উচ্ছেদ হয়ে তাঁদের শহরের সস্তা শ্রমিক বা ভিখারিতে পরিণত করবে। কেউ কেউ হয়ত সামান্য শ্রমিকের কাজ পাবেন। পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন ও দূষণের সম্ভবনা। তৃতীয়তঃ, মাওবাদীরা গুরুতর ধাক্কা খেলেও নির্মূল হননি। তাঁরা বর্ষার ঘন জঙ্গলের গভীরে; পার্শ্ববর্তী ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্রের সীমানার দিকে এবং অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে জনগণের মধ্যে লুকিয়ে আছেন বা মিশে গেছেন। অনুকূল পরিস্থিতিতে প্রত্যাঘাতের চেষ্টা করবেন।

গগন্নার মৃত্যু এবং নিরাপত্তা বাহিনীগুলির অবুঝমাড় দখল মাওবাদীদের উপর অবশ্যই বিরাট ধাক্কা। আগামীদিনে তাঁরা নিজেদের কিভাবে পুনর্গঠিত করে আন্দোলন পরিচালিত করবেন সেদিকে নিপীড়িত ও সচেতন মানুষের দৃষ্টি থাকবে। পাশাপাশি এটিও ভাবার যে আলুরি সীতারামা রাজুর 'রাম্পা বিদ্রোহ', তেলেঙ্গানার সংগ্রাম থেকে যে প্রবল উদ্যোগ, বহু আত্মত্যাগ সত্ত্বেও বিভিন্ন বামপন্থী উদ্যোগগুলি ব্যর্থ হয়ে চলেছে তাতে মূল্যবান প্রাণ, সময় ও শক্তির আহুতি শুধু নয় সাধারণ মানুষেরও প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে। এর প্রতিকার কিংবা বিকল্প কি?

Reminiscences of Kolkata Airport's Hundred Year Journey

Manash Kumar Das*

There may be an old history of the Runway of 'Calcutta Airport', that was built upon covering up once flowing 'Labonyabati river', colloquially known as 'Noal River', in the eastern side of the landing 'air strip', dated back in 1920s, and the first landing on the small air strip was in 1920s, which was later used as "Taxi way''. KLM flight from Amsterdum to Jakarta hopped over Kolkata in 1924 as well as Royal British Airforce plane landed. From 1930 all weather runway was built. Old history also might reveal that, then ruler British Government opted for parallel Runway, in 1942/43, instead of Runways crossing each other, with the fear of bombardment threat by the Japanese Bombers during the Second World War, which would give them the opportunity to use the alternate Runway, if the other one was destroyed. And the Airport played an important role during the Second World War, and Bengal flying club at Dum Dum aerodrome was opened in 1929, and 'Air Orient' began schedule stop here with Imperial Airways in 1933. But my connection with this heritage like awesome Greenland aerodrome in my place of birth, 'Tilottama' 'Kallolini' Kolkata in West Bengal, was from way back in the beginning of 1960, as a school student, when shifted from Shyambazar to Dum Dum residence, very close to the then Calcutta Aerodrome.

NSC Bose Airport

In my memoir, it was the periphery, or the entire areas of the aerodrome, which were covered with the greenery, vacant spaces with carpet like grasslands, few ponds and a big 'Jheel' (Lake) & football ground, with numerous trees. There were high clay tile roofed barrack type residential quarters for the employees, in rows, named as old quarters, with brick laid small narrow walkway type approach pathways in front, from which the green grasses would peep through its joints. Two circular islands with gardening inside, named as 'Ist circle' and '2nd circle', in the midst of the main airport approach road from Airport gate no.2, by passing the tile roofed single story Airport School Barracks in row, at lower than road level, in one side. And the 'EA' NDB beacon flashing its Morse coded green light signals (Echo Alfa), installed above the tall cemented pillar like installation, inside the children park, adjacent to the '2nd circle' and the 'D' type residential Airport Quarters, and very close to the demarcated Bungalow of the then Aerodrome Officer in-charge of the Calcutta Aerodrome, Mr. Binoy Hazra, Senior Aerodrome Officer, in the era of the Civil Aviation Department. The Sophisticated & then a status symbol 'Airport Club', located on the northern bank of the huge Airport Jheel, and the big green grassy football ground on the west bank of the jheel, which existed exactly on the location where the existing new Airport Terminal is built. The Airport Club and the 'Jheel' situated a furlong away from the white painted single story terminal building, with adjacent together the double storied ATC technical building, and the Control Tower above, with the Aerodrome rotating beacon affixed on the top of the Control Tower, situated by the side of the 'Tata Hanger', and in between, the wide paved ground space, being used as visitor's gallery, with round shaped silver coloured iron pipe railing, barricading the boundary of the Tarmac/ Parking Bays. Almost every evening, when we visited that visiting gallery space on the ground of the aerodrome, adjacent to the Tarmac, to watch the several International Air carriers, viz. Pan-Am, Alitalia, B.O.A.C., Qantas Airways, TWA, Swiss Air, Aeroflot, SAS, JAL, like any one you name & it was there, on the Tarmac, mostly operated with the B707 and few with DC-8 type aircraft, decorated the open space between the Runway and

Terminal building. But before these spectacular glamorous era's glimpses over the Tarmac of Calcutta/Dum Dum Airport, it was the era of silver bird Dakotas, DC-3 of Indian Airlines Corporation (IAC) and the Super Constellation L-1049C operated by the Air India, used to rule the vast skies above. Those two types on the Tarmac looked brilliant, in those eras of beginning sixties. Then suddenly on one day, the jet era's maiden version de-Havilland Comet of BOAC landed here, which I also saw on the Aerodrome Tarmac, probably in 1962. Indian Airlines operated night airmail services from Kolkata to Nagpur with its DC-3, and then with Fokker Friendship FK-27 and Avro HS-748 type aircraft, in the beginning & mid-seventies. A couple of years later we heard the shrill sound in the air, of jet aircraft, in one morning, and in the evening, when visiting the aerodrome viewing gallery, sighted the new Caravelle jet aircraft. S-210, of IAC, and by that time the Air India, country's international carrier, started operating with the B-707 jet aircraft from Calcutta Airport.

In between the two parallel Runways, there was co-axial mounted radar antennas, ASR & PAR, one rotating 360 degrees and the other one up and down ward, with vast green carpeted side stripe, with serpentine narrow Jessore Road in the north, towards 'Gouripur', beyond the boundary of the beginning of Runway 19L, and similar narrow main road of Narayanpur/Rajarhat on the edge of the Aerodrome boundary, towards Runway 01R, with Jam Air Hanger on the left of the terminal building and one Hanger of the Air India & IAC on the southern side of the operational areas, looked awesome. Air Traffic Controllers/Radar controllers sitting in a dark room, on the ground floor of the ATC building, handled the arriving & departing traffic of the aerodrome on ASR (Aerodrome Surveillance Radar), and the landing aircraft on the PAR (Precision Approach Radar), with upper airspace controlling units, Area Control Centre (ACC), in the next wide room and the similar room next to ACC, for the Flight Information Centre (FIC) controlled air traffic within its jurisdictions. These Air Traffic Control units were operational from here till mid-seventies, when the new nine storied tall new ATC/Technical building was built, closer to the Jessore road side, where in the Control Tower and the ATS Reporting office shifted first, and ACC and Radar units, along with the Communication HF Radio and Technical maintenance units later on, during 1975/76, with two sectors in ACC, ACC East an ACC West, to facilitate the smooth handling of incresed number of Overflying international air traffic movements in Kolkata Flight Information Region airspaces.

By this time Indian Airlines replaced its Caravelle with B737, and Air India acquired the Emperor of the sky 'Jumbo Jet' the B747. The first International Airline to operate its 747 in Kolkata was British Airways, the former BOAC. In those era, UBA (Union of Burma Airways) operated with its B727 type tri Jet aircraft. There were few ups and down during the period between seventies and eighties. With fewer Airlines operating in mid-seventies, then with introduction of Jet Airways, Air Sahara, East West Airline and Damania Airways, the Queen of Eastern Indian Airports became livelier. The newly built International Terminal adjacent to the tall ATC technical building also became operational. This outstanding centenary aerodrome had also witnessed its sorrowful days, one with the air crash of Pan-Am B707 aircraft (Clipper) in 1968, hitting a tree in poor visibility with torrential rain condition, approx. 4000 feet away from the beginning of the Runway 01R. Thereafter, slowly, shifting of the many international Airliners from Calcutta Airport took place, one by one, to other Airports in India, due political unrest situation, in the beginning in 1971. Nevertheless, though a centurion by age, the Kolkata Airport would ever remain as 'Cute' and young always to me. Its name was changed as Netaji Subhas Chandra Bose International Airport since 1975.

*Former Air Traffic Controller, Aerodrome Officer, Kolkata Airport

শিক্ষা প্রসঙ্গে

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়লেই শিক্ষার কী উন্নয়ন?

বরুণ দাস

নিবন্ধের শিরোনাম দেখে কেউ কেউ হয়তো তির্যক ভাবে বলবেন— নিবন্ধকার বলছেন কী? তিনি কী চোখ-কান খোলা রেখে চলেন, না বন্ধ করে চলেন? তিনি কী প্রাচীন রাজ-রাজড়াদের মতো কেবল কান দিয়ে দেখেন আর চোখ দিয়ে শোনেন? কিংবা তিনি কী শাসকদলের অন্ধ বিরোধিতার জন্য এসব কাল্পনিক গাল-গল্প নির্মাণ করছেন? লেখালেখির সুযোগ বা ক্ষমতা আছে বলেই কী 'যা নয় তা-ই' লেখা যায়? কিংবা মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে বিকৃত করা যায়? ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাজ্যের শিক্ষা-ব্যবস্থার 'উন্নয়ন'-এর সাম্প্রতিক খতিয়ান পেশ করে তাঁরা প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন নিবন্ধকারের অহেতুক বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপ-চেষ্টা কিংবা তাঁর বদ-উদ্দেশ্যের গূঢ় দিকটি। বাম আমলে ক'টা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আর পরিবর্তনের আমলে ক'টা হয়েছে— তার তালিকা পেশ করবেন। তালিকা দেখে অবশ্য আপনার চমকে ওঠার পালা। সত্যিই তো চৌত্রিশ বছরে এই রাজ্যে যে সংখ্যক স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছিল—গত দেড়দশকে তার তিনগুণ হয়েছে।

সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্যের বর্ধিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। পরিসংখ্যান মিথ্যেও নয়। পরিবেশিত তথ্য-পরিসংখ্যানের সঙ্গে বাস্তবের চাক্ষুস মিলও হয়তো খুঁজে পাবেন আগ্রহী মানুষেরা। বাস্তবে যার অস্তিত্ব আছে—তাঁকে অগ্রাহ্য করার কিংবা মিথ্যে বলার উপায়ই-বা কী। সুতরাং শিক্ষার পরিকাঠামো (পড়ুন নতুন বিল্ডিং নির্মাণ) 'উন্নয়ন'-এর ব্যাপারে সাধারণ মানুষ সন্তোষ প্রকাশ করতেই পারেন। তাছাড়া তথ্য-পরিসংখ্যানকে অস্বীকার করার উপায়ও নেই। তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

উল্লেখ্য, জনসংখ্যা বাড়ছে। প্রতিবছরই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে বসা পরীক্ষার্থীদের সংখ্যার দিকে চোখে রাখলেই বোঝা যায়। চাপ বাড়ছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। সুতরাং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা না বাড়ালে চলবে কী করে। বর্তমান সরকার দাবি করতেই পারে, চৌত্রিশ বছরে যা হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি। আগের সরকার কেবল দলবাজি করেই কাটিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা এসে বরং শিক্ষা-পরিকাঠামো সম্প্রসারণের ওপর জোর দিয়েছেন।

কিন্তু গোটা রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি কী বলে? যারা এ বিষয়ে সামান্য খোঁজখবর রাখেন, যারা শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও-না-কোনওভাবে সম্পৃক্ত—তাঁদের অভিজ্ঞতা কী? কিংবা যাদের ঘরে পড়ুয়া আছে, তাদেরই-বা অভিজ্ঞতা কী? খোদ পড়ুয়ারাই বা কী বলছে? সরকারি তথ্য-পরিসংখ্যানের পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতার মিল বা সাযুজ্যই বা কতোটা? দলীয় চশমা সরিয়ে রেখে নিরপেক্ষভাবে সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করলে কী বেরিয়ে আসে?

বারাসতের একটি বিদ্যালয়ে প্রতি সেকশনে ১৩৭ জন ছাত্রী ভর্তি নেওয়া হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা অত ছাত্রীকে পড়াবেন কী করে? অতএব শ্রেণিকক্ষে মাইকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু শোনানোর ব্যবস্থা হলেও সুস্থভাবে পড়ানো সম্ভব কী?

অপরিসর ক্লাস রুম। যেখানে ৫০-৬০ জন ছাত্রীর বসার কথা— সেখানে গাদাগাদি করে প্রায় তিনগুণ পড়ুয়াকে বসতে হয়। এখানেই কিন্তু শেষ নয়। আরও আছে। কী সেই 'আরও?' বাস্তব বলে, 'অধিকাংশ দিনই ক্লাস হয়না। একে তো টিচিং-স্টাফের সংখ্যা কম। নতুন নিয়োগ নেই। অন্যদিকে যাঁরা কর্মরত আছেন, তাঁরাও মাঝেমাঝেই কারণে-অকারণে কলেজে অনুপস্থিত থাকেন। এমনও দেখা গেছে, পরের দিন আসবেন বলেও তিনি আসেন না। ছাত্রীরা দূর-দূরান্ত থেকে এসেও ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

ছাত্রীদের অনেকেই বাস-অটো-টোটো করে আসে। বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে পৌঁছতে এক-একজনের আশি থেকে একশো টাকা যাতায়াত ভাড়া লাগে। ওই বিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রীর সংখ্যাই বেশি। আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা কোনও সাধারণ পরিবারের পক্ষে প্রতিদিন তার সন্তানকে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য এতোটা খরচ বা ভাড়া বহন করা সম্ভব কী? বলা বাহুল্য, কোভিড-১৯ এর পর দেশের তথা রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি এমনিতেই বেহাল। অনেকের কাজ চলে গেছে। অনেকের কাজ থাকলেও বেতন কমেছে।

সরকার-পোষিত মধ্যমগ্রাম চৌমাথা সংলগ্ন অন্য একটি গার্লস স্কুলের অবস্থাও ঠিক একইরকম। সংশ্লিষ্ট স্কুলেও ছাত্রীদের বসার মতো জায়গাটুকুও মেলে না। কোনওরকম চাপাচাপি করে কেউ নিচের তলায় তো কেউ বা ওপরের তলার কোনও ফাঁকা ঘরে। যে-ঘরে হয়তো তখন কোনও ক্লাস অফ রয়েছে। এমন কি, বিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময়েও ছাত্রীদের বসার স্থান ঠিক করার জন্য ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় নষ্ট হয়ে যায়।

শুধুই কী স্কুল? ওই সাঝিরহাট অঞ্চলের কলেজটিরও প্রায় একই দশা! প্রচুর ছাত্রছাত্রী। কিন্তু অধিকাংশ দিনই ক্লাস হয়না। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ঠিকমত কলেজে আসেন না। এলেও সময় মতো ক্লাসরুমে আসেন না। কোনওদিন একটা, কোনওদিন দুটো মাত্র ক্লাস হয়। কোনওদিন আবার তাও হয়না। প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা একেবারেই কম। দীর্ঘদিন কোনও নতুন নিয়োগ নেই। ছাত্রছাত্রীদের সময় ও যাতায়াত ভাড়াই নষ্ট হয়। ওই কলেজেও ছাত্রছাত্রীর ভারে ও ভিড়ে শিক্ষার পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে।

পড়াশোনার জন্য সামান্য সুস্থ পরিবেশ বলে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। চূড়ান্ত গড্ডালিকার মধ্য দিয়ে চলছে কলেজটি। ছাত্রছাত্রীদের

কলেজ যাতায়াতই সার। পড়াশোনার বালাই নেই। সময়ের পাকদন্ডি পথ ধরে দিন যায়। মাস যায়। বছরও ঘুরে যায়। কিন্তু সিলেবাস আর শেষ হয়না। শেষ করার কথা কেউ ভাবেনও না। অধ্যক্ষ নাজেহাল। ফলে তারা বাধ্য হচ্ছে প্রাইভেট ট্যুশানির দিকে দৌড়তে। তা নাহলে পরীক্ষায় বসবে কিভাবে? এই বাস্তব পরিস্থিতিকে কী বলবেন আপনি? শিক্ষার 'উন্নয়ন?'

অথচ ওই কলেজে প্রতিবছর ঘটা করে নবীনবরণ অনুষ্ঠান সহ চড়া দাগের অন্যান্য 'সাংস্কৃতিক কর্মসূচি' পালিত হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে নামিদামি শিল্পীদের আনা হয়। উদ্দাম নাচ-গান-কথায় মুখরিত হয়ে ওঠে কলেজ প্রাঙ্গণ। ডিজে-র বুক-কাঁপানো নয়, বাড়ির দরজা-জানলা কাঁপানো সুতীব্র আওয়াজে আশপাশের বাড়িতে অবস্থান করাটাই কঠিন হয়ে ওঠে। ঘরে বয়স্ক অসুস্থ রুগি থাকলে তো কথাই নেই। কলেজের 'নবীনবরণ' অনুষ্ঠান তখন বাস্তবে বাড়ির 'প্রবীণ-মরণ' অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়।

এই লেখায় মাত্র দু'টি স্কুল আর একটি কলেজের কথা উল্লেখ করা হল। এমন চালচিত্র এ রাজ্যের অনেক স্কুল-কলেজে গেলেই দেখা যাবে। তাই রাজ্যে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যায় 'বাড়লেও' তার শিক্ষার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে কোনও নজর দেওয়া প্রয়োজনবোধ করেননি কর্তৃপক্ষ। শিক্ষাপ্রাঙ্গণ বা শিক্ষাভবনের সংখ্যা আর বাইরের চাকচিক্য বেড়েছে। কিন্তু পড়াশোনার জন্য যে পরিবেশ প্রয়োজন তার কোনও উন্নতি ঘটেনি। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রক এবং তাঁর কান্ডারিরা এ-নিয়ে নীরব থেকেছেন।

স্বীকার্য, আজ আর পড়াশোনার জন্যে নয়, একটি শংসাপত্র (সার্টিফিকেট) পাওয়ার জন্যেই ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়া-আসা। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে শিক্ষার চেহারা ও চরিত্র নিয়ে বড়াই করা কতোটা সমীচীন? অথচ বাস্তব অবস্থাকে সচেতনভাবে আড়াল করে নির্লজ্জ-বেহায়ার মতো সরকার বাহাদুর শিক্ষার 'উন্নয়ন'-এর কথা বলেন। মিথ্যের বেসাতি করে গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করেন। 'আমরা কতো স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি করেছি।' আসলে বিল্ডিং নির্মাণ করেই দায়িত্ব সেরেছে সরকার। সেখানেও আমদানি।

বলাবাহুল্য, মিথ্যের চেয়েও অর্ধসত্য আরও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। এই ভয়ঙ্কর কাজটিই অত্যন্ত সচেতনভাবে করে চলেছেন 'এগিয়ে থাকা' রাজ্যের সরকার বাহাদুর। এ রাজ্যে ৮ হাজারের ওপর বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলিতে পড়াশোনা হয়না। সুষ্ঠু বদলি-নীতির অভাবে কোনও স্কুলে ১০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ১২ জন শিক্ষক তো কোনও স্কুলে ২০০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ২ জন শিক্ষক। জেলার স্কুল-পরিদর্শকেরা কোনও দিক নজর দেন না। অফিসে আসেন-যান—বেতন পান। ব্যস! দায়িত্ব শেষ!

অন্যদিকে মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ নিয়ে অযোগ্যদের ঢালাও চাকরি দেওয়া হয়েছে। এবং মহামান্য আদালতের নির্দেশে তাঁদের (অযোগ্যদের) চাকরি চলে যাওয়া রুখতে মন্ত্রীসভার জরুরি বৈঠক ডেকে তাঁদের জন্য বাড়তি পদ তৈরির অনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সরকার বাহাদুর। শিক্ষাক্ষেত্রে এই নির্বিকল্প নৈরাজ্য ও অরাজকতা রাজ্যকে কয়েক কদম পিছিয়ে দিলেও তাতে কোনও হেলদোল নেই রাজ্য সরকারের। তাঁরা আছেন তাঁদের মিথ্যে আর দ্বিচারিতার খোলসের মধ্যেই। কেউ জানেন না, এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির শেষ কোথায়?

রাজ্যের কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-অধ্যাপকের অভাব। অধিকাংশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়তে নেই অধ্যক্ষ-উপাচার্যও। যাঁরা আছেন, তাঁদের অনেকের বিরুদ্ধে উঠছে নানাবিধ গুরুতর অভিযোগ। শিক্ষাঙ্গণে যা একেবারেই কাম্য নয়। কিন্তু সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির সুবাদে রাজ্য সরকার সেদিকে নজর দিতে নিতান্তই নারাজ। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রক থেকে শিক্ষাপর্ষদের উঁচুমাথারা যেভাবে কারাগারের (সংশোধনাগার) সেল ভর্তি করেছেন—তাতে আর যাহোক রাজ্যের মান-সম্মান পথের ধুলোয় লুণ্ঠিত হয়েছে। আমরা গলা উঁচু করে বাংলার জয়গান গাই! লক্ষ্য অলক্ষ্যে হাসেন অন্য রাজ্যের মানুষ।

এই কী 'এগিয়ে থাকা' বাংলার প্রকৃষ্ট নমুনা? নাকি 'অভিশপ্ত বাংলা'র সেরা নমুনা?

রাজ্যের ভেঙ্গে-পড়া শিক্ষাক্ষেত্রে 'অনিলায়ন' আর 'মমতায়ন'-এর মধ্যে মৌলিক ফারাক খুঁজতে রাজ্যবাসী দিশেহারা। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে এই 'অভিশপ্ত বাংলা'য় সরকার বদলালেও এই চলমান দূরবস্থার সামান্যতম পরিবর্তন ঘটবে কী? এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। কারণ আজকের সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি কোনও ভালো কিছুর প্রমাণ রাখতে একেবারেই অপারগ। তাই আশা জাগায় না মনে। বরং আরও এক ভয়ঙ্কর আশঙ্কারই জন্ম দেয় আমাদের মনে। বাস্তব পরিস্থিতি কিন্তু সেদিকেই দ্রুত এগোচ্ছে।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ-দুর্নীতি নিয়ে মহামান্য শীর্ষ আদালতের সাম্প্রতিক রায় (যোগ্য-অযোগ্য মিলিয়ে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত) রাজ্যের ভেঙ্গে-পড়া শিক্ষাক্ষেত্রকে আরও কয়েক ধাপ শুধু পিছিয়ে দেওয়াই নয়, একেবারে খাদের কিনারে এনে দাঁড় করিয়েছে যেখান থেকে ফিরে আসা অত্যন্ত কঠিন। এনিয়ে সরকার ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে একে অপরকে দোষারোপের পালা চলছে। এসএসসি 'স্বশাসিত সংস্থা' বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছেন।

অথচ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এর দায় তিনি কোনওভাবেই এড়াতে পারেন না। তিনি 'জানেন না এমন কোনও বিষয় নেই'—বরাবর এমনটাই দাবি করে থাকেন যিনি—তিনি এখন না-জানার ভান করে থাকেন কিভাবে? পরন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে ফেলার দায় চাপিয়ে নিজেকে নিষ্কলুষ প্রমাণের অপ-চেষ্টা করে চলেছেন। অন্যদিকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁদের দলের মিছিলে হাঁটা 'অযোগ্য দলীয় কর্মী'দের শিক্ষকতার চাকরি দেওয়াটা 'ন্যায্য' বলে প্রকাশ্যে দাবি করছেন।

প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে মিটিং-মিছিলে হাঁটা দলীয় কর্মীদের

(অযোগ্য হলেও) 'শিক্ষকতার চাকরি' দেওয়ার জন্য মন্ত্রীদের আদৌ কোনও কোটা থাকে কিনা আমাদের জানা নেই। এনিয়ে রাজ্য বিধানসভায় নতুন কোনও আইন পাশ হয়েছে কিনা এবং সেই কোটা সংক্রান্ত বিলে রাজ্যপাল কিংবা রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিয়েছেন কিনা তাও আমাদের জানা নেই। আসলে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে 'উন্নয়ন'-এর দাবির সবটাই কেমন যেন ধোঁয়াশায় ভরা। এই ধোঁয়াশা থেকে প্রকৃত সত্যকে খুঁজে পাওয়াটাই এখন অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

এ কোন নির্বিকল্প নৈরাজ্যের মধ্যে বাস করছি আমরা? এই পরিবর্তনই কী চেয়েছিলেন রাজ্যের জনগণ? এর শেষ কোথায়? অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, শিক্ষাক্ষেত্রের এই হালহকিকৎ পিছিয়ে দিচ্ছে কয়েক প্রজন্মকে। এই 'পিছিয়ে পড়া' অংশকে (শিক্ষাহীন নাগরিকদের) নিয়ে রাজ্য আগামীদিন এগোবেই-বা কিভাবে? অথচ এ নিয়ে কারও মধ্যে কোনও দুর্ভাবনা নেই। আমাদের রাজনৈতিক অভিভাবকেরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ নিয়েই কেবল মশগুল। যাঁদের ভোটে এরা নির্বাচিত—তাঁরাই থেকে যাচ্ছেন অন্ধকারে।

চূড়ান্ত বেহাল অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা

সনাতন মুর্মু

উপরের শিরোনাম দেখে সত্যিই বোঝার উপায় নেই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক কতটা বেহাল অবস্থায় আছে। ঠিক এক বছর আগে 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' পত্রিকা'য় (০১.০৬.২০২৪-এ) এই লেখক উল্লেখ করেছিল সর্বোচ্চ আদালতের (এক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট) রায়ে ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল সংক্রান্ত কলকাতা হাই কোর্টের রায়ের উপর স্থগিতাদেশের কথা। এ বছর ৩ এপ্রিল (২০২৫) সুপ্রিম কোর্ট এক অভূতপূর্ব রায়ে কলকাতা হাই কোর্টের সেদিনের (২৪ এপ্রিল ২০২৪) ডিভিসন বেঞ্চের রায়-কেই মান্যতা দিলেন। যদিও যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করে রায়দান হয়নি। তা না হওয়ার কারণ রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতর এতটাই অপদার্থ যে তারা সর্বোচ্চ আদালতে হলফনামায় তা চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়। মোটা দাগে বিচার করলে রাজ্য সরকারকে অপদার্থই মনে হবে। সত্যিই কী পরিবর্তনের সরকারকে যতটা অপদার্থ বলা হচ্ছে তারা কী তাই? না। এর মধ্যে ভোট রাজনীতির যেমন পারমুটেশন-কম্বিনেশন আছে একই সঙ্গে যোগ্য অযোগ্য বাছাই করলে রাজ্যের শিক্ষা দফতর মায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার যে দুর্নীতিগ্রস্ত আইনের চোখে প্রকাশ হয়ে পড়বে। অর্থাৎ সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক ঘোষিত রায়ের ক্ষেত্রে। সেই রায় তো পাল্টানো যাবে না। রাজ্যের শিক্ষা দফতর মায় পশ্চিমবঙ্গের বহুকথিত পরিবর্তনের সরকার যে দুর্নীতিগ্রস্ত আপাদমস্তক তার জন্যে আদালতের রায়ের প্রয়োজন পড়ে? পশ্চিমবঙ্গের দশ-এগারো কোটি জনসংখ্যার শিশু মনেও শিক্ষকদের সম্পর্কে এই ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছে যে যাঁরা তাদের পাঠ দান করছেন তাঁরা কী টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন না নিজ যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছেন?

প্রাপ্তবয়স্কদের বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের (যারা পড়ুয়া) নানান ভাণ্ডারের (লক্ষী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশের নামে বা অন্য নামে) প্রাপ্তি যোগ হয়ে শাসকদলের ভোটবাক্স ভরলেও তাঁদের মানসপট থেকে এই সরকার যে দুর্নীতিগ্রস্ত তা কী মোছা যাবে? যাঁদের প্রাপ্তিযোগ হয় নি তাঁরা সরাসরি অন্য রাজনীতির পক্ষে বা পক্ষে না গিয়েও এই সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করছেন। কেবল মাত্র পাঁচ শতাংশ ভোট (চার শতাংশও হতে পারে) এদিক ওদিক হলেই ক্ষমতায় পৌঁছতে অপেক্ষামানদের কিন্তু অসুবিধা হবে না। তারা ক্ষমতা দখল করে নেবে। কে ক্ষমতায় থাকবে বা কে দখল করে নেবে এই আলোচনা সেই লক্ষ্যে পরিচালিত নয়। এই আলোচনা কেবলমাত্র রাজ্যের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার হালহকিকৎ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকছে।

শেষ পর্যন্ত ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর-যোগ্য বা অযোগ্য—সকলেরই চাকরি বাতিল হলো সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে (২৭ মে ২০২৫)। ফলে এতদিন ধরে যোগ্য বা অযোগ্য যে সমস্ত শিক্ষকরা নানানরূপে আন্দোলন করছিলেন চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে তাঁদের নতুনভাবে পরীক্ষায় বসে নতুন করে চাকরি পেতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশিকায় ৩১ মে ২০২৫-এর মধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করার কথা বলেছেন। রাজ্য সরকার তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরপরই নবান্ন থেকে ঘোষণা করেছেন তাঁরা ৩০ মে ২০২৫-এ বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন এবং প্রত্যাশীরা ১৬ জুন থেকে ১৪ জুলাই ২০২৫ অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। প্যানেল প্রকাশ হবে ১৫ নভেম্বর এবং কাউন্সেলিং শুরু হবে ২০ নভেম্বর ২০২৫ থেকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাতিল পদ ২৪,২০৩ সহ নতুন করে আরও ২০,০০০ পদ অর্থাৎ মোট ৪৪,২০৩ পদে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করবেন। নতুন শূণ্যপদের (২০,০০০) মধ্যে নবম-দশমে শিক্ষকের অতিরিক্ত শূন্যপদ ১১,৫১৭, একাদশ-দ্বাদশে ৬,৯৬২, গ্রুপ সি তে ৫৭১ এবং গ্রুপ ডি তে ১০০০ নিয়োগ হবে। একই সঙ্গে রাজ্য সরকার নাকি বাতিল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য রিভিউ পিটিশন দাখিল করবে। এদিকে নতুন করে নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি স্কুল সার্ভিস কমিশন জারি করেছে। অযোগ্যরা আবেদন করতে পারবে না বলে জানানো হয়েছে। অযোগ্যদের সত্যিই কী চিহ্নিত করা গিয়েছে? এস এস সি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ৩০ মে ২০২৫-এ।

এখন প্রশ্ন হলো বাতিল যোগ্য শিক্ষকরা নতুন করে পরীক্ষায় সফল হতে পারবেন? শ্রেণিকক্ষে পড়ানো এবং প্রতিযোগিতামূলক

পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য প্রস্তুতি—দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর বিষয়। এখানে বাতিল শিক্ষকদের পরীক্ষায় বসার জন্য বয়সের ছাড় দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু ৪০ উর্দ্ধ যে সমস্ত প্রার্থীরা সফল হয়ে নতুন করে চাকরিতে প্রবেশ করবেন তাঁদের চাকরির সময়সীমা (টেনিউর) তো সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে! অবসরকালীন সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেও তাঁদের বঞ্চনার শিকার হতে হবে। এমনটা নয় যে পূর্বেকার দশ বছরের অভিজ্ঞতায় চাকরি (শিক্ষকতার) ছেড়ে নতুন করে পরীক্ষায় বসে পুনরায় চাকরি পেলে এই দশ বছরও অবসরকালীন সময়ে যোগ হয়ে যাবে। এই বিবেচনায় এঁরা (চাকরি বাতিলরা) একই সুযোগ সুবিধা পেয়ে যাবেন? বহু কিছু প্রশ্নেরই কোনও উত্তর জানা নেই চাকরি হারানো যোগ্য শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে। এবং রাজ্য সরকারেরও স্পষ্ট কোনও নির্দেশিকা এ প্রশ্নে ঘোষিত হয় নি। ফলে যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আম ও ছালা দুইই গেল নতুন করে তাঁরা পরীক্ষায় সফল হয়ে চাকরি পেলেও। আম ছালা বলতে নিশ্চিত চাকরি ও চাকরির নির্দিষ্ট টেনিয়র। একটাই সুবিধা এঁরা পাবেন তাহলো ১০০ নম্বরের মধ্যে অভিজ্ঞতার ১০ নম্বর।

মুখ্যমন্ত্রী স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বিরোধীদের (এক্ষেত্রে মূলত বাম—যাঁরা যোগ্য অযোগ্য সনাক্তকরণে মূল ভূমিকা রেখেছিলেন যার ফলে দুর্নীতির বিষয়টি জন সমক্ষে ধরা পড়ে) তোপ দাগেন যে তাঁদের জন্যই শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিল হল। কিন্তু কোনওসময়ই তিনি বলবেন না বা বলেন না যে তাঁর দলের মন্ত্রী-নেতাদের জন্য এবং তাঁর দল অনুগত আমলাদের জন্যই শিক্ষায় দুর্নীতির (বা স্বাস্থ্যে) বা অন্যান্য পরিষেবায় শিকড় এত গভীরে প্রোথিত হয়েছে যার থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও উপায় নেই। খোদ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা প্রাক্তন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য (পার্থ-ঘনিষ্ঠ) এখনও জেলের ঘানি টানছেন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হয়ে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান মানিক ভট্টাচার্য জামিনে ছাড়া পেলেও নতুন করে তিনি পুনরায় গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কায় দিন গুণছেন। কেন না ৩২,০০০ প্রাইমারি শিক্ষকদের চাকরিও দুর্নীতির অভিযোগে আদালতের রায়ে বাতিল হয়ে যেতে পারে। যে সময় ৩২,০০০ প্রাথমিক শিক্ষক চাকরি পেয়েছিলেন মানিক ভট্টাচার্য তখন পর্ষদ চেয়ারম্যান ছিলেন। শিক্ষা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত আরও কয়েকজন জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। যেমন পার্থ-ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (যাঁর ফ্ল্যাটে ৫০ কোটিরও বেশি নগদ ক্যাশ তদন্তকারীরা উদ্ধার করেছিলেন), পার্থর আপ্তসহায়ক সুকান্ত আচার্য, উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের চেয়ারম্যান কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় বা আরও কিছু কুচো নেতা বা আমলা।

ওদিকে কলেজ সার্ভিস কমিশনের নিয়োগও কার্যত বন্ধ হয়ে আছে। রাজ্যের প্রায় ৫০৬টি কলেজে বহুপদ শূন্য হয়ে আছে, যেমন বিদ্যালয়গুলিতেও শূন্যপদ দীর্ঘদিন যাবৎ পূরণ করা হয়নি। বিদ্যালয়ে শেষ এস এস সি রিক্রুটমেন্ট হয়েছিল ২০১৬ সালে, শিক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতি যে সময়ে। কলেজগুলিতে আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ শুরু হয়েছিল বাম জমানায়। বাম জমানার বহু নেতানেত্রী আত্মীয় পরিজন সে সময় দলের আনুকূল্যে আংশিক সময়ের কলেজ শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন ইউজিসি কোয়ালিফিকেশন (নিদেনপক্ষে স্নাতকোত্তরে ৫৫ শতাংশ নম্বর পাওয়া) না থাকা সত্ত্বেও। সেই শিক্ষকরাই আন্দোলন করে স্থায়ী আংশিক সময়ের শিক্ষক হয়েছিলেন। তাঁদের বেশ কযেকজনের ইউজিসি কেয়ালিফিকেশন (নেট, স্লেট, পিএইচডি বা এমফিল বা ৫৫ শতাংশ নাম্বার) থাকা সত্ত্বেও তাঁরা স্থায়ী শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতন পেতেন না। এখনও পান না।

উচ্চশিক্ষায় ওয়েবকুটা সংগঠনের একাধিপত্য থাকার কারণে স্থায়ী শিক্ষকদের মধ্যে পরিবর্তনের সরকার সংগঠন গড়ে তুলতে পারেনি। পরে বর্তমান শাসকদল ক্ষমতায় এসে ওয়েপকুপা নামে এক সংগঠন গড়ে তোলে। কিন্তু সেখানেও স্থায়ী শিক্ষকদের সংখ্যালঘু অংশ যুক্ত হন। এরপর কলেজে কলেজে অতিথি শিক্ষক শাসক দল নিয়োগ করতে শুরু করে যাঁরা কলেজের সেশন শুরু থেকে কয়েক মাসের জন্য ক্লাস পিছু অনারিয়াম বা মাসে ৪ হাজার থেকে ৬ হাজার টাকায় কাজ করেছেন। প্রায় সিংহভাগ অতিথি শিক্ষক ওয়েপকুপা সংগঠনে যুক্ত হন। এরপর শাসকদল কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন ভারী হলে সব অতিথি শিক্ষক ও আংশিক সময়ের শিক্ষকদের এক ছাতার তলায় এনে স্যাক্ট ১ ও স্যাক্ট ২ (স্টেট এইডেড কলেজ টিচার) নাম দিয়ে তাদের পুনরায় নথিপত্র যাঁচাই (বিকাশভবনে) করিয়ে কলেজে কলেজে নিযুক্ত করে, মেমো বার করে। ইউজিসি কোয়ালিফায়েডরা স্যাক্ট ১ (যাঁরা ৩০,০০০ টাকা বেতন পাবেন) এবং নন ইউজিসি কেয়ালিফায়েডরা স্যাক্ট-২ (যাঁরা ২০,০০০ টাকা বেতন পাবেন মাসে)। প্রতিবছর এঁদের ৩ শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধি হবে এবং অবসরে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা এঁরা পাবেন। এই সংক্রান্ত জিও সরকার বের করে এবং ২০২০-র পয়লা জানুয়ারি থেকে স্যাক্ট-১ ও স্যাক্ট-২ রা স্থায়ী হয়ে কাজ করে চলেছেন। এদের সংখ্যা প্রায় দশ হাজারের কাছাকাছি। এঁরা এখন শাসকদলের কলেজ শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত। অর্থাৎ ওয়েপকুপার সদস্য। সেদিক দিয়ে বিচার করলে শাসকদলের কলেজ শিক্ষকসংগঠন এখন সবচেয়ে বড়। বামপন্থী ও কংগ্রেস দল প্রভাবাধীন স্থায়ী শিক্ষকদের সংগঠন ওয়েবকুটা (যার সদস্য সংখ্যা ৫ হাজারেরও কম) বর্তমানে সংখ্যালঘু সংগঠনে পরিণত। ওয়েপকুপার সদস্যপদ নিয়ে শাসকদলের আনুকূল্যে বেশ কয়েকজন স্থায়ী শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, কন্ট্রোলার বা অন্যান্য পদ (ডিন অফ ফ্যাকাল্টিজ, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল সদস্য ইত্যাদি) অলংকৃত করছেন।

কলেজ শিক্ষকদের কথা বলা এই জন্য যে স্যাক্ট-১ ও স্যাক্ট-২ নামধারী শিক্ষকরাও বর্তমানে আতঙ্কে আছেন এই ভেবে যে তাঁদেরও ২০১৬ সালে এসএসসি রিক্রুটেড শিক্ষকদের দশা না হয়! কেন না যে কেউ সুপ্রিম কোর্টে যা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করতেই পারেন এই বলে যে এঁরাও শাসকদলকে টাকা (উৎকোচ) দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। যদিও এঁদের অনেকেই বিশ পঁচিশ বছর যাবৎ আংশিক সময়ের শিক্ষক হয়ে বর্তমানেও কাজে যুক্ত আছেন। আইনি জটিলতায় ইউজিসি কোয়ালিফায়েডই হোন বা নন ইউ জি সি হোন সকলেই এর মধ্যে পড়তে পারেন। বিশেষ করে সরকার পরিবর্তন হলে আশঙ্কাটা বৃদ্ধি পাবে বহুগুণ।

পাশের ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরাতে সরকার পরিবর্তনের পরে সেখানে বহু শিক্ষককে কর্মহীন হতে হয়েছে। প্রায় দশ হাজার শিক্ষক (বিদ্যালয় শিক্ষক) চাকরি হারিয়েছেন। বামফ্রন্ট জমানায় এঁরা চাকরি পেয়েছিলেন। বিজেপি (ভারতীয় জনতা পার্টি) জমানায় ওই ১০,০০০ শিক্ষক চাকরি খুইয়েছেন। কলেজেও বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘদিন রিক্রুটমেন্ট বন্ধ রেখেছিল। রিক্রুটমেন্ট বিজেপি সরকারও বন্ধ রেখেছিল। সম্প্রতি বিজেপি সরকার ২০০ কলেজ শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। দীর্ঘ দশ বছর স্কুল শিক্ষক নিয়োগও সেই রাজ্যে বন্ধ আছে। দশ বছরের মধ্যে বিজেপি সরকার আছে প্রায় আট বছর। ত্রিপুরায় এক সময় কলেজে আংশিক সময়ের শিক্ষকদের স্কুল শিক্ষা বোর্ডের আওতায় এনে তাঁদের পে-প্রোটেকশন দিয়ে (অর্থাৎ স্কুলের শিক্ষকরা যা বেতন পাবেন তাই তাঁদের দেওয়া হয়েছে) স্থায়ী করা হয়েছে। যার মধ্যে বহু শিক্ষকের ইউ জি সি কোয়ালিফিকেশন ছিল না; নিদেনপক্ষে স্নাতকোত্তর স্তরে ৫৫ শতাংশ নম্বরও। যেভাবেই হোক বামফ্রন্ট সরকার সেই সমস্ত অধিকাংশ শিক্ষককে স্থায়ী করে অ্যাবসরব (নিযুক্ত) করে নিয়েছে। অথচ এই বঙ্গে ইউ জি সি কোয়ালিফায়েড বহু শিক্ষক আংশিক সময়ের শিক্ষক কলেজ শিক্ষক হয়েও স্থায়ী শিক্ষকের মর্যাদা পান নি বামফ্রন্ট কিংবা তৃণমূল সরকারের জমানায়। অথচ এই রাজ্যেও নজির আছে বহু আংশিক সময়ের শিক্ষককে বামফ্রন্ট জমানায় ইউজিসি কোয়ালিফিকেশন না থাকা সত্ত্বেও স্থায়ী করার। আংশিক সময়ের বহু শিক্ষকের যোগ্যতামান বহু স্থায়ী শিক্ষকের চেয়েও বেশি থাকা সত্ত্বেও (এমনকি সেই কলেজে ৩০-৪০ জন শিক্ষকের চেয়েও) তাঁর বা তাঁদের স্থায়ী চাকরি জোটেনি। শিক্ষার ক্ষেত্রে এ এক অদ্ভুত বিড়ম্বনা! আবার এও ঘটনা অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন খুব ভাল হলেই যে একজন ভাল শিক্ষক হয়ে উঠবেন তা নাও হতে পারে। শিক্ষাদান নির্ভর করে একজন কত ভাল করে পাঠ্যবিষয়কে রপ্ত করতে পেরেছেন এবং কত সহজভাবে তা ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতে পারছেন। এরজন্য তিনটি ডি অর্থাৎ ডিসিপ্লিন-ডিটারমিনেশন-ডিভোশন অত্যন্ত জরুরি। বাংলায় বললে—শৃঙ্খলা-দৃঢ়সংকল্প-দায়বদ্ধতা। তা কী বর্তমান শিক্ষকদের কাছে আশা করা যায়? যায় না। কারণ তাঁরা ব্যস্ত বেতন পেয়ে শৃঙ্খলা-সংকল্প-দায়বদ্ধতা মুক্ত হয়ে থাকতে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারের রাজত্বে (চোদ্দ বছর হয়ে গিয়েছে) দু'বার স্কুল শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল। যার মধ্যে ২০১৬-র নিয়োগ সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণা করেছেন খোদ সর্বোচ্চ আদালত। স্কুল সার্ভিস কমিশন সর্বোচ্চ আদালতের রায় মেনে ৩০ মে ২০২৫ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। পরীক্ষায় (২০১৬-র) ও যোগ্যতামানে উত্তীর্ণ হয়ে যাঁরা চাকরি খোয়ালেন তাঁরা পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেতে অনিচ্ছুক। তাঁদের দাবি চাকরিতে বহাল থাকার। সে জন্য তাঁরা সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পর থেকেই আন্দোলন করছেন। আন্দোলন করতে গিয়ে তাঁরা কখনও পুলিশের লাঠি বা লাথি খাচ্ছেন, জনসমক্ষে অপদস্থ হচ্ছেন, তাঁদের পুলিশ চূড়ান্তভাবে হেনস্থা করেছে ও করছে। এ দৃশ্য টিভি চ্যানেলে ও খবরের কাগজে প্রতিদিনই সম্প্রচারিত হচ্ছে ও প্রকাশ হচ্ছে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে (কিডনির অসুখ) মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের প্রবীণ কর্মকারের মৃত্যুও হয়েছে। নতুন করে পরীক্ষা দিতে হবে শুনে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং বাথরুমে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারান। জঙ্গিপুর মহাকুমা হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা মৃত ঘোষণা করেন। যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকরা প্রধানমন্ত্রী বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেও কোনও তরফে কেউ গরজ দেখান নি। গরজ দেখাবেনই বা কেন? কারণ তাঁদের তো এঁরা কেউ নন ভোটার ছাড়া! সর্বোচ্চ আদালতের রায়ই শেষ কথা ধরে নিলে চাকরিহারা শিক্ষকরা তাঁদের চাকরি ফেরৎ পাবেন না ধরেই নেওয়া যায়। তাঁদেরকে পুনরায় পরীক্ষায় বসতেই হবে। কারণ যোগ্য অযোগ্য নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই গিয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত, সিবিআই, স্কুল সার্ভিস কমিশন মায় তৃণমূল সরকার সব ক্ষেত্রেই।

পশ্চিমবঙ্গে অতীতে কখনও এরকম পরিস্থিতি দেখা যায় নি। একমাত্র বামফ্রন্ট জমানার শেষলগ্নে প্রাথমিকে জলপাইগুড়ি জেলায় কয়েক হাজার শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগে পুরো প্যানেল বাতিল হয়ে গিয়েছিল হাই কোর্টের রায়ে। রাজ্যের বিরোধী দল সহমর্মী হয়ে শিক্ষকদের চাকরি ফিরিয়ে দিতে না পেরেছে রাজ্য সরকারকে বাধ্য করাতে, না পেরেছে যোগ্য অযোগ্যের লিস্ট তৈরি করে হাই কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে জমা দিতে। আসলে যোগ্য শিক্ষকরা চাকরি ফেরৎ পান এই দাবি পেশ করার চেয়ে তারা ব্যস্ত এই বিষয় (ইস্যু) থেকে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে। রাজনৈতিক ফায়দা তাঁরা পেতে পারতেন ইস্যুটিতে তাঁরা জন আন্দোলনের রূপ দিলে। মুফতে তাঁরা ইস্যুটি চ্যাম্পিয়ন করে ফায়দা লোটার ধান্দায় ছিলেন। বিশেষ

করে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। আর জি করে পড়ুয়ার ধর্ষণ ও মৃত্যুর ক্ষেত্রেও তাঁদের একইরকম মনোভাব দেখা গিয়েছে। সে কারণেই সরকারি বামেরা বিজেপি আর এস এসের সঙ্গে তৃণমূল দলের সেটিং তত্ত্ব প্রচার করে থাকেন।

আসলে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেও শিক্ষা স্বাস্থ্য বা সরকারি অন্যান্য পদে চাকরির ক্ষেত্রে দুর্নীতি এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপে বিরাজমান। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাত—সব রাজ্যই বিজেপি শাসিত এবং এই সব রাজ্যে নিয়োগ পদ্ধতি টাকার বিনিময়ে ঘটেছে এবং ঘটছে। মধ্যপ্রদেশে শিক্ষায় ব্যাপম কেলেঙ্কারির কথা সকলের পরিচিত। রাজস্থানে নিট কেলেঙ্কারি—কোটায় যে সমস্ত কোচিং সেন্টার থেকে নিটের কোচিং দেওয়া হয় টাকার বিনিময়ে (কোটি কোটি টাকা) প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়। এবং কোচিং সেন্টারগুলি তা অবলীলায় বিলি করে থাকে। অর্থাৎ ডাক্তারি পড়তে হলে রাজস্থানের কোটাতে অবস্থিত কোচিং সেন্টারগুলিতে এক একজন ছাত্রছাত্রীকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ভর্তি হতে হবে এবং তাঁরা প্রশ্নপত্র পরীক্ষার বহু আগেই পেয়ে যাবেন। হরিয়ানায় শিক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগে চৌতালার জেল হয়েছিল। দুর্নীতি আছে সর্বত্র। তা বলে এই রাজ্য সরকারের দুর্নীতি মান্যতা পায় না। সুতরাং বিজেপি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সাহস পাবে কোথায়? তাদের তো বিভাজনের রাজনীতি ছাড়া হাতে অন্য কিছু নেই।

ভারবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে এক বাঁকের মুখে দাঁড়িয়েছে। নিউ এডুকেশন পলিসি বা নেপ নয়া শিক্ষানীতি ২০২০ যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণে উত্থাপিত ও পরিচালিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই আলোচনায় নয়া শিক্ষানীতি ২০২২ নিয়ে খুব বেশি উল্লেখ করার সুযোগ নেই। তবে ত্রি-ভাষা নীতি যে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তা বহু বিশেষজ্ঞই বলছেন। এবং এ নিয়ে দক্ষিণের রাজ্যগুলি বিশেষ করে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে ডিএমকে সরকার তামিলনাড়ুতে বিক্ষোভ জানিয়েছে। তাঁরা নেপ মানতে অস্বীকার করছেন।

ভারতবর্ষে এখনও বহু রাজ্যই সাক্ষরতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সাধারণ মানুষকে সাক্ষর করে তোলার উপর নজর দেয় নি। সম্প্রতি খবরে প্রকাশ মিজোরাম দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্য হিসাবে পূর্ণ সাক্ষর রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে। উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যের সাক্ষরতার হার ৯৮.২ শতাংশ। জানা যায় ২০১১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী, কেরলে সাক্ষরতার হার ছিল ৯৪ শতাংশ যা ছিল সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। কেন্দ্রীয় সরকারের 'আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং লাইফলং লার্নিং ফর অল ইন সোসাইটি' (উল্লাস) প্রকল্পের আওতায় সাক্ষরতার হার কম করে ৯৫ শতাংশ হলেই পূর্ণ সাক্ষরতার স্বীকৃতি মিলবে। ফলে কেরল পূর্ণ সাক্ষর হয় নি। মিজোরাম হয়েছে। পশ্চিমবাংলা ভালই পিছিয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও এই রাজ্যে বহু শূন্যপদ পূরণ হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি পেলেও শিক্ষক নেই।

রাজ্যের শিক্ষার বেহাল অবস্থা ধরা পড়ে ছোট্ট একটি পরিসংখ্যানেও। খবরে প্রকাশ ৩৪৮টি সরকারি স্কুল পড়ুয়া শূন্য যেখানে কলকাতারই ১১৯টি আছে সেই তালিকায়। 'জিরো এনরোলমেন্ট'-এর চিত্র গ্রাম বা শহরে প্রায় এক। এই সব স্কুলের এই হাল হয়েছে ২০২০ থেকে ২০২৪-এর মধ্যে। পড়ুয়া শূন্য স্কুলের তালিকায় শীর্ষে অবস্থান কলকাতার যেখানে ১১৯টি স্কুলে গত চার বছরে একজনও ছাত্র ভর্তি হতে আসে নি। উত্তর ২৪ পরগণার ৬০টি স্কুলেরও একই অবস্থা। পড়ুয়াশূন্য ৩৪৮টি স্কুলের মধ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ প্রাথমিক এমনকি মাধ্যমিক স্কুলও আছে। এই স্কুলগুলি পড়ুয়াশূন্য হওয়ার অন্যতম কারণ হিসাবে শিক্ষকদের একাংশ মনে করছেন শহরাঞ্চলে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। অন্যান্যদের মতে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর ঘাটতি। পরিকাঠামোর অনুন্নয়ন—এই সব প্রশ্নে ছাত্রছাত্রীরা বাংলা মাধ্যম সরকারি বা সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। গাছ তলায় প্রাইমারি স্কুল চলছে এরকম বহু উদাহরণ ছিল বা এখনও থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। ক্যানিং অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামে বামফ্রন্ট জমানায় এ দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়েছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে শিক্ষা বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা এখনও উচ্চবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নিম্নবিত্ত, ভূমিহীন কৃষক, সাধারণ শ্রমিক ও মেহনতী বাড়ির পড়ুয়াদের মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক দূর অস্ত এমন কি উচ্চ প্রাথমিক পর্যন্তও যাওয়ার ক্ষমতা নেই। সরকারেরও সেই সদিচ্ছা নেই মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তদের ব্যতিরেকে শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তোলার। এমনকি যাঁরা উচ্চশিক্ষা লাভ করে শিক্ষকতার চাকরিতে নিয়োগপত্র পান তাঁরাও এই মহৎ বৃত্তিকে আর পাঁচ বৃত্তির স্তরেই নামিয়ে আনেন। প্রতিযোগিতা চলে সুযোগ-পাওয়াদের মধ্যেই। বঞ্চিতরা চিরকালই বঞ্চিত থেকে গিয়েছেন। কতিপয় ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে নিজের রোজগারের টাকা গ্রাসাচ্ছাদন বাদ দিয়ে পুরোটাই সার্বিক শিক্ষার কাজে ব্যবহার করেছেন। সেই ব্যক্তিদের কেউ প্রচারের আলোয় আসেন বা প্রাচরের আড়ালেই থেকে যান। সুতরাং দলিত, দুঃস্থ, দরিদ্র, নিম্নবর্গীয় ও মেহনতীরা বঞ্চিতই থেকে যান। সেই কারণেই দুর্নীতির গর্ভেই শিক্ষাব্যবস্থার অবনমন ঘটে। যতদিন শিক্ষাব্যবস্থা উচ্চ শ্রেণি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে ততদিন দুর্নীতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে থাকবে। শিক্ষা সার্বিক সর্বজনীন না হলে শিক্ষাব্যবস্থা দুর্নীতিমুক্ত হবে না। ইতিমধ্যেই জুন ২০২৫ এর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের ১০জন বিকাশ ভবনের সামনে আমরণ অনশন শুরু করেছেন চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে। তাঁরা নতুন করে স্কুল সার্ভিস কমিশনের জারি করা নোটিশ অনুযায়ী পরীক্ষায় বসতে অনিচ্ছুক। এদিকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহ এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের ভাতা দেওয়ার বিষয়ে রাজ্যের সিদ্ধান্তের উপরে অন্তবর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছেন, যা থাকবে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

২০.০৬.২০২৫

অন্যভুবন

ইতিহাসের আলোয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দী। বাংলার সামাজিক আন্দোলনের পীঠস্থান এই কলকাতায় সংবাদপত্র ছিল বিদ্রোহ সংগঠিত করার অন্যতম মাধ্যম। তেমনই একটি সংবাদপত্র ছিল 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় যাঁকে 'ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক' নামে অভিহিত করা হয়। রাজা রামমোহন রায় চিন্তার সূত্রে ধরতাই দিয়ে গেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত আপন আপন পথে দুর্বার গতিতে চলেছেন। ইংরেজদের সমালোচনা করছেন তাদেরই ছত্রছায়ায় থেকে, এমন মানুষেরা সংখ্যাও একদম কম নয়। ডিরোজিও প্রভাবিত নব্য সমাজের সেই দৃপ্তভাব অনেকটা স্তিমিত। এমতাবস্থায় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বশিক্ষিত, স্বনির্ভর এবং অকুতোভয় এক চরিত্র। নীলচাষীদের সঙ্গে একা নিরলস সংগ্রামের সাথী। ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে একা লিখে গেছেন। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির উদাহরণ টেনে দেখিয়েছেন। ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের অনেক কিছু শেখার আছে। ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহকে 'জাতীয় মহাবিদ্রোহ' বলা যায় কি না সে বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা আজও তর্ক জোড়েন, অথচ হরিশ্চন্দ্র সেই সময়েই দ্ব্যর্থহীনভাবে হিন্দু প্যাট্রিয়টের পত্রিকায় লিখলেন 'মহান জাতীয় বিদ্রোহ'। হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও যুবক সম্প্রদায়কে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন, তারপর তাঁকে অনুসরণ করে কাশীপ্রসাদ ঘোষ কাব্য রচনা করছেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রাজপুত কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে লিখেছেন স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়। হরিশ্চন্দ্রের লেখা দৃঢ়, স্পষ্ট। নামোল্লেখ করে সরাসরি আঘাত। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর হিন্দু প্যাট্রিয়টের পরবর্তী সম্পাদক গিরীশচন্দ্র ঘোষ লিখেছিলেন, ''তাঁরই জন্য অতি সম্প্রতি আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য অনুধাবন করতে পেরেছি।''

হরিশচন্দ্র

হরিশ্চন্দ্র মামারবাড়িতে মানুষ। পিতা রামধন মুখোপাধ্যায়। মায়ের নাম রক্মিনী দেবী। কলকাতার ভবানীপুরে রুক্মিনী দেবী থাকতেন। দুই পুত্র হারাণচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্রের বয়স যখন ৬ মাস, তখন রামধনের মৃত্যু হয়। মামার বাড়ি থেকে ইউনিয়ন স্কুলে ভর্তি হন। ছোটবেলা থেকে পাঠ্যবিষয়ে তাঁর অনুরাগ শিক্ষকমহাশয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ইউনিয়ন স্কুলে ৬-৭ বছর পড়ার পর সংসারের প্রয়োজনে নিতান্ত কিশোর অবস্থায় চাকরির খোঁজে বেরোতে হল। ১৪-১৫ বছরের কিশোর ডালহৌসি পাড়ায় এক নিলামদার কোম্পানিতে মাসিক দশ টাকা বেতনের বিল লেখকের চাকরি পান। আবার তিনি পড়াশোনায় মন দেন। নিজে নিজে পড়তে চেষ্টা করেন। টলা কোম্পানির কাছে, যেটি নিলামদার কোম্পানি, আবেদন করলেন বেতন বৃদ্ধির। কোম্পানি অগ্রাহ্য করলে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। ১৮৪৭ সালে মিলিটারি হিসাবরক্ষক বিভাগে একটি করণিকের পদ খালি হয়। কর্মপ্রার্থীদের পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার সুবাদে হরিশ্চন্দ্র পদটি লাভ করেন। সেই সময়ে অডিটার জেনারেল ছিলেন কর্নেল গোণ্ডি এবং ডেপুটি অডিটার জেনালের ছিলেন কর্নেল চ্যাম্পনিজ। এই দুজনেই হরিশ্চন্দ্রকে বিশেষ সম্মান করতেন। হরিশ্চন্দ্রের কর্মনৈপুণ্য সন্তুষ্ট হয়ে গোণ্ডি তাঁকে ধাপে ধাপে পদন্নোতি ঘটান। শেষ পর্যন্ত হরিশ্চন্দ্র সহকারি অডিটার হয়েছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র তাঁর কর্মক্ষেত্রে অপরকে যেমন কোনোদিন অসম্মান করেননি, নিজের আত্মসম্মান বরাবর বজায় রেখেছেন। দোহারা, ঈষৎ গৌরবর্ণ, লম্বা এই মানুষটি অডিটার অফিসে যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি অফিসের পরিশ্রমের পর মাসিক দু টাকা চাঁদা দিয়ে মেডকাফে হলে গিয়ে যখন পড়ছেন তখনও তিনি স্বতন্ত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝ বরাবর জ্ঞান অর্জনে কোনো সীমারেখা ছিল না। হরিশ্চন্দ্র স্কুলের পাঠ শেষ করতে না পারলেও দীর্ঘদিন ধরে আইনি পরামর্শ দিয়ে গেছেন। কথিত আছে শ্রী প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সঙ্গে তর্কে সমকক্ষ হয়ে ওঠার বাসনায় আইনি পাঠে বিশেষ মনোযোগী হয়েছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ; পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ। অক্ষয়কুমার দত্ত যুক্তিবাদী বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তক। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রথম দেখালেন রাজনৈতিক প্রবন্ধের ধরতাই। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনই হোক বা সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন হোক, তাঁর লেখনি ক্ষুরধার হয়ে উঠছিল ক্রমশ। তবে হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে এমন কাজ সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র উদার কিছু মানুষ পাশে ছিলেন বলে। ইংরেজ 'আপিসে' কাজ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ করা বড় সহজ কাজ ছিল না। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা বুঝতে সুবিধে হতে পারে। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ তখন মি. লব। গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যাম্বেল। বাংলা কাগজে লব লেখেন 'ব্রিটিশ রাজ' সম্পর্কে। প্রবন্ধটি অনেকের চোখে পড়ে। ক্যাম্বেল ডেকে লবকে এমন প্রবন্ধ রচনা করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি রাজকর্মচারি হয়ে এমন লেখা প্রকাশ করতে পারেন না। হরিশ্চন্দ্র রাজকর্মচারি হয়েও কিছু উদার মানসিকতার মানুষ পাশে পাওয়ার কারণে কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন। হরিশ্চন্দ্র অল্প বয়স থেকেই খবরের কাগজ পড়তে এবং তাতে লিখতে ভালবাসতেন। হিন্দু পেট্রিয়টের দায়িত্ব নেবার আগে সমকালের ইংরেজি কাগজে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। হিন্দু ইনটেলিজেন্সিয়া কাগজে অনেকগুলি

প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৮৪৯ সালে ঠাকুর পরিবার বেঙ্গল রেকর্ডার নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করতে শুরু করে। হরিশ্চন্দ্র সেখানে লিখতে আরম্ভ করেন।

সেকালে শিক্ষিতের হার এত কম ছিল এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব কম খবরের কাগজ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। স্বভাবতই কাগজ চালানো একপ্রকার বিলাসিতা ছিল। এইরকম অবস্থায় হিন্দু প্যাট্রিয়ট কয়েক বছর চলার পর বন্ধ হবার উপক্রম হল। পত্রিকাটির মালিক মধুসূদন রায় হিন্দু প্যাট্রিয়ট বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে হরিশ্চন্দ্র হিন্দু প্যাট্রিয়ট ভাই হারাণ চন্দ্রের নামে কিনে নেন। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা চলতে শুরু করে ভবানীপুর থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল। গ্রাহক বাড়তে লাগল। দেশের মঙ্গলকে উদ্দেশ্য করে প্রবন্ধ বেরোতে লাগল। কিন্তু আয়ের থেকে ব্যয় বেশি হতেই থাকল। পাইকপাড়ার জমিদার অর্থ সাহায্য করতে চাইলে হরিশ্চন্দ্র স্বাবলম্বনকেই আশ্রয় করে চললেন। অক্ষর ক্রমশ খারাপ হতে থাকায় রাজা প্রতাপচন্দ্র নতুন টাইপ কিনে দেন।

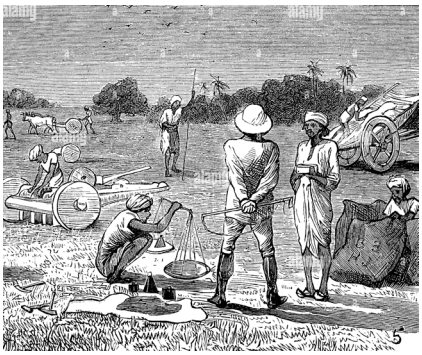

বলপূর্বক নীলচাষ

সপ্তাহে একদিন প্রকাশিত হত বটে কিন্তু মানুষের মনে হিন্দু প্যাট্রিয়ট এক স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিল। ১৮৫৪ সালে হিন্দু প্যাট্রিয়টে ছাপা হল ''হিন্দু ও ইউরোপীয় সভ্যতার তুলনা।'' প্রবন্ধটিতে যেসব দিকে নির্দেশ করা হয়েছিল সেই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর ইংরেজ পণ্ডিতদেরও ভাবিয়ে তুলেছিল। লর্ড ডালহৌসির শাসনকালে অনেকগুলি রাজ্যকে ইংরেজদের অধীন করে ফেলা হয়। অযোধ্যা, সেতারা, ঝাঁসি প্রভৃতি রাজ্য ইংরেজরা 'দখল' করে নিলে হরিশ্চন্দ্র হিন্দু প্যাট্রিয়টের মাধ্যমে তীব্র সমালোচনা করেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহী সিপাহী এবং কৃষকদের অভ্যুত্থান মিরাট থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে লক্ষ্ণৌ আরও পরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতায় এই সংবাদ এসে পৌঁছলে ইংরেজরা ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে বেশিরভাগ সময় গঙ্গার ওপরে জাহাজে গিয়ে থাকতে লাগলেন। ইংরেজরা মত প্রকাশ করছিলেন দেশীয় লোকেদের কাছে অস্ত্র রাখা চলবে না। হরিশ্চন্দ্র তাঁর কাগজে তীব্র আপত্তি জানালেন। আইন প্রস্তুত করে বিষয়টি লাগু করতে চাইলে হিন্দু প্যাট্রিয়ট বিরোধিতা করল। খবরের কাগজকে হাতিয়ার করে ইংরেজরা নতুন নতুন বিষয়ে দেশীয় মানুষদের স্বত্তাধিকার লোপ করার চেষ্টা করতে লাগল। কলকাতার কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত কাগজ ইংরেজদের পক্ষে গলা ফাটাল। একমাত্র হরিশ্চন্দ্র একা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে লিখে চললেন। লর্ড ক্যানিং তখন ইংরেজ প্রধান। সেসিল বিডন সেক্রেটারি। লর্ড ক্যানিং হরিশ্চন্দ্রকে তাঁর লেখনীর জন্য শ্রদ্ধা করতেন। হরিশ্চন্দ্রের সাহায্য পেয়ে লর্ড ক্যানিং বিদ্রোহ দমনের নমনীয় নীতি প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে জানা যাচ্ছে এই জন্য ইংরেজ সাধারণ ক্যানিং-য়ের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

বিদ্রোহ শেষ হওয়া পর্যন্ত হরিশ্চন্দ্র ক্যানিংয়ের পক্ষে লিখেছিলেন। শুধু তাই নয়, রাজকর্মচারীদের যদি আইনবর্হিভুত কাজ তাঁর গোচরে আসত, তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হিন্দু প্যাট্রিয়টে লিখতেন। ক্যানিং হিন্দু প্যাট্রিয়টের সংবাদকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন। ১৮৫৭ সালের ৩১ জুলাই গভর্নর জেনারেল একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। বিদ্রোহী ও অন্যান্য ভারতীয়দের প্রতি অযথা কঠোর নিয়ম যাতে প্রয়োগ করা না হয় সেই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি। এই ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হলে ইংরেজদের কাছে লর্ড ক্যানিং 'দয়াশীল ক্যানিং' হিসেবে বিদ্রুপের পাত্র হয়ে পড়েছিলেন। ক্রমে বিদ্রোহ স্তিমিত হল। পার্লামেন্টে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারতের শাসনভার মহারানির হাতে ন্যস্ত করার প্রস্তাব পাশ হল। এই প্রস্তাবের পক্ষে ১৮৫৮ সালে হরিশ্চন্দ্র একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এর পরে পরেই মহারানি ভিক্টোরিয়া ভারতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

নীল বিদ্রোহ সেই সময়ে বাংলার প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। নীল কুঠির ইংরেজদের অত্যাচার নিয়ে ভুম্যধিকারীদের প্রতিবাদ লোকমুখে ফিরত। ১৮৬০ সালে জে পি গ্রান্ট দ্বিতীয় 'ছোটলাট' হয়ে এলে নীল বিদ্রোহের অত্যাচার দমন হবার আশা সঞ্চার হল। এই বছরে একটি আইন পাস হয়। এই আইন অনুসারে নীল চাষ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। হরিশ্চন্দ্র এই কমিশনের সামনে জবানবন্দি দেন। দিনটি ছিল ৩০ জুলাই ১৮৬০। এই জবানবন্দি থেকে হরিশ্চন্দ্রের কতগুলি বিষয় পরিষ্কার হয়। প্রজার পক্ষ নিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দরখাস্ত লিখেই দায়িত্ব শেষ করতেন না। সেখানে কাজ না হলে কলকাতায় যাঁরা ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে আসতেন হরিশ্চন্দ্র নিজ ব্যয়ে তাঁদের আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন। একটা সময় ভবানীপুর গ্রামের গৃহ দরিদ্র প্রজার আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। মহাবিদ্রোহের সময় যেমন নীল বিদ্রোহের সময় হরিশ্চন্দ্র আপন ক্ষমতার বাইরে গিয়ে দরিদ্র প্রজাদের সাহায্য করেছেন। জবানবন্দি দেবার পর তিনি মাত্র এক বছর বেঁচে ছিলেন। ১৮৬১ সালের ১৪ জুন, শুক্রবার মাত্র ৩৮ বছর বয়সে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দেহাবসান হয়।

১৮৬১ সালের ১২ জুলাই ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাগৃহে একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। রমানাথ ঠাকুর সভার সভাপতিত্ব করেন। রামগোপাল ঘোষ বক্তৃতা দেন। হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, জঙ্গীপুরে স্মরণসভা আয়োজিত হয়। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু প্যাট্রিয়ট একটা সময়ে সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে তাঁর স্মরণসভায় সম্পাদক হরিশ্চন্দ্রের দক্ষতা নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বর্তমানে প্রায় অপরিচিত এমন এক ব্যক্তিত্বকে আলোতে নিয়ে আসা বর্তমান প্রজন্মের কাছে সত্যিই এক বড় কর্তব্য।

আন্তর্জাতিক

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন: মার্কিন সমাজ— অর্থনীতির প্রতিফলন

গ্যব্রিয়েল লোপেজ

বিশ্বের - সর্বাপেক্ষা সামরিক ও প্রযুক্তি শক্তিধর এবং রাজনীতি ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রক; চিনের পর দ্বিতীয় বৃহৎ অর্থনীতি (২৯.১৭ ট্রিলিয়ন বা লক্ষ কোটি ডলার); তৃতীয় বৃহত্তম (৯.৮ লক্ষ বর্গ কিমি) ও জনবহুল (>৩৪০ মিলিয়ন বা ৩৪ কোটি); মাথা পিছু আয়ে অষ্টম (বার্ষিক ০.৮৭ মিলিয়ন ডলার); জীবনযাত্রার মানে ২০ তম (এইচ.ডি.আই ৯.২৭) রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা দ্য ইউনাইটেড স্টেট্স অফ আমেরিকা (দ্য ইউএস)। শিল্প বিপ্লবোত্তর ইংল্যান্ডের বাণিজ্য অর্থনীতির হাত ধরে তার উপনিবেশ আমেরিকায় যে পুঁজিবাদের সূচনা ১৭৭৬ এর স্বাধীনতার পর অপার প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে, ফ্রাঙ্কলিন-এডিসন-টেসলা প্রমুখ বিজ্ঞান সাধকদের যুগান্তকারী আবিষ্কারের উপর আধুনিক শিল্প গড়ে তার বিকাশ। গত শতাব্দীর দু দুটি বিশ্বযুদ্ধে নিজ ভূখণ্ডে যুদ্ধ না হতে দিয়ে, সবচাইতে দেরিতে যোগ দিয়ে, সবচাইতে কম ক্ষয়ক্ষতি অথচ সবচাইতে লাভবান হয়ে এবং বিজয়ী পক্ষে থেকে সে বিশ্বের যাবতীয় সম্পদের দখলদারি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন করে। সেইসঙ্গে বিশ্বের সেরা মগজগুলি ও দক্ষ শ্রমকে জড়ো করে (Brain and Labour Drain) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবিষ্কার ও উল্লম্ফন ঘটিয়ে মহামন্দার (Great Depression) সংকটকে কাটিয়ে পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির রমরমা সৃষ্টি করে। ১৯৯১ তে প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও ভাঙ্গনের পর বিশ্বের একেমাদ্বিতীয়ম শক্তি হিসাবে উঠে আসে এবং আবিশ্ব তার নবউদারবাদী অর্থনীতির বিশ্বায়ন (Neoliberal Globalization) ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ ঘটায়। স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে সারা বিশ্বের কৌতূহল থাকবে। তার উপর যদি ১৩১ বছর আগের প্রেসিডেন্ট গ্রোভার কিভল্যান্ডের সময়কার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে ৪৫ তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর আবার ৪৭ তম প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হন ৭৮ বছর বয়সী ধনকুবের ব্যবসায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প তাহলে তো আলোড়ন সৃষ্টি হবেই। যিনি কিনা ইতিমধ্যে আলটপকা মন্তব্য, খামখেয়ালি কার্যকলাপ, উগ্র স্বভাব, রক্ষণশীলতা, অশ্বেতাঙ্গ ও নারী বিদ্বেষ, পরিবেশ বিরোধিতা প্রভৃতির জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছেন। অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন যৌন কেলেঙ্কারি, আর্থিক কারচুপি, নিয়মভঙ্গ, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে। এমনকি নজিরবিহীনভাবে আইনসভায় কঠোরভাবে নিন্দিত (Impeached) হয়েছেন।

নির্বাচনের অন্তরালে: কোন কোন মহলে ট্রাম্পকে এক হাস্যকর ক্ষ্যাপাটে চরিত্র হিসাবে তুলে ধরা হয়। এর জন্য অবশ্য ট্রাম্পের অপরিশীলিত, অশালীন, আগ্রাসী ও আবোলতাবোল কথাবার্তা ও আচরণ দায়ী। আসলে ট্রাম্প একজন ধূর্ত, শঠ, দুর্নীতিপরায়ণ, সফল ব্যবসায়ী যিনি পিতার বিষয় সম্পত্তি ও গৃহ নির্মাণের (Real Estate) বিশাল ব্যবসাকে বৈধ অবৈধ নানা প্রক্রিয়ায় বহুগুণ বাড়িয়েছেন। তার সঙ্গে হোটেল, ক্যাসিনো, ক্লাব, বিউটি পাজেন্ট, রিয়েলিটি শো, মিডিয়া প্রভৃতি লাভজনক ব্যবসায়ে দু'হাতে অর্থ উপার্জন করেছেন। সঙ্গে চালিয়ে গেছেন স্বেচ্ছাচারী, আইনবিরুদ্ধ ও ব্যাভিচারমূলক কাজকর্ম। অন্যদিকে তিনি একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, স্বার্থপর, উগ্র জাত্যাভিমানী, ডাকাবুকো ব্যক্তিত্ব। অভিবাসীর চাপ, অর্থনীতির সমস্যা, বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা, ইউক্রেন – পালেস্টাইন সহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিবিধ যুদ্ধ ও সমস্যার ভার বহন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিস্পর্ধী চিনা ড্রাগনের উত্থান, দেশের অভ্যন্তরে শ্বেতাঙ্গ শিল্প শ্রমিক ও খামার মালিকদের পড়ন্ত অবস্থা, কর্মহীন ও গৃহহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি, বন্দুক সংস্কৃতি, ড্রাগের নেশা প্রভৃতি মোকাবিলার জন্য পারকিনসন্স ডিজিজ আক্রান্ত বৃদ্ধ জো বাইডেন কিংবা সৌম্য পরিশীলিত কৃষ্ণাঙ্গ নারী কমলা হ্যারিসের পরিবর্তে মার্কিন সমাজ – অর্থনীতিতে, নির্দিষ্টভাবে বাহুল্য হ্রাস পাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ তুলনামূলক কম প্রতিষ্ঠিত শ্বেতাঙ্গ জনসংখ্যার স্বার্থরক্ষায়, মার্কিন স্বার্থবিরোধীদের মারকাটারি হুমকি দেওয়া, দাপুটে, চাঁছাছোলা ভাষায় উগ্র জাতীয়তাবাদী কথাবার্তা এবং জনবাদী (Populist) প্রকল্পের ইঙ্গিত দেওয়া ট্রাম্পের মত এক ব্যক্তিত্বর আবাহনের পথ প্রস্তুতই ছিল।

যদি নিরীক্ষণ করা হয় দেখা যাবে যে মার্কিনীদের পূর্বসূরি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা ভারতীয় উপনিবেশে এমন সব আগ্রাসী গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়দের পাঠাতেন যাঁরা ছলে বলে কৌশলে প্রয়োজনে রক্তগঙ্গা বইয়ে একের পর এক নতুন ভূখণ্ড দখল করে, যাবতীয় সম্পদ লুঠ করে, প্রসিদ্ধ স্থানীয় শিল্পগুলিকে ধ্বংস করে, সেখানকার জনসাধারণকে অত্যাচার ও শোষণ করে, শ্রম নিংড়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ রক্ষা করতেন। পরের পর্বে পাঠানো হত কিছুটা পরিশীলিত এমন একজনকে যিনি কিছুটা সংযম দেখিয়ে, কিছু সংস্কার করে ভারতবাসীর ক্ষোভকে কিছুটা প্রশমিত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সংহত করতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সেরকম। আমরা ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের বিস্তৃত সংকট প্রশমনের কাল থেকেই দেখি। তারপর অ্যাটম বোমা ফেলা হ্যারি ট্রুম্যান ও দাপুটে ডুইট আইসেনহাওয়ার। তারপর মডারেট জন কেনেডি ও লিন্ডন জনসন। তারপর ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া যুদ্ধখ্যাত 'হকিশ' রিচার্ড নিক্সন। তারপর নরমপন্থী জেরাল্ড ফোর্ড ও জিমি কার্টার। তারপর প্রবল আক্রমণাত্মক রোনাল্ড রেগন ও জর্জ হারবারট বুশ। এই পর্বেই গ্রানাডা, পানামা, লিবিয়া ইত্যাদি আক্রমণ, উপসাগরীয় যুদ্ধ। এরপর নরমপন্থী বিল ক্লিনটন। আবার আক্রমণাত্মক জর্জ ওয়াকার বুশ, ইরাক ও আফগানিস্তান আক্রমণ। এরপর পরিশীলিত বারাক ওবামা। তারপর ট্রাম্প।

২০২৪ এর নির্বাচন: এবার নির্দিষ্টভাবে ওই নির্বাচনটির দিকে তাকাই। ২০২২ থেকে ট্রাম্প এই নির্বাচনটিকে পাখির চোখ করে এগিয়েছেন। তার পেছনে সামিল হয়েছেন মার্কিন মুলুক এবং তার বিশ্ব নীতি যারা নেপথ্যে থেকে পরিচালনা করেন সেই তথ্য প্রযুক্তি, ই – বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, মহাকাশ ও পরমাণু গবেষণা, মিসাইল ড্রোন সহ বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র, পেট্রোলিয়াম, ফার্মাসিউটিকাল, সার, বীজ, নির্মাণ, বিমা, অটোমোবাইল, বিষয় সম্পত্তি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবসা, বিনোদন, বিমান পরিবহন প্রভৃতি শিল্পের মার্কিন কেন্দ্রিক বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থাগুলির অতি ধনী মালিকদের একটি বড় অংশ তাদের অফুরন্ত ডলারের ঝুলি নিয়ে। এঁরা বিভিন্নভাবে জনমতকে প্রভাবিত করে থাকেন। যেমন স্পেস এক্স, টেসলা, এক্স করপ, ওপেন এআই প্রভৃতি সংস্থার কর্ণধার দক্ষিণ আফ্রিকায় জাত কানাডা হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসা বিশ্বের সবচাইতে ধনী ইলন মাস্ক। ট্রাম্পের প্রধান পরামর্শদাতা হিসাবে মাস্ক ইতিমধ্যেই ট্রাম্প সরকারের একটি বিশেষ দফতর DOGE এর দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ট্রাম্পের মত এই মাস্ক, ম্যাট গেটজ, পিটার হেগসেথ প্রমুখ ট্রাম্প বাহিনীর অনেকের বিরুদ্ধে মহিলাদের যৌন হয়রানির অভিযোগ রয়েছে।

'আমেরিকা ফার্স্ট', 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন' প্রভৃতি জনপ্রিয় শ্লোগান, কঠোর অভিবাসন ও বাণিজ্য নীতি, রক্ষণশীল শ্বেতাঙ্গ পারিবারিক মূল্যবোধ, গর্ভপাত বিরোধিতা, সমকাম ও তৃতীয় লিঙ্গ নিয়ে 'বাড়াবাড়ি'র বিরোধিতা, পরিবেশ ও জলবায়ু নিয়ে 'মাতামাতি'র বিরোধিতা, যুদ্ধগুলি থেকে সরে আসা, গৃহহীনদের গৃহ ও কর্মহীনদের কর্মসংস্থান সহ অর্থনীতির উন্নতি সাধন, কর কাঠামো ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কার ইত্যাদি দাবিতে ট্রাম্প প্রচারের ঝড় তোলেন। মনোনয়নের প্রাথমিক পর্বে অপর রিপাবলিকান মনোনয়নকারী রন ডি স্যান্তিস ও পরবর্তী পর্বে নিকি হ্যালিকে পরাজিত করেন। বিবেক রামস্বামী এবং তুলসি গডারডকে প্রার্থী পদ তুলে নিতে রাজি করান। অন্যদিকে ডেমোক্রাট প্রেসিডেন্ট জোসেফ বাইডেন প্রাইমারিতে ডিন ফিলিপকে পরাজিত করে নিজেই প্রার্থী হলে বার্ধক্য ও অসুস্থতার কারণে দলের মধ্যেই বিরোধিতার সম্মুখীন হন। শেষে ২১ জুলাই '২৪এ তিনি যখন সরে দাঁড়ালেন তখন অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। ডেমোক্রাটদের তরফে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে প্রার্থী করা হয়। প্রথম থেকে প্রচারে পেছিয়ে পড়েও হ্যারিস অনেকটা সামলে নেন এবং নির্বাচনের আগে প্রায় সমানে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৩ জুলাই পেনসিলভানিয়ায় ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচার সভায় বন্দুকবাজ কর্তৃক ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টা তার দিকে অনেকখানি সহানুভূতির ঢেউ নিয়ে আসে।

নির্বাচনী ফলাফল: শেষদিকে হ্যারিসের সম্ভাবনার গ্রাফ ঊর্ধ্বগামী দেখালেও এবং বিশেষজ্ঞরা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই এর কথা ঘোষণা করলেও ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর দেখা গেল মোট **৫৩৮ টি সম্মিলিত ভোটের (Electoral Votes)** মধ্যে যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে **২৭০** টি সম্মিলিত ভোট প্রয়োজন সেখানে **৩১২ টি পেয়ে ট্রাম্প** বিপুলভাবে জয়লাভ করলেন। **হ্যারিস** পেলেন তার চাইতে বেশ কম **২২৬** টি সম্মিলিত ভোট। **ব্যক্তিগত ভোটের (Individual Votes)** হারঃ **ট্রাম্প (৪৯.৯%)** এবং **হ্যারিস (৪৮.৪%)**। অন্যান্য পদপ্রার্থীদের মধ্যে জিল স্টোন (গ্রিন পার্টি) ০.৫%, রবার্ট কেনেডি (নির্দল) ০.৫%, চেজ অলিভার (লিবারটিয়ান পার্টি) ০.৪%, অন্যান্যরা ০.৩% ভোট পান। **প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলেন ৬৩.৯% ভোটার।**

ব্যাক্তিগত ভোটদানের হারে ট্রাম্প ও হ্যারিসের পার্থক্য অল্প হলেও ইলেকটোরাল ভোটের ক্ষেত্রে অনেকটা পার্থক্য হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন নির্বাচনের **সম্মিলিত নির্বাচক মণ্ডলীর (Electoral Collegium or College)** বিশেষ ভুমিকা রয়েছে। **দেশের ৫০ টি রাজ্যের জনসংখ্যা অনুযায়ী ইলেকটোরাল ভোট নির্ধারিত।** সেই মত বিভিন্ন রাজ্যের ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যা। ১০ বা তার বেশি সংখ্যক ইলেকটোরাল ভোট বিশিষ্ট রাজ্যগুলি হলঃ ক্যালিফোর্নিয়া (৫৪), টেক্সাস (৪০), ফ্লোরিডা (৩০), নিউ ইয়র্ক (২৮), পেনসিলভানিয়া (১৯), ইলিনয়স (১৯), ওহাও (১৭), নর্থ ক্যারোলিনা (১৬), জর্জিয়া (১৬), মিশিগান (১৫), নিউ জার্সি (১৪), ভার্জিনিয়া (১৩), ওয়াশিংটন (১২), টেনেসি (১১), অ্যারিজোনা (১১), ম্যাসাচুসেটস (১১), কলরাডো (১০), মেরিল্যান্ড (১০), মিনসেটা (১০), মিসেসিপি (১০), মিজরি (১০), উইসকন্সিন (১০)।

মেইন ও নেব্রাস্কা বাদ দিয়ে অন্য রাজ্যগুলিতে যে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ ইলেকটোরাল ভোট পান তিনি সেই রাজ্যের সব কটি ইলেকটরাল ভোট লাভ করেন। এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প রিপাবলিকান দের ঘাঁটি টেক্সাস, ফ্লোরিডা, আয়মিং, ইউটা, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, ওকলাহোমা প্রমুখ 'রেড ওয়াল স্টেট্স' গুলি তো বটেই বেশ কিছু ডেমোক্রাটদের ঘাঁটি 'ডিপ ব্লু' স্টেট্স জিতে নেন। ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, মেরিল্যান্ড, ওয়াশিংটন, ইলিনয়স, ম্যাসাচুসেটস প্রমুখ কয়েকটি সমর্থনকারী রাজ্যে ডেমোক্রাটরা তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হন। এছাড়াও নর্থ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, পেনসিলভানিয়া, নেভাডা, অ্যারিজোনা, উইসকন্সিন ও মিশিগান – এই সাতটি দোদুল্যমান 'সুইং স্টেট্স' বা 'পার্পল স্টেট্স'ও ট্রাম্প জিতে নেন। **ট্রাম্পের ঝুলিতে যায় ৩১ টি এবং হ্যারিসের ১৯ টি রাজ্য।** মিনসেটা, ইলিনয়স, কলরাডো ও নিউ মেক্সিকো বাদ দিয়ে সমগ্র উত্তর, মধ্য, মধ্য পশ্চিম, মধ্য পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব রাজ্যগুলি জুড়ে রিপাবলিকানদের লাল ঝড়। উত্তর পূর্বের মেইন থেকে পূর্বের ভারজিনিয়া অবধি অতলান্তিক মহাসাগরের এবং পশ্চিমের প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে এবার ডেমোক্রাটরা সীমাবদ্ধ থাকলেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের একইসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন নির্ধারক কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষ সেনেট ও নিম্ন কক্ষ হাউস অফ রেপ্রেজেন্টেটিভস এর নির্বাচন হল। ১০০ আসন বিশিষ্ট **সেনেটে** (সংখ্যাগরিষ্ঠতা ৫১) **রিপাবলিকানরা ৫৪ টি ও ডেমোক্রাটরা ৪২ টি আসন** এবং **হাউস অফ রেপ্রেজেন্টেটিভস** এর ৪৩৫ টি আসনের

(সংখ্যাগরিষ্ঠতা ২১৮) মধ্যে **রিপাবলিকানরা ২০৪ টি ও ডেমোক্রাটরা ১৮২ টি আসন** লাভ করেন। সুতরাং কংগ্রেসের দুটি কক্ষে এগিয়ে থাকায় ট্রাম্পের এবার আইন প্রণয়নে খুব সুবিধা হবে। ঐ সময়েই **১১ টি রাজ্যের গভর্নর নির্বাচনে রিপাবলিকানরা আটটি রাজ্যে ও ডেমোক্রাটরা তিনটি রাজ্যে জয়লাভ করেন।** এছাড়াও **স্টেট, কাউন্টি ও স্থানীয় স্তরের নির্বাচনেও** রিপাবলিকানরা ভাল ফল করেন। ১০ টি রাজ্যে **গর্ভপাত বিষয়েও ভোট হয়।** ট্রাম্পের বিরোধিতা সত্ত্বেও নেভাডা, অ্যারিজোনা, মন্টানা, কলরাডো, মিজুরি, নিউ ইয়র্ক ও মেরিল্যান্ড গর্ভপাতের পক্ষে রায় দেয়। ২০২২ এর পর থেকে এখন অবধি ১৩ টি রাজ্য গর্ভপাত কে স্বীকৃতি দিল।

কারা কাকে ভোট দিলেন?

ক) লিঙ্গ ও জাতিগত ভোট বিন্যাস:

লিঙ্গ ও জাতি	মোট জনসংখ্যার অনুপাত (%)	ট্রাম্প (%)	হ্যারিস (%)
পুরুষ	৪৭	৫৫	৪৩
নারী	**৫৩**	**৪৫**	**৫৩**
শ্বেতাঙ্গ	৭১	৫৭	৪২
কৃষ্ণাঙ্গ	১২	১৩	৮৬
লাতিনো বা হিস্প্যানিক	১১	৪৬	৫১
এশিয়	০৩	৪০	৫৫
জনজাতি	০১	৬৮	৩৮
অন্যান্য	০২	৫২	৪৪

[শ্বেতাঙ্গ পুরুষরা (৩৪%) ৬০% ট্রাম্পকে ও শ্বেতাঙ্গ নারীরা (৩৭%) ৫৩% ট্রাম্পকে; কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষরা (৫%) ৭৭% হ্যারিসকে ও কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা (৭%) ৯২% হ্যারিসকে; লাতিনো পুরুষরা (৫%) ৫৪% ট্রাম্পকে ও লাতিনো নারীরা (৬%) ৫৮% হ্যারিসকে এবং এশিয় সহ অন্যান্যরা ৪৯% হ্যারিসকে ও ৪৭% ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন।]

খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক ভোট বিন্যাস :

শিক্ষাগত যোগ্যতা	মোট জনসংখ্যার অনুপাত (%)	ট্রাম্প (%)	হ্যারিস (%)
শ্বেতাঙ্গ কলেজ ডিগ্রিহীন	৩৮	৬৬	৩২
শ্বেতাঙ্গ স্নাতক	৩৩	৪৫	৫৩
অশ্বেতাঙ্গ কলেজ ডিগ্রিহীন	১৮	৩৪	৬৪
অশ্বেতাঙ্গ স্নাতক	১০	৩২	৬৫

[রোজগার যাদের ৩০ হাজার ডলারের কম (১১%) তাদের ৫০% হ্যারিসকে, রোজগার যাদের ৩০ থেকে <৫০ হাজার ডলার (১৬%) তাদের ৫২% ট্রাম্পকে, রোজগার যাদের ৫০ হাজার ডলার থেকে < এক লক্ষ ডলার (৩২%) তাদের ৫২% ট্রাম্পকে, রোজগার যাদের এক থেকে < দু লক্ষ ডলার তাদের ৫১% হ্যারিসকে এবং রোজগার যাদের দু'লক্ষ ডলার বা তার বেশি তাদের ৫২% হ্যারিসকে ভোট দেন।]

কেন এমন হল? প্রথমত অর্থনীতি। মার্কিন অর্থনীতি যথেষ্ট শক্তিশালী ও এখনও বিশ্ব নিয়ন্ত্রক হলেও পুঁজিবাদের নিজস্ব সমস্যায় ২০০৮ – '০৯ এর ওয়াল স্ট্রিট ধ্বস (ব্যাঙ্ক, ফাইনান্স সংস্থা, শেয়ার বাজার ইত্যাদি), ধারাবাহিক মন্দা (Recession), স্থিতিস্ফীতি (Stagflation) প্রভৃতি সমস্যা এবং বিশ্ব জুড়ে চিনের প্রবল বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। মার্কিন সরকারের পাহাড় প্রমাণ ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩৬.২২ ট্রিলিয়ন ডলার। বিশ্বায়নের ফলে কিছু বহুজাতিক সংস্থা এবং তাদের কিছু অতি ধনী মালিকেরা লাভবান হলেও গড়পড়তা মার্কিনীদের আয় বিশেষ বাড়েনি। অন্যদিকে খরচ বেড়ে গেছে। বিপরীতে মার্কিনীদের ঐতিহ্যশালী অনেকটাই শ্রমনিবিড় লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমোবাইল, এরোপ্লেন প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পগুলি জাপান, কোরিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে এবং ভোগ্য পণ্য শিল্প চিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছু হটেছে। বহু শ্রমিক কর্মচারি যাদের বেশিরভাগই শ্বেতাঙ্গ কাজ হারিয়েছেন। মার্কিন রাষ্ট্র কোন রক্ষা কবচ বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেনি। উদীয়মান মেধা ও কৃত্তিম মেধা নিবিড় তথ্য প্রযুক্তি, টেলে যোগাযোগ, পরিষেবা শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। যেটুকু আছে সেটা উচ্চশিক্ষিত দক্ষ ভারতীয়, পূর্ব ইউরোপীয় ও চিনাদের দখলে। শ্রমের বাজারেও লাতিনো, হিস্প্যানিক, অ্যাফ্রিকান, ক্যারিবিয়ান, এশিয়দের পাল্লা ভারী। এই ক্ষোভ শ্বেতাঙ্গ ও আমেরিকান জ্যাত্যাভিমানে পর্যবসিত হয়ে দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল রিপাবলিকানদের এবং জনসংখ্যার এই বিশাল অংশটির সামনে স্বপ্ন ফেরি করা ট্রাম্পের ভোট বাক্সে পড়েছে। শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, রুচিশীল, ধনী মানুষরা তাঁদের পছন্দের প্রার্থী হ্যারিসকে ভোট দিলেও সব কিছু গুছিয়ে নেওয়া এই এলিটদের বিরুদ্ধে পড়ন্ত অর্থনীতির শ্বেতাঙ্গরা ছাড়াও শ্রমজীবী কৃষ্ণাঙ্গ ও লাতিনো সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ তাঁদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। এর সঙ্গে ব্যয়বহুল স্বাস্থ্য বিমা, ওবামাকেয়ার, খরচ সাপেক্ষ শিক্ষা, ইলেকট্রিক যান নিয়ে বিতর্ক, পরিবেশ নিয়ে কড়াকড়ি, বন্দুকবাজি, ইউক্রেন ও মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধে বাইডেন প্রশাসনের যুক্ত হয়ে পড়া ইস্যু গুলি যুক্ত হয়েছে।

অন্যান্য কারণঃ সারা বিশ্ব থেকে ভালো ও নিরাপদে থাকার আশা ও বেশি উপার্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে যেভাবে মানুষ বৈধ ও অবৈধ উপায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসছেন, বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার টালমাটাল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভেঙ্গে পড়া আইন শৃঙ্খলার আবহে যেভাবে অসংখ্য মানুষ সুড়ঙ্গ, স্থল, জল ও আকাশ পথে মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে ঢুকে পড়ছেন, তাতে মার্কিন নাগরিক এবং বৈধ আভিবাসীরাও ত্রস্ত। এক্ষেত্রে বাইডেনের সহনশীল নীতির সঙ্গে ট্রাম্পের কঠোর নীতি বিগত নির্বাচনে অনেকটা পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ক্ষমতাসীন শ্বেতাঙ্গ মার্কিন সমাজে কৃষ্ণাঙ্গ ও অভিবাসী বিদ্বেষ এবং পিতৃতন্ত্র (Patriarchy) ছিলই। হাজারো বাধা কাটিয়ে সব ক্ষেত্রে মহিলারা এবং কৃষ্ণাঙ্গদের একটি অংশ উন্নতি করেছেন। বর্তমানে গড়পড়তা কম শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের পড়ন্ত অবস্থায় বিদ্বেষ আরও প্রকট হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে শ্বেতাঙ্গ সমাজের একটি বড় অংশ (সাবেকী ও গৃহকর্ম করা মহিলারা সহ) কৃষ্ণাঙ্গ, অভিবাসী ও মহিলাদের এগিয়ে যাওয়াকে নিজেদের পতনের কারণ মনে করেছেন। তাদের ধারণা ট্রাম্প এদের টাইট দিয়ে রাখতে পারবেন। তাই মহিলাদের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের এত অপরাধ তাঁর নির্বাচিত হতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

এছাড়াও ট্রাম্পের গর্ভপাত ও তৃতীয় লিঙ্গ বিরোধিতা, মার্কিন খ্রিস্টান পরিবারের মূল্যবোধ রক্ষার ডাক ইত্যাদি প্রভাব ফেলেছে। উত্তর, মধ্য ও মধ্য পশ্চিমের শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত সাবেকী শিল্প পতনের রাজ্যগুলিতে (Rust States) এবং দক্ষিণের পুরনো তুলো চাষ, দাস ব্যবসা ও রোমান ক্যাথলিকদের ঘাঁটি রাজ্যগুলিতে (Dixieland) ট্রাম্প ঢালাও ভোট পেয়েছেন। তাই যথেষ্ট যোগ্য ও দক্ষ হয়েও প্রাক্তন 'ইউনাইটেড স্টেট্স সেক্রেটারি অফ স্টেট' শ্বেতাঙ্গিনী **হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন** ২০১৬-র নির্বাচনে পিতৃতন্ত্রের এবং ২০২৪-র নির্বাচনে 'ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেট্স' কমলা হ্যারিস শ্বেতাঙ্গ ও পিতৃতন্ত্রের দুর্গে ফাটল ধরাতে পারেননি। **অ্যাফ্রো – এশিয় বংশোদ্ভূত আইনজ্ঞ কমলা দেবী হ্যারিস জার্মান – স্কট বংশোদ্ভূত ব্যাবসায়ী ডোনাল্ড জন ট্রাম্পের** আগ্রাসী প্রচারের সঙ্গে সমানে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও পরাজিত হলেন। পরাজিত হয়েও তিনি গতবারের নির্বাচনে পরাজিত হয়ে ট্রাম্পের ক্যাপিটল হিল আক্রমণ সহ ধুন্ধুমার আচরণের বিপরীতে বিনম্রভাবে জানালেনঃ "জনাদেশ মেনে নেওয়াই গণতন্ত্র"।

ট্রাম্পের দ্রুতগামী সংস্কার : ট্রাম্প দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসেই তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের বিভিন্ন পদে বসিয়ে তাঁর 'আমেরিকা প্রথম' নামক সংস্কারগুলি কোন নিয়মনীতি রীতিপদ্ধতির তোয়াক্কা না করে অত্যন্ত কদর্য, অগণতান্ত্রিক ও বলপূর্বকভাবে দ্রুত রূপায়ণ করতে নেমে পড়েছেন। (১) পরিবেশের তোয়াক্কা না করে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি ও অন্যান্য পরিবেশ আইনগুলি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। (২) মার্কিন স্বাস্থ্যব্যবস্থা মূলত বেসরকারি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে ভূমিকা ছিল WHO থেকে বেরিয়ে গিয়ে তা বন্ধ করেছেন। (৩) USAID সহ আন্তর্জাতিক সহায়তা বন্ধ করেছেন। (৩) পুতিনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ইউক্রেনের সমর্থন থেকে সরে এসেছেন। (৪) গ্রিনল্যাণ্ড, কানাডা, পানামা খাল ও গাজার সমুদ্র সমীপ অঞ্চল দখলের হুমকি দিয়েছেন। হুমকি দিয়েছেন প্রতিবেশী মেক্সিকোকে। (৫) অবৈধ অভিবাসীদের শিকল বেঁধে তাদের দেশে অথবা এল. সালভাদোরের কুখ্যাত জেলে পাঠাচ্ছেন। (৬) মিত্র মাস্কের নেতৃত্বে বিশেষ দপ্তর তৈরি করে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর তুলে দিয়েছেন অথবা দপ্তরগুলি থেকে ব্যাপক কর্মী ছাঁটাই শুরু করেছেন। (৭) তৃতীয় লিঙ্গ বিষয়টিকে অস্বীকার ও অবৈধ ঘোষণা করেছেন। (৮) মার্কিন ও ইজরায়েল সরকারের অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের যে কোন প্রতিবাদকে কঠোরভাবে দমন এবং এর সঙ্গে যুক্ত অভিবাসীদের পত্রপাঠ তাড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। (৯) শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি অনুদান বন্ধ এবং শিক্ষাঙ্গণগুলিতে যে কোন প্রতিবাদী আন্দোলন নিষিদ্ধ করেছেন। (১০) তার কুকীর্তি নিয়ে যে সমস্ত আইনজীবী, আধিকারিক এতদিন আইনি লড়াই করেছেন, তাদের উপর জিঘাংসা চরিতার্থ করছেন। (১১) বিদেশি পণ্যের উপর অস্বাভাবিক শুল্ক চাপিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যুদ্ধ ও অর্থব্যবস্থার ভাঙ্গনের জন্ম দিয়েছেন। (১২) নানা কায়দায় ক্রিপ্টো কারেন্সি সহ নানা ব্যবসায়ে পারিবারিক ব্যবসা ও মুনাফা বাড়িয়ে চলেছেন। (১৩) বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতাদের অভাবনীয়ভাবে অপমান করে ও হুমকি দিয়ে চলেছেন। (১৫) আমৃত্যু প্রেসিডেন্ট থাকার ফন্দিফিকির আঁটছেন। (১৬) ইজরায়েলের আপত্তি সত্ত্বেও ইরান বিরোধী সৌদি আরব, কাতার ও আমীরশাহীর সঙ্গে ব্যবসা বাড়াচ্ছেন ও উন্নতমানের অস্ত্র বিক্রি করছেন। (১৭) দুনিয়ার সর্বত্র দাদাগিরি ও নোবেল পুরস্কার দাবি করছেন।

শেষের কি শুরু? কিন্তু নতুন বছরে ২০২৫এর প্রথমার্ধেই দেখা গেল তাঁর শুল্ক নীতি মার খেল। চিনের সঙ্গে শুল্ক চাপানোর প্রতিযোগিতায় রণেভঙ্গ দিয়ে আপোষ করলেন, অন্যদের ক্ষেত্রেও নরম হলেন। কিন্তু তাঁর হঠকারি সিদ্ধান্ত শুধু বিশ্ব অর্থনীতিতেই নয় মার্কিন অর্থনীতিতেও অস্থিরতা তৈরি করে দিয়েছে। জনজীবনে এর প্রভাবের কারণে দেশজুড়ে ব্যাপক গণ আন্দোলন শুরু হয়েছে। তাঁর বেশ কিছু নিয়ম বহির্ভূত কাজে আদালত স্থগিতাদেশ দিয়েছে। তাঁর বেশ কিছু অগণতান্ত্রিক নির্দেশকে কয়েকটি নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিবাদ করেছে। ইউক্রেন ও গাজা যুদ্ধ থামেনি, ভারত-পাক যুদ্ধে তাঁর ঘোষিত ভূমিকায় সংশয় দেখা দিয়েছে। সব চাইতে বড় বিষয় প্রিয় সঙ্গী মাস্ক বিচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং মাস্ক তাঁর 'বিগ অ্যাণ্ড বিউটিফুল' বিলের জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। বৃহৎ পুঁজির সংস্থাগুলির মধ্যস্থতায় সাময়িক পিছু হটলেও মাস্ক 'আমেরিকা পার্টি' তৈরি করে ট্রাম্পের বিরোধিতায় নেমেছেন। ট্রাম্প একদিকে ইরানের পরমাণু কেন্দ্রে বাঙ্কার বাস্টার বোমা ফেলেছেন, আবার ইজরায়েল ও ইরানকে যুদ্ধবিরতিতে রাজি করিয়েছেন। রোয়ান্ডা ও ডি আর সি (কঙ্গোর) যুদ্ধবিরতিতে ভূমিকা রেখেছেন। এভাবে তিনি নিজেকে একমেদ্বিতীয়ম বিশ্ব নেতা হিসাবে তুলে ধরছেন। ন্যাটোতে চাপ দিয়ে ই ইউ-র দেশগুলির আর্থিক অনুদান বাড়িয়েছেন। এবার শুল্ক ও অভিবাসন নিয়ে দ্বিতীয় পর্বের তালিকা প্রকাশ করেছেন। রাশিয়ার থেকে তেল কেনার জন্য চিন, ভারত ও ব্রাজিলকে বিপুল করের হুমকি সহ 'ন্যাটোর' হুমকি দিয়েছেন। মার্কিন ডলার কেন্দ্রিক অর্থ-বাণিজ্যের প্রতিস্পর্ধী 'ব্রিকস'কে ভাঙ্গার চেষ্টা শুরু করেছেন। ইউক্রেন যুদ্ধে দ্বিচারিতা করছেন। তলেতলে ইউক্রেনকে অস্ত্র দিচ্ছেন এবং মস্কো আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করছেন। আবিশ্ব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন ও দখলদারিকে নগ্ন দাদা ও গুণ্ডাগিরির জায়গায় নিয়ে গেছেন। প্রতিদিন কিছু না কিছু বিতর্কিত ঘটনা ঘটিয়ে চলেছেন। আরও বহু ঘটনার জন্য আগামী দিনগুলি অপেক্ষা করছে। এপস্টেইন ফাইল উন্মোচন বোধহয় তার একটি।

অর্থনীতি

অবাধ বাণিজ্য বনাম ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধ

নির্মলেন্দু নাথ

ইতিহাসে এমন কিছু সময় থাকে যখন দেখা যায় দশকের পর দশক বিশেষ কিছুই ঘটে না। আবার এমন কিছু সপ্তাহ আসে যখন দেখা যায় ওই সপ্তাহের ঘটনার ঘনঘটার প্রভাব কয়েক দশক বজায় থাকে। বিশ্ব অর্থনীতিতে মার্কিন প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখা তথা অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক শুল্কনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি হল এইরকম একটা ঘটনা। মর্মবস্তুর বিচারে ট্রাম্পের শুল্কনীতি হল অবাধ বাণিজ্যের বিপরীতে কঠোর আমদানি নীতির মাধ্যমে অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা। এখন বিষয়টা হল কঠোর আমদানি নীতির মাধ্যমে বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত তথা দেশের উন্নয়নের ধারণা প্রাক শিল্পবিপ্লব-যুগের ধারণা। ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদেরা এই নীতির সারবত্তাহীনতা তুলে ধরেছেন। তাঁদের মত হল, শুধুমাত্র বাণিজ্য নয়, উৎপাদনই হল উন্নয়নের প্রকৃত চালিকাশক্তি। এহেন বাস্তবতা সত্ত্বেও একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে ট্রাম্পের কঠোর আদমানি নীতি বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে।

বিশ্ব অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান মার্কিন আধিপত্য

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ব্রিটিশ প্রভাব-প্রতিপত্তি অস্তমিত হতে থাকে এবং মার্কিন প্রভাব–প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। অর্থনীতির দিক থেকে বিচার করলে তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্র মার্কিন পণ্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই মার্কিন পণ্যে শিল্পজাত পণ্য ও কৃষিজাত পণ্য উভয়ই ছিল (এর উদাহরণ হল পিএল ৪৮০)। অপরদিকে পূর্বতন যুগে ব্রিটিশ পণ্য ছিল মূলত শিল্পজাত পণ্য। ১৯৬০ সালে সারা পৃথিবীর মোট পণ্য উৎপাদনের মূল্য ছিল ১৩৭০ লক্ষ কোটি ডলার। আর এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ ছিল ৪০ শতাংশ। ২০২৪ সালে সারা পৃথিবীর মোট পণ্য উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ মাত্র ২৪ শতাংশে নেমে এসেছে। এ থেকে বোঝা যায় বিশ্ব বাণিজ্যে মার্কিন প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমহ্রাসমান। তবে ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা একই ভাবে ঘটেনি। ১৯৬০ থেকে ১৯৮০ তিন দশকে টানা হ্রাস পেয়ে ২৫ শতাংশে নামে। তারপর প্রেসিডেন্ট রেগানের আমলে ১৯৮৫ সালে এই শতাংশ বেড়ে ৩৪ হয়। তারপর আবার হ্রাস পেতে থাকে। বিশ্ব বাণিজ্যে মার্কিন অংশ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেসিডেন্ট রেগান যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা হল ফেডারেল বাজেটের ভারসাম্য, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির হারকে শ্লথ করা, সরকারি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা, মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করার জন্য অর্থ সরবরাহকে কঠোর করা ইত্যাদি। এক কথায় এটা হল 'মুক্ত বাজার অর্থনীতি'। একে রেগানোমিক্সও বলা হয়। এসবের ফলশ্রুতিতে বিশ্ববাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'শেয়ার' বাড়লেও এর সামগ্রিক ফলাফল নেতিবাচক ছিল। প্রকৃত গড় মজুরি হ্রাস পায় এবং আট বছরে জাতীয় ঋণ তিন গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট বাইডেন প্রেসিডেন্ট রেগানের বিপরীতে পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, উচ্চ আয়ের ব্যক্তি ও কর্পোরেটের ওপর কর বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থায়ন করা, ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করা ও আয় বৈষম্য হ্রাসের উপর জোর দিয়েছিলেন। এসবের ফলে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ হয় এবং ১ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়। এক কথায় বলতে হলে বাইডেন যুগে অর্থনীতির দর্শন ছিল 'মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম' যা কর্পোরেট লবির দ্বারা সমর্থিত হয়নি।

মার্কিন অর্থনীতির স্বাস্থ্যের মানদণ্ড

যে কোনও দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য অনুধাবনের জন্য তার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দুটো দিককেই সমভাবে দেখা দরকার। ২০২৫ এর শুরুতে মার্কিন অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ অবস্থা বোঝার জন্য লুইগি প্যাসিনেত্তিকে অনুসরণ করে চারটি মূল অর্থনৈতিক চলককে (ভেরিয়েবল বা প্যারামিটার) নির্বাচন করা হয়েছে। এগুলি হল উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি ও আয় বৈষম্যের মাত্রা। এছাড়া বৈদেশিক বিষয়কে অনুধাবন করার জন্য যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশগুলোর (যথা ইউরোপ ও জাপান) অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হবার প্রচেষ্টা ও প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলবর্তী দেশ সমূহে (এদের মধ্যে অন্যতম চিন) স্বাধীন অর্থনীতির উত্থান সম্পর্কিত বিষয়গুলো দেখা হবে।

উৎপাদনশীলতা বলতে বোঝায় উৎপাদনের উপাদানগুলি কতটা দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০০৮–এর আর্থিক সংকটের পর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার ক্রমাগত কমে যায়। একে উৎপাদনশীলতার প্যারাডক্স বলে। অ্যাকেমোগলু প্রমুখ দেখিয়েছেন ১৯৯০–এর থেকে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিল্পে খুব সামান্যই উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ঘটেছে। ১৯৮৭ সালেই রবার্ট সলো বলেছিলেন, কম্পিউটার যুগ আসা সত্ত্বেও সর্বত্র উৎপাদনশীলতা বাড়েনি।

উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির ক্রমহ্রাসমান প্রবণতার মতো শ্রমিকের কর্মনিযুক্তির হারও ক্রমহ্রাসমান। পুরুষের ক্ষেত্রে এই কর্মনিযুক্তির হার ১৯৫০ সালে ছিল ৮৬.৪ শতাংশ। ২০০৫ সালে এটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৭৩.৩ শতাংশ। ২০২২ সালে এই হার হয়েছে ৬২.৪০ শতাংশ। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে শ্রমনিযুক্তির হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। ১৯৫০ সালে এই হার ছিল মাত্র ৩২ শতাংশ, ১৯৯৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬০ শতাংশ। বর্তমানে এই হার ৫৭.৭ শতাংশ। তবে শ্রমনিযুক্তির হার আশাব্যঞ্জক হলেও গড় প্রকৃত মজুরির হার ২০০৭ সালে যা ছিল, বর্তমানে তা একই অবস্থায় রয়েছে। মুদ্রাস্ফীতিকে ঘিরে এক নতুন ধারণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সূচিত হয়েছে। সাবেকি

ধারণা হল 'মজুরি বৃদ্ধির জন্য' মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। ইতিমধ্যে দেখা গেল বিগত ১৪ বছরে প্রকৃত মজুরি বাড়েনি অথচ মুদ্রাস্ফীতির হার ২০২৩ সালে ছিল ৪.৩ শতাংশ। এহেন অবস্থাকে ইসাবেলা ওয়েবার 'বিক্রেতাদের দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি' বলেছেন। ইসাবেলা দেখিয়েছেন বিক্রেতারা তাদের মুনাফার হারকে সুরক্ষিত করার জন্য 'মুদ্রাস্ফীতি' করে। অভ্যন্তরীণ বিষয়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আয়ের বৈষম্য সর্বাপেক্ষা গুরুতর। অ্যাকেমোগলু প্রমুখ হিসেব করে দেখিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৫ সালে সর্বাপেক্ষা ধনী ১ শতাংশ মানুষের কাছে সে দেশের মোট সম্পদের ৯ শতাংশ ছিল। ২০১৮ সালে এই ১ শতাংশ মানুষের কাছে সে দেশের মোট সম্পদের ২০ শতাংশ রয়েছে। আয় বা সম্পদের বৈষম্য প্রকট থেকে প্রকটতর হয়েছে। সংক্ষেপে বললে ২০২৫ এর শুরুতে মার্কিন অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির হার ক্রমহ্রাসমান ও শ্রমিকের শ্রমনিযুক্তির হারও ক্রমহ্রাসমান, বিক্রেতাদের দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি ও ক্রমবর্ধমান আয়ের বৈষম্য সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। এক কথায় বললে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি মোটেই অনুকূল নয়।

একইরকম ভাবে দেখা যায় বৈদেশিক পরিস্থিতিও প্রতিকূল। পুরনো মিত্র দেশ ইউরোপ তার উৎপাদন কাঠামোকে আরও মজবুত করে তুলেছে। একই রকমভাবে জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ফেলেছে। তবে পণ্য উৎপাদনের দিক থেকে সবচেয়ে অগ্রগতি হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলোতে। এদের মধ্যে চিন অগ্রগণ্য। বর্তমানে চিনা পণ্য দুনিয়ার সর্বত্র বিরাজমান। ১৯৬০ সালে বিশ্ব বাজারে চিনা পণ্যের অংশ ছিল মাত্র ৪ শতাংশ। ২০১৯ সালে এটা দাঁড়ায় ১৬.৩ শতাংশ। একই রকমভাবে ব্রাজিল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, ভিয়েতনাম বিশ্ব বাণিজ্যে তাদের অংশ বাড়াবার চেষ্টা করছে। এককথায় ঘরে ও বাইরে উভয় দিক থেকে পরিস্থিতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে নেই।

ট্রাম্প অনুসৃত শুল্কনীতি ও তার প্রতিক্রিয়া

এহেন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্লোগান 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন'। কিন্তু কীভাবে? পূর্বসুরী প্রেসিডেন্ট রেগান যেভাবে চেষ্টা করেছিলেন সেই পথে, না অন্য কোনও পথে? আগেই বলা হয়েছে প্রেসিডেন্ট রেগান ১৯৩০-এর দশকের 'নিউ ডিল'কে বর্জন করে নয়া উদারবাদী মতাদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের ভূমিকাকে সর্বনিম্নস্তরে নামিয়ে এনেছিলেন। পরিবর্তে বাজার ব্যবস্থা, মুক্ত বাণিজ্যই 'উন্নয়নের যাদুকাঠি', এই ধারণার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে এই মডেল আমেরিকার কর্পোরেট সেক্টরকে আরও পরিপক্ক করেছে, আয় বৈষম্য বেড়েছে, জাতীয় ঋণ তিন–চারগুণ বেড়েছে।

দ্বিতীয় দফায় ট্রাম্প একটু ভিন্নপথে হাঁটছেন। ট্রাম্প লক্ষ্য করেন বিশ্ব বাণিজ্যে চিনের দাপট তার বাণিজ্য উদ্বৃত্তের মধ্যে (বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলতে বোঝায় আমদানির থেকে অনেক বেশি রপ্তানি)। তিনি চিনের এই বাণিজ্য নীতিকে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মার্কেনটাইলিজম এর সমগোত্রীয় বলে ভাবলেন — যা বস্তুতপক্ষে ভুল। পুরনো মার্কেনটাইলিস্টরা শুধু বাণিজ্য করত, উৎপাদন করত না। অপরদিকে চিন উৎপাদন করে এবং সেই উৎপাদিত পণ্যই রপ্তানি করে। এটা দেখা যাচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও সংহত করা ও বিকশিত করার মধ্যে দিয়ে যে পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে তাকেই রপ্তানি করার উপর জোর দিয়েছে ব্রাজিল, মেক্সিকো, ভারত, ভিয়েতনাম প্রমুখ দেশগুলো।

ট্রাম্প প্রশাসন অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে লুইগি প্যাসিনেত্তির নির্দেশিত প্রধান চারটি অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক চলকগুলির প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে অবাধ বাণিজ্য থেকে সরে এসে, বাণিজ্য উদ্বৃত্তের জন্য কঠোর আমদানি নীতির উপর জোর দিয়েছে। এটা চমকপ্রদ এবং কর্পোরেট স্বার্থকে বিঘ্নিত করে না। কলিন ক্রোক একে 'কর্পোরেট নিও লিবারালিজম' বলে চিহ্নিত করেছেন।

ট্রাম্পের নীতি হল কর্পোরেট নয়া উদারবাদ

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধের ভরকেন্দ্র হল আমদানির উপর উচ্চহারে শুল্ক বসানো। এর মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরীন শিল্পকে শুল্ক-প্রাচীর দিয়ে উদ্দীপ্ত করা। তবে বলা দরকার মার্কিন অর্থনীতির চালিকাশক্তি হল ধারাবাহিকভাবে উদ্ভাবন শক্তির বিকাশ ঘটানো যা ট্রাম্প উপেক্ষা করছেন। যাইহোক, প্রশ্ন আসে মার্কিন দেশে রফতানিকারী দেশগুলো কারা এবং কী কী পণ্য মার্কিন দেশ আমদানি করছে? সাম্প্রতিক সময়ের তথ্যে দেখা যাচ্ছে আমেরিকার প্রধান ১০টি রফতানিকারী দেশ হচ্ছে মেক্সিকো, চিন, কানাডা, জার্মানি, জাপান, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, আয়ারল্যান্ড, ভারত ও ইটালি। ২০২৪ সালে দেখা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোট ৩২৭০ লক্ষ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে আর এই পণ্যের মধ্যে মেক্সিকো, চিন ও কানাডার সম্মিলিত অংশ হল ৪০ শতাংশ। এই তিনটি দেশ থেকে যে সমস্ত পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমদানি করছে সেগুলি হল গাড়ি, গাড়ির যন্ত্রাংশ, ফার্মাসিউটিক্যাল ও সকল ধরনের ইলেকট্রনিক পণ্য যার মধ্যে পড়ে স্মার্টফোন, কম্পিউটার ও সেমি কনডাকটর।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই ধাঁচ লক্ষ্য করে ট্রাম্প প্রশাসন প্রাথমিক পর্বে সমস্ত 'ট্রেডিং পার্টনার'—এর উপর সমভাবে শুল্কনীতির প্রস্তাব করে। তবে পরবর্তী পর্যায়ে তা প্রত্যাহার করে বিভিন্ন গোত্রের দেশের জন্য বিভিন্ন হারে আমদানি শুল্কনীতি প্রয়োগ করে। বিবিসির ভাষ্য অনুযায়ী, আমেরিকার 'ট্রেডিং পার্টনার' ৬৭টি দেশ। এই দেশগুলিকে তিনটি গোত্রে ভাগ করা যায়। প্রথম গোত্র হল কানাডা ও মেক্সিকো। এই দুটি দেশকে বর্তমানে নয়া শুল্কনীতির আওতায় আনা হয়নি। ৯০ দিন বাদে এই সব দেশের জন্য আমদানি শুল্কের হার নির্ধারণ করা হবে। দ্বিতীয় গোত্র হল ইউরোপীয় ইউনিয়ান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভিয়েতনাম, আয়ারল্যান্ড সহ অন্যান্য দেশ। প্রাথমিক পর্বে ঠিক ছিল, এই সব দেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর ১১ শতাংশ থেকে ১১০ শতাংশ পর্যন্ত আমদানি শুল্ক বসানো হবে। পরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যখন সিদ্ধান্ত করে তারাও আমেরিকা থেকে আগত পণ্যের উপর ৩৪ শতাংশ শুল্ক আরোপ

করবে, তখন মার্কিন প্রশাসন সরে আসে। বর্তমানে এই সব দেশ থেকে আগত পণ্যের উপর মার্কিন প্রশাসন ১০ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক আরোপ করেছে। এছাড়া বলা হয়েছে ৯০ দিন বাদে বিষয়টা পুনর্বিবেচনা করা হবে। তৃতীয় গোত্রের দেশ হল চিন। বস্তুতপক্ষে ট্রাম্প চিনের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। সর্বশেষ সংবাদ অনুসারে, ট্রাম্প প্রশাসন চীনা পণ্যের উপর ১৪৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করেছে এবং পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে চিনা সরকার আমেরিকার পণ্যের উপর ১২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করেছে। এই যুদ্ধের ফলে ইতিমধ্যে উভয় দেশের বাণিজ্য ৮০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৬,৬০০ কোটি ডলার। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এতে দুটি দেশ দুটি ভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়বে। আমেরিকার অর্থনীতি মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দার কবলে পড়বে। বিপরীতে চিনা অর্থনীতি তার 'বেল্ট এবং রোড'এর মাধ্যমে প্রতিবেশি দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য আরও প্রসারিত করবে। মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, শেয়ার বাজারে ধ্বস, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সঙ্কট প্রভৃতি কারণে ট্রাম্প প্রশাসন পেছিয়ে এসে চীনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে।

বাণিজ্য যুদ্ধের পরিণতি এখনই বলা যাবে না। তবে একথা ঠিক নয়া উদারবাদী মতাদর্শ ট্রাম্পের আমলে এক নতুন মাত্রা নিয়েছে। এই মতাদর্শের দুটো দিক। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। রাজনৈতিক দিক হল, কর্পোরেট স্বার্থ সুরক্ষিত করা আর অর্থনৈতিক দিক হল মুক্ত বাজার, অবাধ বাণিজ্য। ১৯৮০—এর দশকে প্রেসিডেন্ট রেগান এই উভয়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করেন। ২০২৪-এ ট্রাম্প এই ভারসাম্যের দিকে না হেঁটে অবাধ বাণিজ্যকে বিসর্জন দিয়ে কর্পোরেট স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন। এতে আয় বৈষম্য বাড়বে, মার্কিন শ্রমজীবী মানুষ, ও সাধারণ মানুষ আরও দুর্দশাগ্রস্ত হবেন, মার্কিন সমাজে আরও অস্থিরতা তৈরি হবে।

অর্থনীতির হালহকিকত

- **টাটার প্লেন তৈরির কারখানা :** CASA C295 বিমানটি অতীতে স্পেনের CASA এয়ারোস্পেস কম্পানি তৈরি করত, এখন করে বহুজাতিক Airbus Defence and Space Division। মাঝারি মাপের এই মালবাহী যুদ্ধবিমানটির নাম পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে Airbus C-295। দ্য টাটা অ্যাডভানসড সিস্টেমস লিমিটেড (TASL) গুজরাটের ভাদোদরায় যে বিমান তৈরির কারখানা তৈরি হয়েছে সেখানে এই বিমানটি তৈরি হবে। ভারত সরকারের সাথে চুক্তি অনুযায়ী এই ধরনের ১৬টি বিমান সরাসরি এয়ারবাস দেবে এবং ৪০টি টাটার কারখানায় বিভিন্ন যন্ত্রাংশ জুড়ে পুর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া হবে।
- **পরিযায়ী পথ '২৩ (সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা পর্ষদ) :** মোট পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ৪০ কোটি ২০ লক্ষ। জনসংখ্যার ২৮.৮৮%। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ এই পাঁচটি রাজ্যের যে পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিন রাজ্যে কাজ করতে যান তাদের সংখ্যা মোট পরিযায়ী শ্রমিকদের ৪৯%। মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ু এই পাঁচ রাজ্যে ভিন রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের ৪৮% কাজ করতে আসেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের জনপ্রিয় যাত্রাপথ: উত্তরপ্রদেশ থেকে দিল্লি, গুজরাত থেকে মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার থেকে দিল্লি এবং বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের জনপ্রিয় যাত্রাপথ: মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা এবং পশ্চিম বর্ধমান থেকে হাওড়া।
- **মূলধন ও অনুদান, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর '২৪ (সূত্র: কেয়ার এজ) :** ভোট কেন্দ্রিক রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের বা বজায় রাখার জন্য সব রাজ্য ও সমস্ত রাজনৈতিক দলই অনুদান রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছে। এর প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিতে। মূলধনী ও রাজস্ব খরচ ক্রমশ বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গে রাজস্ব ও মূলধনী খরচ বেড়েছে ১৩.৫% ও ৭.৭ %। ঋণ মুকুব, আর্থিক সহায়তা প্রকল্পগুলির কারণে এই খরচ বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'স্বাস্থ্য সাথী', 'বাংলার বাড়ি' প্রভৃতি বড় বড় ফাণ্ড ট্রান্সফার প্রকল্প চলে। পশ্চিমবঙ্গের মূলধনী ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে বার্ষিক ৩৫,৮৬৫.৫৫ কোটি টাকা। রাজকোষ ঘাটতি ৩.৭%।
- **স্বল্প সঞ্চয়ে লগ্নি বৃদ্ধি (সূত্র: ইণ্ডিয়া পোষ্ট) :** স্বল্প সঞ্চয়ে সুদ না বাড়লেও লগ্নি বেড়েছে। এই স্বল্প সঞ্চয় গুলি হল : ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট (এনএসসি), পিপিএফ, মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প (এমআইএস), সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কিম (এসসিএসএস), কিষান বিকাশ পত্র (কেভিপি), সুকন্যা সমৃদ্ধি প্রভৃতি। ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কল (পশ্চিমবঙ্গ, আন্দামান ও সিকিম) এই ক্ষেত্রে প্রথম। ২০২২-'২৩-এ লগ্নি ছিল ১.২১ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২৩-'২৪-র সেপ্টেম্বর পৌঁছেছে ১.৫১ লক্ষ কোটি টাকা।
- **ভারতীয় টাকার তুলনায় মার্কিন ডলারের মূল্য বৃদ্ধি :**

বছর	টাকায় ডলারের দাম	বছর	টাকায় ডলারের দাম
১৯৪৭	৪.১৬	২০০০	৪৪.৯৪
১৯৬০	৪.৭৬	২০১০	৪৫.৭৩
১৯৮০	৭.৮৬	২০২০	৭৬.৩৮
১৯৯০	১৭.৫০	২০২৪	৮৫.৪৮

- **ডলারের মূল্যবৃদ্ধির ফল :**
  - আমদানির খরচ বৃদ্ধি
  - ভারতের রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি, তাই বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি
  - আমদানি নির্ভর শিল্প ও দ্রব্যের সমস্যা
  - দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পতন রুখতে বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডার থেকে বিক্রি এবং দেশের বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডার কমে যাওয়া

• বিদেশি পুঁজির অন্যত্র সরা এবং শেয়ার বাজারে ধস

• **পরিবার পিছু মাসিক খরচ (২০২৩-২৪, সূত্র: কেন্দ্র সরকারের পরিসংখ্যান মন্ত্রক) :**

গ্রাম	শহর
সর্বোচ্চ: কেরল (৬,৬১১ টাকা)	তেলেঙ্গানা (৮,৯৭৮ টাকা)
এগিয়ে: পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, রাজস্থান	হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরল, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাত
জাতীয় গড়: ৪,১২২ টাকা	৬,৯৯৬ টাকা
পেছিয়ে: অসম, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ (৩,৬২০ টাকা), মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তীশগড়	অসম, রাজস্থান, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ (৫,৭৭৫ টাকা), উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, বিহার

• **সমাজ মাধ্যমে আর্থিক প্রতারণা বৃদ্ধি :** নানা কায়দায়, ইদানিং টেলিফোন করে ও সাইবার প্রতারণার মাধ্যমে দেশি বিদেশি হ্যাকাররা এবং জামতাড়া গ্যাংগুলির মত প্রতারক অপরাধ চক্রগুলি অসতর্ক ও অসচেতন সাধারণ মানুষদের সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে। সম্প্রতি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমাজ মাধ্যমে শেয়ার লগ্নি করে বিপুল লাভের সুযোগ, অন্তরঙ্গ ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল, যৌন উত্তেজক ছবি দেখিয়ে ফাঁদে ফেলা, ডিজিটাল অ্যারেস্টের হুমকি প্রভৃতির মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকদের সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ আত্মসাৎ করে নেওয়া হচ্ছে। এর জন্য ওয়াটঅ্যাপ, টেলিগ্রাম, ইনস্ট্রাগ্রাম প্রভৃতি জনপ্রিয় অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০২৪-র প্রথম তিনমাসে ৮৬,২৭৭টি অভিযোগ এবং প্রায় ১২৫ কোটি টাকা লোপাটের তথ্য পাওয়া গেছে।

• **ব্যাঙ্ক জালিয়াতির উর্ধ্বগতি (সূত্র: রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) :** ২০২২-'২৩ ও ২০২৩-'২৪-র এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির সংখ্যা ১৪,৪৮০ ও ১৮,৪৬১। টাকার অঙ্ক যথাক্রমে ২৬২৩ থেকে ২১,৩৬৭ কোটি। নেট, কার্ড নিয়ে জালিয়াতি এর ৪৪.৭%। যা দেশের সামগ্রিক আর্থিক প্রতারণার ৮৫.৩%। মোট প্রতারণার ৬৭.১% বেসরকারি ব্যাঙ্কে।

• **সামাজিক উন্নয়নে অবহেলা (সূত্র : এনআইপিএফপি, অর্থমন্ত্রক):**

	১৯৯০-১৯৯১	২০১৯-২০২০
স্বাস্থ্য খাতে খরচ (জিডিপির %)	০.৯২%	১.৩৬%
শিক্ষা খাতে খরচ (জিডিপির %)	২.৯৭%	২.৮৮%

• **নীতি (NITI) আয়োগের আর্থিক বিশ্লেষণে ওড়িশা এগিয়ে বাংলা পেছিয়ে:** ২০২১-২০২৩ আর্থিক বর্ষের নিরিখে প্রথম বার্ষিক আর্থিক স্বাস্থ্য সূচনা রিপোর্ট (First Fiscal Health Index Report 2025) পেশ করা হয়েছে তাতে প্রধান ১৮টি রাজ্যের উৎপাদন হার, শুল্ক সংগ্রহ, শুল্ক সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি, ঋণের উপর কম সুদ, ঋণ সামলানো, দক্ষ আর্থিক পরিচালনা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করা আছে। ভালো অবস্থায় রয়েছে (Achievers) খনি সমৃদ্ধ (১) ওড়িশা (২) ছত্তিশগড়, (৩) গোয়া, (৪) ঝাড়খণ্ড ও (৫) গুজরাত। এরপর 'Frontrunner' হিসাবে আছে (৬) মহারাষ্ট্র, (৭) উত্তরপ্রদেশ, (৮) তামিলনাড়ু, (১২) বিহার, (১৩) রাজস্থান ও (১৪) হরিয়ানা। পিছনের সারিতে 'Aspirational' রাজ্য (১৫) পাঞ্জাব, (১৬) অন্ধ্রপ্রদেশ, (১৭) পশ্চিমবঙ্গ ও (১৮) কেরল।

• **ট্রাম্প-মোদি বৈঠক :** ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-র বৈঠকের আগেই ট্রাম্পের হুমকিতে ভারত ২৮টি মার্কিন দ্রব্যের উপর শুল্ক কমিয়ে দেয়, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় দ্রব্যে শুল্ক বাড়িয়ে দেয়। 'অবৈধ' ভারতীয় অভিবাসীদের হাত পা শিকল দিয়ে বেঁধে ভারতে পাঠানো শুরু হয়।

• ২০৩০-র মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৫০ হাজার কোটি ডলারের লক্ষ্যমাত্র এবং ২০২৫ এর 'ফলে'র (হেমন্তকাল) মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও আর্থিক চুক্তি।

• মার্কিন মদ, মোটর সাইকেল, ধাতু শিল্প ও তথ্য প্রযুক্তির উপর শুল্ক হ্রাস।

• ভারতীয় কৃষি ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় মার্কিন সরঞ্জাম ব্যবহার।

• মার্কিন যুদ্ধ বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, সাঁজোয়া গাড়ি ইত্যাদি ক্রয়।

• মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে খনিজ তেল ক্রয়।

• ভারতের পরমাণু কেন্দ্র গুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তুত পারমাণবিক চুল্লি বসানো।

• অবৈধ ভারতীয় অভিবাসনকারীদের বিতাড়নে সহায়তার প্রতিশ্রুতি।

• **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আর্থিক ব্যয়ে কেন্দ্র-রাজ্য হার (কোটি টাকায়):**

বর্ষ	মোট রাজস্ব	রাজ্যের রাজস্ব ও ঋণ	কেন্দ্রের রাজস্ব	কেন্দ্রীয় অর্থের হার
২০২০-'২১	১,৪৮,৩৯৪	৬৫,৪৮৬	৮২,৯০৮	৫৫.৮৭%
২০২১-'২২	১,৭৮,১৫৯	৭২,৭৭২	১,০৫,৩৮৭	৫৯.১৬%
২০২২-'২৩	১,৯৫,৫৪৪	৮৫,৮০৫	১,০৯,৭৩৯	৫৬.১১%
২০২৩-'২৪	২,০০,২৬৮	৯৩,২২৪	১,০৭,০৪৪	৫৩.৪৫%
২০২৪-'২৫	২,২৭,৫৯১	১,০৩,১৫০	১,২৪,৪১১	৫৪.৬৭%
২০২৫-'২৬	২,৬৬,০৬০	১,২১,৯০৪	১,৩৯,১৫৬	৫২.৩০%

• **পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব সংগ্রহ (২০২৫-'২৬, কোটিতে)**

• এস.জি.এস.টি: ৪৯,৭৭২ • গাড়ির কর: ৫,৮২৪

• বিক্রয় কর (মূলত পেট্রল-ডিজেল সেস) : ১৩,৯০৫

• আবগারি: ২২,৫৫০ • বিদ্যুৎ কর: ৩,৫০১

• ষ্ট্যাম্প রেজিট্রেশন: ১০,১০০ • ভূমি রাজস্ব: ৫,০১২

• মোট রাজস্বের: ৯০.৭৭%

• **বাজেট বরাদ্দে পরিকাঠামো গঠনে ব্যয় (%)**

	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫
কেন্দ্র	৬৭	৬২
পাঞ্জাব	২৯	৫৭
কর্ণাটক	৩৫	৪৬
উত্তরাখণ্ড	৩৭	৪০

পশ্চিমবঙ্গ	৪৫	৩৪
অন্ধ্রপ্রদেশ	৬২	২৭
ঝাড়খণ্ড	৪৮	১৭

- **জিডিপি-র শ্লথগতি:** কোভিডের পর ২০২৪-'২৫ আর্থিক বর্ষে ডিজিপির বৃদ্ধি ৬.৫% সবচাইতে শ্লথ হয়ে পড়েছে। ২০২৩-'২৪ এবং ২০২৪-'২৫- চতুর্থ ত্রৈমাসের আর্থিক বৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৮.৪% ও ৭.৪%।
- **ব্যাঙ্ক জালিয়াতি ও জাল নোটের ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি:** ২০১৪-র পর থেকে ব্যাঙ্ক জালিয়াতি হয়েছে ৬,৩৬,৯৯২ কোটি টাকা (৪১৬% বৃদ্ধি)। ২০১৬-র নোটবন্দীর পর জাল নোটের সংখ্যা বেড়েছে ২৯১%।
- **বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি প্রসঙ্গে:** আই এম এফ-র পরিসংখ্যান বলছে ২০২৪এ জাপান ও ভারতের মোট জিডিপি ছিল যথাক্রমে ৪.০২৬ ও ৩.৯০৯ লক্ষ কোটি টাকা এবং যা ২০২৫এ পৌঁছনোর কথা যথাক্রমে ৪.১৮৬ ও ৪.১৮৭ লক্ষ কোটি টাকায়। তাই ঐ বছরে ভারতের মোট অর্থনীতি জাপানকে ছাপিয়ে চিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির পর চতুর্থ স্থানে চলে যাবে। বহরে বাড়লেও দেশের অর্থনীতির আসল চিত্র অনেকটা ধরা পড়ে মাথা পিছু বার্ষিক আর্থিক আয় দেখে। যেটি জাপানের ৩৪০০০ ডলার ও ভারতের ২৫০০ ডলারের কাছাকাছি।
- **শুল্ক যুদ্ধ দেশে-বিদেশে:** ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পুনর্নির্বাচিত হয়ে প্রতিবেশী কানাডা ও মেক্সিকো সহ প্রতিটি দেশের আমদানিকৃত পণ্যে বহুগুণ শুল্ক (Tariff) বৃদ্ধির ঘোষণা বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। সঙ্গে শুরু হয়েছে বিশ্বের দুই প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি মার্কিন ও চিনের বাণিজ্য যুদ্ধ। এপ্রিল '২৫এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিনাপণ্যের উপর ১৪৫% শুল্ক ধার্য করায় চিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের উপর ১২৪%, শুল্ক ধার্য করে। ভারতের পণ্যেও ১০% শুল্ক বসায়। পরে ডলারের মূল্যের ও শেয়ার বাজারের পতন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে ট্রাম্প প্রশাসন চিনের সঙ্গে মিটমাট করে নেয়। সেই থেকে মার্কিন সাংবাদিকদের একাংশ তাঁর 'টাকো' (Trump Always Chickens Out) নামকরণ করেছেন।
- **তেলের লাভ:** বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কম থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্র সরকার ২০১৪ থেকে উৎপাদন শুল্ক পেট্রল ও ডিজেলের উপর ৯.২০ ও ৩.৪৬ টাকা থেকে ১৯.৯০ ও ১৫.৮০ টাকা বাড়িয়ে ৩৯.৫৪ লক্ষ কোটি টাকা আয় করলেও জনগণের নাভিঃশ্বাস উঠেছে। এর উপর রাজ্য নিয়েছে সেস।
- **সুইস ব্যাঙ্কে জমা বৃদ্ধি:** সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কগুলিতে ভারতীয় ব্যক্তি, ব্যবসায়িক সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা করা তহবিল আগের বছরের থেকে তিনগুণ বেড়ে হল ৩৫০ কোটি সুইস ফ্রাঁ অর্থাৎ ৩৭,৬০০ কোটি ভারতীয় টাকা।
- **সাউথ সিটি মলের হাত বদল:** ২০০৩এ কলকাতার আনোয়ার শাহ্ রোড সংলগ্ন ঊষা ফ্যান ফ্যাক্টরির জমি বিক্রি করে দেওয়া হয়। সেখানে ২০০৮এ সাউথ সিটি শপিং মল ও বহুতল আবাসন গড়ে ওঠে। ২০২৫এ ৩,২৫০ কোটি টাকায় সেটি কেনে মার্কিন সংস্থা ব্ল্যাকস্টোন।
- **ভারতে বেকারত্ব (জুন '২৫):** শহরে ৭.১%, গ্রামে ৪.৯%, সমগ্র দেশে ৫.৬%

''বাণিজ্য যুদ্ধ কোভিডের থেকেও কঠিন।''
—গীতা গোপীনাথ, ফার্স্ট ডেপুটি এম.ডি., আইএমএফ

ব্যাঘ্র মানব : বল্মীক থাপার (১৯৫২-২০২৫)

ভারতে ব্যাঘ্র সংরক্ষণের প্রাণপুরুষ। অর্জুন সিংহ, ফতে সিং রাঠোর, সঞ্জয় দেবরায়, জি ভি রেড্ডি, রঘু চন্দাওয়াত, উল্লাস করন্থ, কৈলাশ সাঙ্খালাদের উত্তরাধিকারী। প্রজেক্ট টাইগার প্রকল্পের কর্ণধার ও টাইগার টাস্ক ফোর্স প্রভৃতির সদস্য ছিলেন। ১৪টি বই এবং 'ল্যাণ্ড অফ টাইগার' সহ ছয়টি তথ্যচিত্রের নির্মাতা। রাজস্থানের রনথম্ভোর জাতীয় উদ্যান ছিল প্রধান কর্মভূমি। বাঘের বাসস্থান বৃদ্ধি, অন্যদিকে অন্যত্র পুনর্বাসিত গ্রামগুলির অধিবাসীদের ব্যাঘ্র সংরক্ষণ, সাফারি ও ট্যুরিজমে যুক্ত করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। রোমিলা থাপারের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শশী কাপুরের জামাতা ছিলেন।

গুকেশ ডোম্মারাজু ও দাবা

নিলয় সামন্ত

গত কয়েকবছর ধরে বিশ্ব মঞ্চে একের পর এক সাফল্য এনে দিচ্ছেন তাঁরা। বয়সে কম হলেও কারনামা বিরাট করে ফেলেছেন গুকেশ-প্রজ্ঞানন্দরা। যদি ভারতীয় দাবাড়ুদের কথা বলতে হয় তাহলে অবশ্যই প্রথমে যার নাম নিতে হবে তিনি হলেন গুকেশ ডোম্মারাজু।

গতবছর কনিষ্ঠতম দাবাড়ু হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে সাড়া জাগিয়েছেন তিনি। চিনের ডিং লিরেনকে ৭.৫-৬.৫ ফলাফলের ব্যবধানে পরাজিত করে ১৮ বছর বয়সে দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে ওঠেন গুকেশ। ১১ বছর বয়স থেকেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন তিনি।

কার্লসেন ও গুকেশ

২০২২ সালের ৪৪ তম দাবা অলিম্পিয়াডে ব্যক্তিগত বিভাগে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন ডি গুকেশ। তিনি সেই সময় ভারত দুই দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। সেই একই বছর তিনি এশিয়ান গেমসে রুপোর পদক জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন।

১৫ জানুয়ারি ২০১৯-এ, গুকেশ সের্গেই কার্জাকিনের পরে ১২ বছর ৭ মাস ১৭ দিন বয়সে দাবার ইতিহাসে তৎকালীন দ্বিতীয় কনিষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছিলেন। জুন ২০২১-এ তিনি ১৯ পয়েন্টের মধ্যে ১৪ স্কোর করে জুলিয়াস বেয়ার চ্যালেঞ্জার্স চেস ট্যুর, গেলফান্ড চ্যালেঞ্জ জিতেছিলেন। সম্প্রতি নরওয়ে চেসে ও ক্রোয়েশিয়া র‍্যাপিডে গুকেশ খোদ কার্লসেনকে দু বার হারালেন। প্রজ্ঞানন্দও হারালেন।

অন্য দিকে ২০২৪এ বুডাপেস্টে ৪৫ তম চেস অলিম্পিয়াডে রেকর্ড গড়ে ভারত। সোনা জেতে ভারতের পুরুষ এবং মহিলা দল। প্রথমবার চেস অলিম্পিয়াডে সোনা জিতল ভারত। ফাইনাল রাউন্ডে স্লোভেনিয়াকে পরাজিত করে শীর্ষস্থান দখল করে ভারতের পুরুষ চেস দল। জয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন দাবাড়ু ডি গুকেশ, অর্জুন এরিগাইসি এবং আর প্রজ্ঞানন্দ।

এই চেস অলিম্পিয়াডের অন্যতম শক্তিশালী প্রতিপক্ষ রাশিয়ার ভ্লাদিমির ফেদোসিভকে হারিয়ে চমক দিয়েছিলেন গুকেশ। অন্যদিকে অর্জুন এরিগাইসি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পরাজিত করেন স্লোভেনিয়ার ইয়ান সুবেলজকে। রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দও দুরন্ত ছন্দে ছিল এই প্রতিযোগিতায়।

পুরুষদের মতো ভারতের মহিলা চেস দলও চমক দেন এই চেস অলিম্পিয়াডে। ফাইনাল রাউন্ডে আজারবাইজানকে পরাজিত করে সোনা নিশ্চিত করেন ভারতের মহিলা দাবাড়ুরা। এই ঐতিহাসিক জয়ের আগে ভারতের পুরুষ চেস দল ব্রোঞ্জ মেডেল জয় করেছিল ২০১৪ এবং ২০২২ সালের চেস অলিম্পিয়াডে। ভারতীয় মহিলা চেস দলও ২০২২ চেস অলিম্পিয়াডে ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছিল। ২০২৫ দাবা বিশ্বকাপে দিব্যা দেশমুখ চ্যাম্পিয়ন ও কানেরু হাম্পি রানার্স হলেন।

ওই বছরেই নিজের গুরু বিশ্বনাথন আনন্দকে পরাজিত করে নতুন ইতিহাস তৈরি করেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। ২০২৪-এ লন্ডনে আয়োজিত ডাবলু আর মাস্টার্সে মুখোমুখি হয়েছিলেন এই দুই দাবাড়ু। ডাবলু আর চেস মাস্টার্সের কোয়ার্টার ফাইনালে ৫ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এবং ভারতীয় দাবা জগতের কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দকে পরাস্ত করেন প্রজ্ঞানন্দ।

গুকেশ ডোম্মারাজু বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জেতায় ভারত একটা অবিশ্বাস্য রেকর্ড স্পর্শ করল। জানি না, ক'জন এই ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন। ভারত আক্ষরিক অর্থেই বর্তমান সময়ের দাবায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। গুকেশ ব্যক্তিগত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, দাবা অলিম্পিয়াডে ভারতীয় মহিলা ও পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন। দাবা অলিম্পিয়াডই দলগত বিভাগে শ্রেষ্ঠ দাবা প্রতিযোগিতা। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশ কয়েকবার এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। তাছাড়া অন্য কোনও দেশের এই কৃতিত্ব ছিল না। ভারত সেটাই অর্জন করল।

ভারতের এই কৃতিত্বে যাঁর বুকটা সংগত কারণেই দশ হাত হওয়ার কথা ছিল, সেই ম্যানুয়েল অ্যারনের অভাব খুবই বোধ করছি। একসময় ভুল বোঝাবুঝির জন্য আমাদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। পরে তা আবার মিটেও গিয়েছিল। এই তামিল খ্রিস্টান ভদ্রলোকই দেশে প্রথম রাজ্য দাবা সংস্থা বানিয়ে রাজ্য দাবার আয়োজন করেছিলেন। তারপর বছর কয়েকের মধ্যেই হল পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্র দাবা সংস্থা। ভারতে 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি' গড়ার কাজ সেই শুরু।

ম্যানুয়েল ছিলেন দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মাস্টার (আইএম)। সেটা ছিল ১৯৬১ সাল। ওঁর ১৭ বছর পর দেশের দ্বিতীয় আইএম হয়েছিলেন ভি রবিকুমার। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আনন্দ দেশের প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার হন ১৯৮৮ সালে। গত বছর মে মাসে দেশের ৮৫ নম্বর গ্র্যান্ড মাস্টারের খেতাব অর্জন করেছেন পি শ্যামনিখিল। এর মধ্যে চারজন মহিলা। বিশ্বনাথন আনন্দ থেকে গুকেশ, শ্যামনিখিল, ভারতের ৮৮ জন 'জি এমে'র মধ্যে 'জি এম তৈরি কারখানা' তামিলনাড়ুর 'জি এম'ই বেশি। অ্যারন আজ বেঁচে থাকলে দেখতেন, তিনি যে চারাগাছটি গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে রোপণ করেছিলেন সেটি আজ মহীরুহে পরিণত।

দাবার জন্ম কোথায়, এ নিয়ে একসময় যথেষ্ট বিতর্ক ছিল। ইতিহাসবিদদের অধিকাংশই মনে করেন, পৌরাণিক ভারতের 'চতুরং' খেলাটিই আজকের দাবা। ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে 'চতুরং' তৎকালীন পারস্যে প্রবেশ করে হয় 'শতরঞ্জ'। শুধু পারস্যে নয়, অনাহূত মুসলিম শাসকদের হাত ধরে আবার দাবা যখন ভারতে ফিরে আসে, তখন

থেকেই দাবা 'শতরঞ্জ'। আওয়াধের নবাব কবি ও দার্শনিক ওয়াজিদ আলি শাহ'র 'শতরঞ্জ'- প্রেম নিয়েই সত্যজিৎ রায়ের বিশ্ববিখ্যাত ছবি 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'।

সত্যজিৎ ইচ্ছে করলেই 'চতুরং' নামটি ফিরিয়ে আনতে পারতেন, কিন্তু স্বদেশ প্রীতি দেখাতে গিয়ে উনি ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা করেননি। তো চতুরং হোক বা শতরঞ্জ, এখানে খেলাটা হত ভারতীয় নিয়মে – বোড়ে একটার বেশি চাল দিতে পারত না। আন্তর্জাতিক নিয়মে বোড়ে প্রথম চালটা দু'ঘর-ও দিতে পারে। আর রাজার 'ক্যাসলিং' বলে কোনও চাল ভারতীয় প্রথায় ছিল না। ভারতীয় দাবায় এইরকম প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক পরিবর্তনগুলোও এনেছিলেন অ্যারন। নাহলে ভারত অনেক পিছিয়ে থাকত।

একসময়ে দাবার একচ্ছত্র সম্রাট সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর আজকের রাশিয়ার শেষ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভ্লাদিমির ক্রামনিক। ২০০৭ সালে তাঁকে হারিয়েই প্রথমবার বিশ্ব খেতাব জিতেছিলেন আনন্দ। তারপর রাশিয়ার দাবা অস্তাচলে। ভারতের উত্থান শুরু। ভারতের এই উত্থান মেনে নিতে পারেননি ক্রামনিক ও রুশ দাবা সংস্থা। গুকেশ বিশ্ব খেতাব জেতার পরই ক্রামনিক বললেন, 'এন্ড অফ চেস। এত বাজে খেলা ভাবা যায় না।' আর খেতাবি লড়াইয়ের শেষ গেমে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন চিনের ডিং লিরেন ভুল চালে হারতেই রুশ দাবা সংস্থার প্রেসিডেন্ট দাবি করলেন, 'লিরেন গট-আপ খেলেছে। ফিডে তদন্ত করুক।'

ফিডে এই দাবি সঙ্গে সঙ্গেই খারিজ করে দিয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার যে, শুধু গুকেশের নয়, ভারতের সাফল্য রাশিয়া মেনে নিতে পারছে না। অথচ ক্রামনিকের ঘোষিত মেন্টর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভ কিন্তু হাসিমুখে গুকেশের সঙ্গে ছবি তুলেছেন। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ম্যাগনাস কার্লসেন প্রশংসা করেছেন গুকেশের। গুকেশের এই জয়কে ম্যাজিকাল বললেই বোধ করি সঠিক মূল্যায়ন করা হয়। ববি ফিশার, কাসপারভ ও কার্লসেনের সঙ্গে একই পংক্তিতে চলে এলেন গুকেশ।

এই তিন কিংবদন্তির মতো প্রথমবার ক্যান্ডিডেটস দাবায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করেই জিতলেন বিশ্ব খেতাব। আর এই তিন কিংবদন্তিকে পিছনে ফেলে এমন একটি নজির সৃষ্টি করলেন গুকেশ, যা ভাঙা প্রায় অসম্ভবই। এতকাল সবচেয়ে কম বয়সে বিশ্ব খেতাব জেতার নজির ছিল কাসপারভের। গুকেশের এই রেকর্ড যেন উসেইন বোল্টের ৯.৫৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়োনো। বোল্টের এই বিশ্ব রেকর্ড কবে কে ভাঙতে পারবেন, আদৌ কোনও দিন ভাঙা সম্ভব হবে কি না, সময়ই তার উত্তর দেবে। কাসপারভের কনিষ্ঠতম দাবাড়ু হিসেবে বিশ্ব খেতাব জেতার রেকর্ড গুকেশ ভাঙলেন চার বছরেরও কম সময়ে।

দাবার মতো একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার খেলায় চার বছরের কম সময় একটা দীর্ঘ পথ। একজন দাবাড়ু যখন একটা চাল দেন, তখন তিনি পরবর্তী অন্তত দশ বারোটা চালের পারমুটেশন কম্বিনেশন ভেবে রাখেন। যাঁর আইকিউ যত বেশি, তাঁর চিন্তাশক্তি আরও বেশি। ফলে তিনি আরও বেশিসংখ্যক চালের পারমুটেশন কম্বিনেশন করতে পারেন। অনেক সময়ই সময়ের চাপে ভুল চাল দিয়ে ফেলেন দাবাড়ু। সময়ের চাপে পড়ে গেলে প্রতিপক্ষ সেই সুযোগ নিয়ে ভুল চাল দিতে বাধ্য করেন।

বিশ্বের সব খেলার পরিণতি একটা ভুলের ফল। গুকেশের কৃতিত্ব এখানেই যে, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লিরেনকে তিনি ভুল চাল দিতে বাধ্য করেছিলেন। যে ছেলেটা সাত বছর বয়সে অনূর্ধ্ব-১২ ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জেতে এবং মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়, তার ক্ষমতা যে সুপার হিউম্যানিক স্বীকার করতেই হবে। লিরেন 'ব্লান্ডার' করেছেন বলে গুকেশের জয়কে যাঁরা খাটো করতে চাইছেন, তাঁরা ভারতের অসাধারণ সাফল্যে ঈর্ষান্বিত।

ভারতীয় দাবাকে বিশ্বের মানচিত্রে প্রথম তুলে ধরেছিলেন, মুম্বইয়ের সুলতান খান ও গুলাম ফতিমা। এঁরা দুজনেই ছিলেন কর্নেল নবাব উমের হায়াত খানের কাজের লোক। সুলতান ছিলেন রাঁধুনি এবং ফতিমা ঘরদোর পরিষ্কার রাখতেন। সুলতানের কাছে দেখে দেখে দাবা শিখেছিলেন ফতিমা। তারপর দু'জন হয়ে উঠেছিলেন দাবা খেলার পার্টনার। হায়াত খান দাবায় ওঁদের আগ্রহ দেখে, ১৯৩০ সালে পাকাপাকিভাব ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ার সময়, উনি সুলতান ও ফতিমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান। ১৯৩৩ সালে দু'জনেই ব্রিটিশ চেস চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেন এবং দু'জনেই খেতাব জিতেছিলেন। ফতিমা এগারো রাউন্ডের প্রতিযোগিতায় সাড়ে দশ পয়েন্ট পেয়েছিলেন। তিনি জিতেছিলেন তিন পয়েন্টের ব্যবধানে। আর সুলতান পরপর তিন বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। তারপর দেশে ফিরে আসেন।

গত বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে মেসি আলভারেজকে দিয়ে যে গোলটি করিয়েছিলেন, সেই গোলটি ভাবুন। মেসি ডান দিক দিয়ে উঠছেন। তাঁকে ফ্রান্সের দু'জন ডিফেন্ডার আটকানোর চেষ্টা করছেন। জার্সি টেনেও থামাতে পারছেন না। তারপর মেসি বক্সে না ঢুকেই গোল লাইন থেকে একটা মাইনাস করলেন। বলটা ফ্রান্সের দু'-তিনজন ডিফেন্ডারের পায়ের তলা দিয়ে আলভারেজের পায়ে। আলভারেজের গোল না করতে পারার কোনও বাধা ছিল না। আসলে মনে হয়, বড় বড় খেলোয়াড়দের সুপার হিউম্যানিক ক্ষমতা গড়ে ওঠে। যার জন্য শুধু প্র্যাকটিস ছাড়া কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির প্রয়োজন হয় না।

দিব্যেন্দু বড়ুয়া ভারতের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার। দিব্যেন্দু জিএম হয়েছিলেন ১৯৯১ সালে। তাঁর সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে বেশ কিছু প্রতিভাবান দাবাড়ু উঠে এসেছিলেন বাংলায়। যেমন সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চন্দ, নীলোৎপল সাহা, সপ্তর্ষি রায় প্রমুখ। সূর্যশেখর বিশ্ব খেতাবি লড়াইয়ে আনন্দের টিমেও ছিলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্র্যান্ড মাস্টার হয়েই এঁরা সন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। ফলে আর এগোতে পারেন না। আর বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে খেলার পরিকাঠামো করুণ অবস্থায়। ক্লাবগুলো বার্ষিক দু'লক্ষ টাকা করে বার্ষিক সরকারি অনুদান পেয়ে এখন সব বিয়েবাড়িতে পরিণত। খেলা সব লাটে।

শিল্প সংস্কৃতি

শতবর্ষে তৃপ্তি মিত্র (১৯২৫-১৯৮৯)

দেবাশিষ মুখোপাধ্যায়

অবিভক্ত ভারতের অবিভক্ত দিনাজপুরে বাংলা থিয়েটারের অবিসংবাদী অভিনেত্রী তৃপ্তি ভাদুড়ির জন্ম। তাঁর মা শৈলবালা দেবী একই সঙ্গে ছিলেন সেকালের প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাই ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল অভিনয় ও স্বাধীনচেতা এক সত্তা। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও নাট্যকার রূপে পরিচিত তাঁর মাসতুতো দাদা বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' নাটকে মাত্র ১৮ বছর বয়সেই এক চল্লিশ বছর বয়সী নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করে নাট্যজগতকে একেবারে চমকে দেন। তাঁর এই অভিনয় দেখে খাজা আহম্মদ আব্বাস তাঁকে বম্বে নিয়ে যান গণনাট্য সংঘের ছবি 'ধরতী কে লাল' চলচ্চিত্রে অভিনয় করার জন্য। সেখানে তার পরিচয় হয় বাংলা নাটকের কিংবদন্তী শম্ভু মিত্রের সঙ্গে। পরিচয় থেকে প্রেম আর প্রেম থেকে পরিণয়। তৃপ্তি ভাদুড়ি থেকে তৃপ্তি মিত্র হয়ে যান। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে স্বামীর সঙ্গে একযোগে সৃষ্টি করেন এক নতুন নাট্যগোষ্ঠী 'বহুরূপী'। তারপর সেই দলের প্রযোজনায় 'পথিক', 'উলুখাগড়া', 'ছেঁড়া তার', 'চার অধ্যায়', 'রক্তকরবী', 'পুতুল খেলা', 'বিসর্জন', 'রাজা ওয়াদিপাউস', 'বাকি ইতিহাস', 'চোপ আদালত চলছে', 'দশচক্র', 'রাজা', 'মৃচ্ছকটিকা' একের পর এক সফল প্রযোজনা ও তাঁর স্মরণীয় অভিনয়ে দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সাংসারিক কারণে তিনি বাধ্য হন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে। কিন্তু সেখানেও তিনি সমানভাবে দর্শকদের মন জয় করে নেন। 'সেতু',

তৃপ্তি মিত্র

'হাসি', 'বিরাজ বৌ', একের পর এক নাটকই শুধু নয়, 'পথিক', 'কাঞ্চনরঙ্গ', 'মুক্তধারা', 'গোপীনাথ', 'জাগা হুয়া সাভেরা' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' অবলম্বনে পাকিস্তানী পরিচালক এ. জে. কারদার পরিচালিত আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত উর্দু সিনেমা), 'আওয়ার ইণ্ডিয়া', 'চারণকবি মুকুন্দ দাস', 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' প্রভৃতি চলচ্চিত্রেও সমান কুশলতা প্রদর্শন করেন। 'বহুরূপী'র হয়ে 'ডাকঘর', 'গণ্ডার', 'কিংবদন্তী', 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি নাটক তিনি পরিচালনাও করেছিলেন। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে 'বহুরূপী'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তৈরি করেন নতুন নাট্য দল 'চেনামুখ'। সেই দলের প্রযোজনায় অসামান্য অভিনয় করেন 'সরীসৃপ' নাটকে।

এরই মধ্যে চলছিল 'শিবতোষ ভাদুড়ি' ছদ্মনামে গল্প ও নাটক লেখা। অত্যন্ত সুন্দর আবৃত্তি করতে পারতেন তিনি। আকাশবাণীর প্রোডিউসর এমিরেটাস ছিলেন তিনি ১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত। কিছুদিন বিশ্বভারতীর ভিজিটিং ফেলো থেকে তিনি সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের অভিনয় শিক্ষাও দিয়েছিলেন। শুধু দেশের মাটিতে নয় বিদেশে আমেরিকা, রাশিয়া, ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন দেশে তিনি তাঁর অভিনয় প্রতিভা বিচ্ছুরিত করেছিলেন। পেয়েছেন সঙ্গীত-নাটক-একাদেমির দীনবন্ধু পুরস্কার, মধ্যপ্রদেশ সরকারের কালিদাস সম্মান। তাঁর একমাত্র সন্তান বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শাঁওলি মিত্র। এমন এক বিদুষী, মহিয়সী নারীর জন্ম শতবর্ষে রইল আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান।

শ্যাম বেনেগাল (১৯৩৪-২০২৪)

প্রবীর সিংহ

ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে সত্যজিৎ রায়-ঋত্বিক ঘটক-মৃণাল সেন পরবর্তী সমান্তরাল ধারার অন্যতম ধারক ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক শ্যাম বেনেগাল। তার আগেই জন আব্রাহাম, মণি কাউল, সথ্যু, কুমার সাহানিরা এই ধারার ছবির বলিষ্ঠ পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। শ্যাম বেনেগাল তাঁর ছবিকে নিয়ে গেলেন দর্শকের অনেক কাছে। ৭০-র দশকে তাঁর পরিচালিত 'অঙ্কুর' ('৭৩), 'চরণদাস চোর' ('৭৪), 'নিশান্ত' ('৭৫), 'মন্থন' ('৭৬), 'ভূমিকা' ('৭৭), 'জুনুন'

শ্যাম বেনেগাল

('৭৯) সাড়া ফেলে দিল। বিজয় তেণ্ডুলকার, ধরমবীর ভারতী, রাস্কিন বন্ড, বনরাজ ভাটিয়া প্রমুখের চমৎকার সৃষ্টিগুলির দৃশ্যরূপ ঘটল। উঠে এলেন নাসিরুদ্দিন শাহ্, শাবানা আজমি, ওম পুরি, স্মিতা পাতিল, অনন্ত নাগ, সাধু মেহের, কুলভূষণ খরবান্দা, অমরীশ পুরি, দীপ্তি নাভাল, নীনা গুপ্তা, রাজিত কাপুর, রাজেশ্বরী সচদেব প্রমুখ প্রতিভাবান নবীন শিল্পীরা। তারপরপরই সমান্তরাল ধারায় উঠে এলেন গোবিন্দ নিহালনি, সৈয়দ মির্জা, সাই পরাঞ্জপে, কেতন মেহতা, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী,

গৌতম ঘোষ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, কল্পনা লাছমি প্রমুখ প্রতিভাবান চলচ্চিত্র পরিচালকরা।

উত্তর কর্ণাটকের কোঙ্কনি পরিবারের হলেও পিতার কর্মসূত্রে বেনেগালের জন্ম, বেড়ে ওঠা, শিক্ষা সবই হায়দ্রাবাদে। পিতাও ছিলেন নামী চিত্রগ্রাহক। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর শ্যাম বেনেগাল বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কপি রাইটের কাজ করেছেন। সেইসময় একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি করেন 'ঘর বেঠা গঙ্গা' ('৬২) গুজরাতি ভাষায়। ১৯৬৭তে তাঁর প্রস্তুত তথ্যচিত্র 'আ চাইল্ড অফ দা স্ট্রীটস' পুরস্কৃত হয়। তাঁর প্রস্তুত ২৪টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র, ৪০টি তথ্য চিত্র, ছয়টি টিভি সিরিজ এবং চারটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির মধ্যে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেছে। জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেছে ১৩টি চলচ্চিত্র ও দুটি তথ্যচিত্র। '৮০-র দশকে তাঁর উজ্জ্বল সৃষ্টিগুলির মধ্যে 'কলযুগ', 'মাণ্ডি' ও 'ত্রিকাল' উল্লেখযোগ্য। '৯০-র দশক ও তার পরে 'সূরজ কা সাতোয়া ঘোড়া', 'ওয়েলকাম টু সজ্জনপুর', 'ওয়েল ডান আব্বা' প্রমুখ। মুসলমান নারীর উপর তাঁর ট্রিলজি 'মাম্মো', 'সরদারি বেগম' ও 'জুবেইদা' তিনটিই জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত। মহাভারত, স্বাধীনতা সংগ্রাম, গোয়ায় বসবাসকারী পোর্তুগিজ, গান্ধী, সুভাষ, নেহরু, মুজিব—বহু বিষয় ও চরিত্র নিয়ে কাজ করেছেন। পেয়েছেন দাদা সাহেব ফালকে, পদ্মভূষণ সহ বহু সম্মাননা।

মনোজ মিত্র (১৯৩৮-২০২৪)

অবন শূর

বছরটা মনে নেই। একাডেমিতে 'সুন্দরমে'র 'সাজানো বাগান' নাটকটি দেখতে গেছিলাম। নাটক শুরু হলে আধো অন্ধকারে তাঁর দীন পর্ণকুটির থেকে বাঞ্ছারূপী মনোজ মিত্র অনেকটা সময় ধরে হ্যাচর প্যাচর করে বেরোলেন। ভরা হল একদম নিশ্চুপ। তারপর শুরু হল নাকি সুরে সাতক্ষীরা বসিরহাট অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষায় হাস্যরস ভরা অসাধারণ সব সংলাপ আর চাবুক অভিনয়। সেই আকর্ষণে আমরা অভিভূত হয়ে টানা দেখে গেলাম, বলা ভালো নির্ভেজাল আনন্দ উপভোগ করে গেলাম। বিখ্যাত পরিচালক তপন সিংহের 'বাঞ্ছারামের বাগান' সিনেমায় মনোজ মিত্রের দুর্দান্ত অভিনয় ধরেই বলছি যাঁরা তাঁর অভিনীত নাটকটি দেখেননি সত্যিই মিস করেছেন।

মনোজ মিত্র

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গল্পকার যশোরের কেশবপুরের মনোজ বসু চলে গেছেন সেই কবে ১৯৮৭-তে, আর এবার চলে গেলেন দর্শনের অধ্যাপক, বাংলার বিশিষ্ট - নাট্যকার, নাট্য পরিচালক, অভিনেতা এবং চলচ্চিত্র অভিনেতা খুলনার সাতক্ষীরার মনোজ মিত্র।

পরবাস, কাল বিহঙ্গ, চাক ভাঙ্গা মধু, অলকানন্দার পুত্রকন্যা, গল্প হেকিম সাহেব, নরক গুলজার, দেবী সর্পমস্তা, রাজ দর্শন প্রভৃতি কত সব মঞ্চসফল নাটক লিখেছেন, প্রযোজনা করেছেন। ১০০-র বেশি নাটক লিখেছেন। তাঁর নাটক অন্য থিয়েটার, বহুরূপী সহ অনেক নাট্য গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করেছে। চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, বাসু চ্যাটার্জি, শক্তি সামন্ত, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ প্রমুখের নির্দেশনায়। ভারত - বাংলাদেশ প্রযোজনায় 'হঠাৎ বৃষ্টি' চলচ্চিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। পুরস্কৃত হয়েছেন সঙ্গীত নাটক একাডেমি সহ বহু সম্মাননায়। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমর মিত্র প্রথিতযশা সাহিত্যিক। আজও অফিস, ক্লাব ও অ্যামেচার নাট্য গোষ্ঠীর সবচাইতে পছন্দের ও অভিনীত নাটক বলতে এককথায় মনোজ মিত্রের নাটক।

উৎপলেন্দু চক্রবর্তী (১৯৪৮-২০২৪)

বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার উৎপলেন্দুর জন্ম পাবনায়। উচ্চশিক্ষা কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে। স্বর্ণ মিত্র নামে ছোট গল্প লিখে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পুরুলিয়ায় আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করতে চলে গেছিলেন। বাংলা-ওড়িশা সীমান্তে আদিবাসীদের পড়ানোর কাজে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৭এ তাঁর তথ্য চিত্র 'মুক্তি চাই' সাড়া ফেলে। তারপর ময়না তদন্ত, চোখ, দেবশিশু, ফাঁসি প্রভৃতি চলচ্চিত্র; দেবব্রত বিশ্বাস, দি মিউজিক অফ সত্যজিৎ রে, সুনীল সাগরে তথ্যচিত্র; বেশ কিছু টেলি ফিল্ম নির্মাণ করেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার পান। তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী কবি ও চলচ্চিত্রকার শতরূপা সান্যাল।

কমল এক ফেনোমেনন

ধূর্জটিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আমি বিপন্ন—এ প্রতিপন্ন হয়েছে আজ। সোনাঝুরি শাখা—মেলে অগ্নিপাখা চিতাসজ্জা আজ।

ওই দেহ খানি—জান, কতখানি আমারও রাজ। শুধু দেহ নাকি! পরম নহে কি? এ দহন সাজা!!

তুমি জ্বলে যাবে—বেশ তাই হবে, হে মহারাজ। তুমি কেন এত—নাটক সাজাতে মেটাতে কাজ!!

তুমি বললেই—আকাশ পানে ওই, আমি গৃহরাজ। চক্কর দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হিয়ার চূড়ায় তাজ।

তবু দাউ দাউ—অগ্নি বেহায়া তোমার রাজ। তোমার কাজ—আমায় দিওনা তোমার কাজ

আমি পারব না হে মহারাজ।।

ওপরের লেখাটুকুর ভাব সম্প্রসারণ করলেই আমার সঙ্গে কমল চক্রবর্তীর সম্পর্কটা স্বচ্ছ হয়ে যাবে। নিজেকে সরিয়ে দিয়েও লেখা যেত। কিন্তু, প্রবন্ধের লৌহপ্রতিমতায় এই মানুষটাকে ধরা সমীচীন হবে না।

কবি কমল চক্রবর্তী

দাউ দাউ করে চিতা জ্বলতে শুরু করল। অরণ্য মধ্যে সবুজ এক প্রান্তর। ততটুকু বাতাসই বইছিল যা আগুনকে উস্কে দিতে পারে। এই অরণ্য একজন কবির অবিরাম উন্মাদনায় খর ও দূষণের বিরুদ্ধে নয়নাভিরাম। সেই কবিই তাঁর একান্ত আপন সোনাঝুরি বনে এই দৃশ্য নিজেই আয়োজন করে রেখেছেন। হ্যাঁ, এই দৃশ্য তাঁরই আয়োজিত। এর আগে মূলনিবাসী কিশোররা বহন করে এনেছে তাঁর শবদেহ—জয় বৃক্ষনাথ ধ্বনি দিতে দিতে। কিছু কিশোর বৃক্ষ তাদের কাণ্ড, ডালপালা দান করেছে কবির সঙ্গে সহমরণে যাবার জন্য। কমল বলতেন, ওরা আমার গল্প শুনে বড়ো হয়েছে। জানিনা, কোনও কবি অতীতে এরকম ভাবে তাঁর সৎকার আয়োজিত করে গেছেন কি না। এই অনন্যতার আয়োজন—এটাই হল মানুষটার মনস্তত্ত্ব। কমল আজন্ম ব্যতিক্রমী হতে চাওয়ায় এক দুরূহ প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চেয়ে এসেছেন।

১৯৪৪ সালে জামশেদপুরে ঝাড়খণ্ডের সেরা এই বাঙালি কবির জন্ম হয়েছিল টাটার কারখানার এক শ্রমিকের গৃহে। না। পরিবেশ কখনোই কাব্যময় ছিল না। সাত ভাই-বোনের সংসারে সবচেয়ে বড়ো ভাইয়ের ওপর চাপ ছিল দ্রুত রোজগেরে হবার। আদ্যন্ত সাহিত্যানুরাগী হওয়া সত্ত্বেও করতে হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিপ্লোমা। টাটা বাবার বদান্যতায় চাকরি পেতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি সেই উদভ্রান্ত যুগেও। এই চাকরি কবিকে যে নিরাপত্তা দিয়েছিল, তা কবি বর্ণনা করেছেন তাঁর কবিতায়—

''আমি কারখানায় ফিরে যাব... গবরিয়া অরণ্যের দাঁতাল শুয়োর পথ রুখে দাঁড়াল রাস্তায়... পাহাড়ি শিউলির টানে যদি ভাসে ওই আকরিক লোহা...যদি মাথায় করোগেট ডোবে আষাঢ়ে ঝরনায়... তবু ফেরা নয়...মজদুরের ফেরা মানে আগুনের ফার্নেস থেকে বৈদ্যুতিক বিছানায়, গাঢ় ঘুম... তবু জ্যেষ্ঠ ভাই-এর মতো পাহাড়ের ছায়া কাঁধে পড়ে... রক্ষিত দুঃখের কাছে রিজার্ভ ফরেস্ট কত অগভীর...সে শুধু মজদুর জানে যে শুনেছে ভোরের হুটার।''

কমল অনেক কষ্টে সাহিত্যের কাছে যাবার পরম আকুতিতে চাকরি বজায় রেখেই রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতে ভর্তি হয়ে গেল বাংলায় এমএ পড়তে। তখন সে সাতাশ বছরের যুবক। প্রায় একই সময় জুটে গেছিল সমমনস্ক কয়েকজন কবি। পুরোধায় বারীন ঘোষাল, সুভাষ ভট্টাচার্য, অরুণ আইন প্রমুখ। প্রকাশ হতে শুরু হয়েছিল এক ব্যতিক্রমী বাংলা পত্রিকা। হ্যাঁ। কৌরব। নামটা কার দেওয়া—তা সঠিক জানা নেই। তবে, কমলের মধ্যে যে ব্যতিক্রমী মনন ছিল তার সঙ্গে এই নাম নির্বাচন খুবই মেলে। কৌরব হয়ে উঠল এই যুবকগোষ্ঠীর ভালোবাসা, বন্ধুতা ও নব রীতির পদ্য-গদ্য নির্মাণের আঁতুড়ঘর। কৌরবকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার আপ্রাণ প্রয়াস ছিল সব আয়োজক বন্ধুদের মধ্যেই। কিন্তু, কমলের পরিশ্রম ও একাগ্রতা ছিল দেখবার মতো। এমনটা বারীন ঘোষালের কাছ থেকেই শোনা। কৌরবের মাধ্যমে দমবন্ধ হওয়া কমল পেল মুক্তির আশ্বাস। কমল তার সখাদের সঙ্গে যাপন চিত্র বেটে নিচ্ছিল—

''আমরা ক'জন যারা কালিমাটি রোড ধরে হাঁটি...বুকের গভীরে খুঁজি তাজা খরকাই...শিফট ডিউটির পর তাদেরও কদম বেচাল... কখন সন্ধে হয় বুক বরাবর নামে তেজি স্টেপ-ড্রিল... আশেপাশে ফলমুল সাজানো দোকান...কোকোমল্ট কিনে নেয় স্ফীতকায় সাহেবের বৌ... তবু সব গতিহীন... যেন গোলচাক্কির পাশে সেই পাপেট পুলিশ... অবিরত হাত তোলে... জানেনা নিজেই কখন দু'খানা হাত কাটা গেছে তার... তবু আমরা রোজ কালিমাটি রোড ধরে হাঁটি... পলাশের চারা ফিরি করি... এসব বৃক্ষ জানে মহীরুহ হতে...অশুভ বাতাস মুছে শীতল ছায়ায় ঢেকে দেবে।''

শিল্পনগরী জামশেদপুর কমলের কবিতায় ওতপ্রোত ছিল। টাটানগরের রূপকার ও অন্নদাতা টাটার প্রতি কবির ছিল অপরিসীম সমীহ আবার সঙ্গে কিছু অনির্বচনীয় ক্ষোভ। এই ক্ষোভের কারণ নিহিত ছিল অরণ্যর প্রতি নিবিড় প্রেমে।

''তুমার ডেরায় টাটা বাবা... তিন পুরুষের উঠা বসা খাওয়া... সাঁধের বেলা কুঁকড়া লড়াই...রেত বিরেতে মহুয়া বনে শুয়া। কেঁদ গাছেতে লাইগল আগুন...রানীক্ষেতে দুখার মায়ের বুক...পটমদার

হাটের দিনে...চালের সাথে বিকে দিলে সুখ। টাটা বাবা, আগুন দিলে...লোহা লিলে..দুয়ার মায়ের বুকের থিকে...মহুয়া গাছের ছায়া লিলে কেন?...বিয়ান বেলায় উঠে দেখি...পালক মেলা পইড়ে আছে...কুঁকড়া দুটা নাই সেঠিনে কেন?''

জামশেদপুরের পরই যদি কোনও মহকুমা নগরীর নাম কবি কমলের পছন্দের তালিকায় রাখতে হয়, তবে তা অবশ্যই—চাইবাসা।

ভালোপাহাড় স্বাস্থ্যকেন্দ্র

''ডাক-বাংলোর বন্ধ বিষণ্ণতায় জেগে উঠলো রোরো...কাননপথের অভিমান... পয়েন্টস্‌ম্যানের ভাঙা খাট্টা মুখ, কবেকার জাল-শেওড়াফুলি। আদর্শ হাওয়া বেড়ে টপ্পা গেয়েছিল, মহাশয়...প্রাতরাশে আণ্ডাভাজা, সিঙাড়া পোকড়ি, মনে পড়ে? ভয়ংকর শব্দে বাজে সাড়ে নটা বিবিধ ভারতী। এ ভুখা কাননপথে রবীন্দ্রসঙ্গীত জমে না... কালোর চায়ে কি কিছু কম চিনি ছিল? রঘুর দোকানে এসো। হাত গরম ত্রি-কোণ চাইবাসা। আঁচলের ঝরনা খুলে দাঁড়ালো যুবতী, ভিস্তিওয়ালা মাংসের ফোয়ারায় নাচে দেশোয়ালি চাঁদ বনভোজনে এসো। ফিরে এসো দুঃখী মানুষের কার্বন কপি।''

কমল চক্রবর্তীর জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান মানুষটি ছিলেন পূরবী মুখোপাধ্যায়। উদ্‌ভ্রান্ত এক প্রতিভাকে কী করে বাঁধতে হয় এবং একই সঙ্গে ছাড় দিতে হয় সৃজনের উন্মীলনে সচ্ছল করতে—তা এই মহীয়সী জানতেন। কৌরবের সূচনা পর্বে পূরবী মুখোপাধ্যায় কতটা ওতপ্রোত ছিলেন তা আমার জানা নেই। তবে পূরবীদেবীর কলকাতা নগরীর পরিচিত অসংখ্য বিদ্বজ্জনদের সঙ্গে কমলকে মিলিয়ে দেবার দায়িত্বে ছিলেন তিনি সুনিপুণা। অযোগ্য পাত্রে পূরবীদেবী তাঁর পরিচিতির সম্ভার তুলে দেননি। বর্তমানে জামশেদপুর নগরীটি গড়ে উঠেছিল সাকচি নামের এক গ্রামকে কেন্দ্র করে। সেই সাকচির বিখ্যাত মুখার্জি পরিবারের গৃহবধূ ছিলেন পূরবী। পূরবীদেবীর স্বামী ও শ্বশুর দু'জনেই ছিলেন শহরের প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। কৌরব পত্রিকা ষাটের দশকের শেষে শুরু হলেও গতি পায় সত্তরের দশকে এসে। এবং এই সময় কমলের সামনে কলকাতা নগরীর গুণীজনদের দরজা খুলে দেন এই পূরবীদেবী। বহুবার শুনেছি কমলদার মুখে—এই মানুষটা না থাকলে আমি কিছুই করে উঠতে পারতাম না। পূরবীদেবীকে কমলদা মেন্টর বলে উল্লেখ করতেন জনসমক্ষে। পরিণত বয়সেও কমলদা পূরবীদেবী সম্পর্কে কোনও আলোচনায় একটা অদ্ভুত ঘোরে থাকতেন।

যে উপন্যাস আমাকে ঔপন্যাসিক কমল-এ মুগ্ধ করেছিল, সেটি হল—ব্রহ্মভার্গব পুরাণ। ১৯৯৩ সালে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বলাই বাহুল্য যে, কমলদা নিজের অর্থে কৌরব প্রকাশনীর ব্যানারে বইটি ছেপেছিলেন। এর প্রচ্ছদ ও ভেতরের স্কেচ করেছিলেন শ্রী যোগেন চৌধুরী। বইয়ের প্রচ্ছদে লেখা ছিল—কমল চক্রবর্তী প্রণীত, যোগেন চৌধুরী চিত্রিত। এরপর, ২০০২ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করি আমি ও সাগরদা। এবারও কৌরব প্রকাশনীর ব্যানারেই। সেই সংস্করণের ভূমিকা লেখক লিখলেন—

''ধূর্জটি চ্যাটার্জী এবং সাগর মিত্রের মনে হয়েছে এই গ্রন্থটি আরও অনেকের পড়া দরকার। আরও সুন্দর ছাপা। আমরা কোনমতে বই প্রকাশ করতে পারলেই আনন্দিত। তারপর একবার যখন বই শেষ, বাঁচা গেল! কে আর ফের গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে! তাও আবার হিজড়ে। না, এরা কি যে পেল কে জানে। 'দ্বিতীয় সংস্করণ' আক্ষরিক অর্থেই করে ফেলল। এতো রাশি রাশি বই কাকে গেলাবে কে জানে। তিরিশ বছরে এইটুকু বুঝেছি, আর যাই হোক এই গ্রন্থের বিষয়, বিবেচনা, বিস্তার, বিবরণ বাঙালি পাঠকদের আহ্লাদের বস্তু নয়। তবু কাদের জন্য এই পুরাণ! কোন আস্তাকুঁড়ে যাবে দ্বিতীয়বারের ছাপা! এতো হাজার হাজার টাকা লজ্জায় মাথা কাটা যাবার জোগাড়।''

ব্রহ্মভার্গব পুরাণ-এর তৃতীয় সংস্করণ করা হল- ২০১২ সালের মে মাসে। এবারে পেপার ব্যাক। প্রকাশকের বক্তব্যতে লিখেছিলাম- প্রেম কমল চক্রবর্তীর প্রধান বিষয়। লেখক নিজেই হয়তো এই তথ্য সম্পর্কে অবহিত নন। এই না জানাই কমলকে নিয়ে গেছে মানুষকে অতিক্রম করে- যৌনতাকে অতিক্রম করে এক অযোনিসম্ভব প্রেমে। বিষয় হিজড়ে। কিমপুরুষ, নপুংসক এইসব নামে এরকম মানুষদের ডাকা হয়। কিন্তু পুরুষ বা নারীই যেন মানুষ হবার একমাত্র রেফারেন্স। হিজড়েকে নিয়ে এমন প্রেমের উপন্যাস বিশ্বের অন্য কোনো সাহিত্যে লেখা হয়েছে? তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হচ্ছে। খবর এল, লেখক বঙ্কিম পুরস্কার পাচ্ছেন। পেপার ব্যাকে পাঠকদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে বইটি পুনর্মুদ্রিত হল। কমলদা একটা দু'লাইনের ভূমিকা-*কিম্পুরুষ জীবনতরণী হে। তৃতীয় সংস্করণ! অসম্ভব আঁধার ও তলানির শব্দ-শৃঙ্খলা। সময় যত গড়াচ্ছে তত সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছে অপূর্ণ। অথবা আমরা অপূর্ণ অভিসারী। যেভাবেই হোক, হে পাঠক শুভেচ্ছা।* কমলদা তোয়াক্কাই করতনা কে প্রকাশক। ঝকঝকে একটা বই প্রকাশ হলেই শিশুর মতো আনন্দ। স্বল্পে খুশি হওয়াটা ছিল আর একটা মোহন গুণ যা মানুষটিকে মহান করেছিল আমার কাছে। অনেক বই ছাপা হল কমলদার। ব্রাহ্মণ নবাব, শামু জোনকো, ভালোবাসার গদ্য, প্রিয় ফরেস্টার (দ্বিতীয় মুদ্রণ), কুকুর, ধান, একশো কমল, মদের দোকানের সেই ছেলেটি।

কমলদার একটা স্থায়ী আবাস হয়ে উঠল আমাদের বাড়ির চিলেকোঠার ঘর। ওটা গেস্টরুম নয়, কমলদার ঘর। অন্য কেউ থাকত না সেই ঘরে। লাগোয়া একটা ছাদ ছিল। তক্তাপোশের নিচে রাশি রাশি বই, মানুস্ক্রিপট, ভালোপাহাড়ের ফাইল, দস্তাবেজ। মেয়েরা বলত- ঘরে একটা জেঠু জেঠু গন্ধ। এই ঘরের নিচের ঘরটি ছিল আমার পিতৃদেবের। রাত তিনটে অবধি চলত পিতৃদেবের বেহালা ও বাঁশি। কমলদা যেন এ বাড়িরই ছেলে। সবটাই যেন জানা। প্রথমদিন থেকেই কোনও কুণ্ঠা বা জড়তা ছিলনা। রাতে যদি ঘুমের অসুবিধা হয়! আমরাই কুণ্ঠিত হতাম। কুণ্ঠা ভেঙে দিল কমলদা স্বয়ং

একদিন সকালে চায়ের টেবিলে। বাবা রসিকতা করে- কি কমল, রাতে ঘুম ঠিক হচ্ছে তো! কমলদা- না মেসোমশাই, কাল আপনার বেহালা শুনতে পাইনি। আজকাল জামশেদপুরে ফিরে গিয়েও ঘুম আসেনা বেহালা না শুনে। কী যে বদ অভ্যাস হল!

হো-হো-হো-বাবা এইভাবেই উচ্চস্বরে হাসতেন। আমার বাবাকে- মেসোমশাই কিন্তু মা কে- মা বলেই সম্বোধন করতেন কমলদা। আমিও কমলদার মাকে- মা। যদিও কমলদার এগ্রিকো বাগানের বাড়িতে আমি মোটে চার-পাঁচ বার। সেই তুলনায় কমলদা অনেক অনেক গুণ বেশি আমাদের বাড়িতে। এটা ছিল কমলদার দ্বিতীয় গৃহ। কমলদা নিজেও তা বলতেন। বাবার সঙ্গে কমলদার একটা ভিন্ন ধরনের সখ্য তৈরি হয়েছিল। পরে, কমলদার ছোট গল্প 'মহীতোষ বাবুর মিউজিয়াম'- আমার বাবাকে নিয়ে। প্রকাশিত হয়েছিল বাবার মৃত্যুর পর। আমার ব্যাচেলর কাকা ছিলেন কমলদার ভাষায়- কমলদার আপ্ত শিক্ষক। এই বয়ানে 'ভালোবাসার গদ্য'র উৎসর্গও আমার কাকাকে করেছিলেন। আমার কাকা ছিলেন আদ্যন্ত এক অনুবাদক। ইংরাজি, হিন্দি ও বাংলা- এই তিন ভাষাতেই তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অগাধ। কাকার সবচেয়ে বড় কাজ ছিল ভারতের সংবিধানের অনুবাদ। কাকা কমলদার গল্পের কনটেন্ট খুব পছন্দ করতেন। কিন্তু, কমলদার ভাষার সমালোচক ছিলেন। কমলদার গুরুজনদের সঙ্গে ব্যবহার ছিল শেখবার মতো। যার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করা উচিত ঠিক সেরকম। যেরকম ফ্লেভারের আড্ডা দরকার, ঠিক সেই ফ্লেভার।

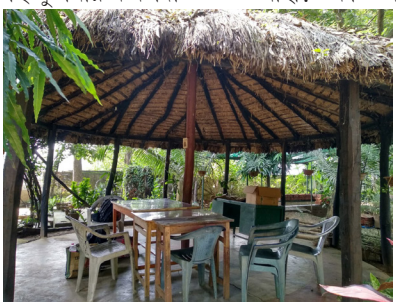
ভালো পাহাড়ের আড্ডা স্থল

একটা দিনের কথা স্মরণে আসছে। দিনটা ছিল ২রা মার্চ, ২০০২। আনন্দবাজার খুলে একটা পাতায় চোখ আটকে গেল। শঙ্করলাল ভট্টাচার্যর লেখা- "মনে পড়ে গেল প্রিয় কমলবাবুকে'' শীর্ষকে একটি উপন্যাসের সমালোচনা। উপন্যাসটির নাম- ব্রাহ্মণ নবাব। লেখক- কমল চক্রবর্তী।

"কমল চক্রবর্তীর উপন্যাস ব্রাহ্মণ নবাব পড়তে পড়তে আমার... না, পাঠক আমার মতিভ্রম হয়নি!... মনে পড়ে গেল প্রিয় কমলবাবুকে, কমলকুমার মজুমদার। কমলবাবুর ঈশ্বরপ্রাপ্তির পর এত সাধু, ঋজু, কাব্যিক গদ্যে কেউ বঙ্গীয় উপন্যাস প্রয়াস করেছেন বলে জানি না। ... ধর্ষণ ও শীৎকারের কোলাহলের মধ্য থেকে তিনি কান্না, উদ্ধার করেছেন। বিনোদিত হতে হতে আমরা, পাঠকরাও, লজ্জায় প্রবেশ করছি।"

লেখাটি পড়েই কমলদাকে ফোন। জানিয়েছিলাম যে, সমালোচনা গরম গরম থাকতে বইটি কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় দোকানে দোকানে পৌঁছে দেওয়া জরুরি। কমলদা উত্তেজিত। আমার একটা মারুতি জেন গাড়ি ছিল। কমলদাই বলেছিল- বাবাই, একটা লং ড্রাইভ। শুধু আমি আর তুই। তাই, ফোনটা শেষ হতেই গাড়ি নিয়ে রওনা দিলাম খড়গপুরের উদ্দেশ্যে। কমলদা জামশেদপুর থেকে লোকাল ট্রেন। ব্যাপারটা এরকম-কৌরবের সব সংখ্যা থেকে শুরু করে কমলদার সমস্ত বই তখন থাকত শিবপুরে জনৈক সিদ্ধার্থ বসুর বাড়িতে। আমাদের কাছে উনি জনপ্রিয় চণ্ডী নামে। তাই, যাতে সময় নষ্ট না হয় আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম সিদ্ধার্থ বসুর বাড়ি থেকে রাতেই সব বই তুলে আমরা গাঙ্গুলিবাগানে আমাদের বাড়িতে আসব। কমলদার অনুপস্থিতিতে কোন পেটিতে কোন বই কটা আছে জানা আমার বা সিদ্ধার্থ বাবুর পক্ষেও সম্ভবপর ছিল না। খড়গপুর স্টেশনে কাঁধে ব্যাগ, উল্লাসে উজ্জ্বল কমলদাকে সেদিন অসম্ভব তৃপ্ত লাগছিল।

আহা! কী অল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন তখন কমল চক্রবর্তী। আনন্দবাজারের প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলা কমলদাকে বরাবর বেদনা দিয়েছে। সেই আনন্দবাজারের ক্রোড়পত্রে, তাও শঙ্করলাল ভট্টাচার্যর মতো বিদগ্ধ জনের এই উচ্চকিত প্রশংসা কমলদাকে যেরকম আনন্দ দিয়েছিল, তা ২০১১ সালে বঙ্কিম পুরস্কার পাবার সময়ও দেয়নি। কমলদা বসে পড়লেন আমার পাশের সিটে। বসেই একটা বড় লিমকার বোতল খুলে গাড়ির কাঁচ নামিয়ে বেশ কিছুটা তরল ফেলে দিলেন। আমাকে গাড়িটা রাস্তার ধারে দাঁড় করাতে হল। কমলদা একটা ভদকার বোতল খুলে পুরোটা লিমকার বোতলে মিশিয়ে নিলেন। এবার ফরমান- আমি যেটুকু দেব, শুধু সেটুকু খাবি। একবারে এক ঢোঁকের বেশি খাবিনা। ছোঁকছোঁক করবিনা একদম। ভুলে যাসনা যে তোকে এতটা পথ চালিয়ে যেতে হবে। বলেই নিজে একটা বড়ো ঢোঁক। কমলদার যখন মুড শীর্ষমুখী হত, তখন কিছু পেটেন্ট গান ছিল যা গাইতেন। "কয়লার মতো ময়লা ছোঁড়া মুজিয়ে গেল মন, সে যে মুশলমন ছিল... সে যে মুশলমন।" বেসুর নয় মোটেই, তবে সুরধারায় ভেসে যাবার মতনও নয়। কমলদার পেটে সুরা পড়লেই ক্রন্দন গ্রন্থি লিক করে যেত। ফলত, ঘন ঘন চশমার কাঁচ মোছা এবং আমার দিকে লিমকার বোতলটির আসার সম্ভাবনার ক্ষয়প্রাপ্তি। ড্রাইভারের পেটে কম পড়েছিল বলেই দুই ভাই সেদিন বেঁচে ফিরেছিলাম। শিবপুর হয়ে কয়েকশো ব্রাহ্মণ নবাব নিয়ে রাত ন'টায় গাঙ্গুলিবাগানের বাড়িতে। খাবার টেবিলে আমাদের রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার ও কলেজ স্ট্রিট অপারেশনের প্ল্যান শুনে মা বইটি রাতে পড়ার জন্য নিলেন।

সে রাতে আমরাও গপ্পো-আড্ডায় শেষ রাতে শুতে গিয়েছিলাম। পরের দিন বেলা করেই ঘুম ভাঙল আমার। কমলদা কিন্তু যত রাতেই ঘুমোতে যাননা কেন, ভোরে উঠে পড়তেন। বলতেন- ভোর বেলায় আমার টাটা বাবার বায়ো সাইরেন বেজে ওঠে। ছাদের রৌদ্রোজ্জ্বল ঘরে ইজিচেয়ারে অনুজ্জ্বল মুখে কমলদা। শুনলাম, আমার মায়ের কাছে সকালে ধুম বকুনি খেয়েছেন কমলদা। লাল মলাটের একটি ব্রাহ্মণ নবাব আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন- দ্যাখ কী দুরবস্থা। দেখি, বইটিতে অজস্র লাল কালির দাগ এবং বইটির শেষে ভাঁজ করা একটি দুই ফোল্ডের ফুলসক্যাপ কাগজে লাল কালিতে সংস্কৃতে পিএইচডি আমার মায়ের হাতের লেখায় একটা শুদ্ধিপত্র। বানান

ভুলের। শুদ্ধিকৃত বানানের সংখ্যা প্রায় দু'শো। কমলদাকে মা সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন যে- শুদ্ধিপত্র ছাড়া এই বই বাজারে ছাড়া যাবে না। বিশেষত, এত সুন্দর সমালোচনা প্রকাশিত হবার পর। সেদিনই কলেজ স্ট্রিটে ডিটিপি করিয়ে বন্ধু চন্দ্রশেখর দাশগুপ্তর সহায়তায় শুদ্ধিপত্র জুড়ে পঞ্চাশটি বই বিভিন্ন দোকানে।

হ্যাঁ, বিক্রি মন্দ হয়নি। কিন্তু, কমলদার লেখার একটা বিশেষ পাঠককুল আছে। সম্ভবত, তারাই। কিছু ফোন এসেছিল, ধারণা সেই সব ফোন থেকেই। কমলদা নিজে বানানের খুব একটা তোয়াক্কা করতেন না। কমলদার গদ্যের নিজস্বতায় সেইসব ত্রুটি চাপা পড়ে যেত। কিন্তু, মা ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ নবাবের গদ্য সম্পূর্ণ পৃথক, কমলদার অন্যান্য গদ্যপ্রবাহের চেয়ে। *"ইত্যাকার অভয়বাণী প্রদানান্তে বঙ্গীয় আঁধার আলোকিত করিয়া দেবী শীতলা শূন্যে মিলাইলেন। দেবী আলো রহিল। পূর্ববত্ অন্ধ তমিস্রা নাই। আকাশে চন্দ্রকিরণ। কিরণে বৃক্ষের ছায়া নড়াচড়া করে।"* কমলদার সব লেখাই প্রায় তুরীয় দশায় উৎপন্ন। এত গতিতে লিখতে কাউকে দেখিনি। লেখার পর পড়েও দেখতেন না, অধিকাংশ সময়। নিজেই বলতেন-সব ট্রান্স-এ লেখা। আমি কি আর ভেবেচিন্তে লিখি। দীর্ঘকাল আজকাল পত্রিকায় লেখার সুবাদে কমলদার একটা আন্দাজ ছিল- ক'পাতায় কটি শব্দে থামতে হবে। ব্যস, ওইটুকুই অঙ্ক। বাকিটা প্রবল গতিতে ঘসঘস। ব্যক্তি কমলদার চরিত্র সম্পর্কে পরিচিত নাগরিক সমাজ অস্পষ্ট ধারণার বশবর্তী। কমলদা নিজেও এমনটাই চাইতেন। বেড়াতে বেরোলে- কোথায় আছ? জানতে চাইলে, সচরাচর সত্যি বলতে শুনিনি।

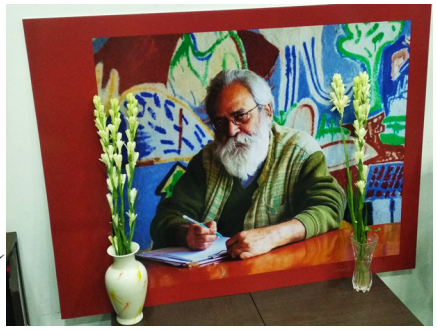
কলকাতায় কমল স্মরণ

জীবনের শেষ কয়েকটি বছর যদিও স্থানাঙ্ক নির্দিষ্ট হয়ে গেছিল। ভালোপাহাড়। সেলসম্যান কমল চক্রবর্তী সম্পর্কে অনেকের মধ্যেই এক সমীহ মিশ্রিত সন্দেহ ছিল। প্রথম জীবনে, কৌরবের বিজ্ঞাপন জোগাড় করা দিয়ে এই সেলসম্যানগিরির শুরু এবং ভালোপাহাড়ের অর্থসংগ্রহ করতে গিয়ে এই মেধার চূড়ান্ত বিকাশ। বলতে বলতে কেঁদে ফেলা, কাঁদতে কাঁদতে বলা এবং অন্য শ্রোতাদের এই অশ্রুপাতে শরিক করে ফেলা-কমলদার কাছে জলভাত ছিল। ম্যাজিক দেখতে গিয়ে মানুষ যেমন বোকা বনে আনন্দ পায়, কমলদার শ্রোতাদের অবস্থাও হত তথৈবচ। মনে আছে, ভদ্রেশ্বরে এক অনুষ্ঠানে কমলদা বক্তৃতা দিতে মঞ্চে উঠতেই ফিসফাস শোনা গেল- এইরে আবার কাঁদতে হবে। সত্যি সত্যিই দর্শকরা সেদিন কেঁদেছিল। মঞ্চকে মঞ্চজ্ঞান করতেন না কমল। কোনোদিন কোনও পরিবেশে মানুষটাকে নার্ভাস হতে দেখিনি। বক্তৃতায় আক্ষরিক অর্থে ওজস্বিতার প্রয়োগ করে সফল হতে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ ছাড়া কাউকে জীবদ্দশায় দেখিনি। ঝাড়খণ্ডের বাংলাভাষী সমাজ একবার কমলদাকে সংবর্ধনা দিয়েছিল। সংবর্ধনা দিতে উপস্থিত ছিলেন রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ এক সন্ন্যাসী। সৌম্য প্রবীণ সেই সন্ন্যাসী জানালেন যে তিনি কমল চক্রবর্তীর লেখার এক মুগ্ধ পাঠক। 'টাটা বাবা' কবিতাটির দুটি পংক্তিও তিনি আবৃত্তি করেছিলেন। এরপর, কমলদার হাতে মাইক গেল। কমলদা যখন বিনয় করে কথা বলতেন, তখন একটু চিবিয়ে চিবিয়ে সুললিত করতেন নিজস্ব প্রকাশ। বোধহয়, একটু ভেবেও বলতেন যা তাঁর নিজস্বতা ছিলনা আদপেই। এই ব্রেক মেরে মহারাজকে ধন্যবাদ দেবার পর্ব শেষ করেই স্বমূর্তি ধরলেন কমলদা। একটু ভাঙা ভাঙা অথচ সুরে চড়া গলায় সিংভূমের মেলার গান। সামিয়ানার তলায় ভিড় জমে গেল। ধবধবে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরা সাদা দাড়ি চুলের সন্তসদৃশ কমলদার মুখে এরকম প্রচলিত চটুল গান শুনে চাইবাসার নব প্রজন্ম বিস্ময়ে হতবাক। কেন যে সেদিন পুরো প্রোগ্রামটা রেকর্ড করিনি! এরকম ছিল শুরুটা, স্মৃতি থেকে- *আজও মনে হয় রোরো নদীর ধারে লেম্বো আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। কী যে ছলাৎ ছিল লেম্বোর! সেদিনের রোরো নদীর মতোই। সকালে, দুপুর, বিকেল, রাতে একেক রকম রঙ। মাঝে মাঝে কাছ থেকেও চিনতে পারতুম না। ভেবেছিলুম, প্রেমে আপ্রাণ হয়ে লেম্বোকে নিয়ে লাপাংগুটুর লুকোনো ঝরনার ধারে এই জীবনটা। কত ছেলেপুলে। গায়েপিঠে। তাদের বাংলা শেখাব। আর আমি ততদিনে অনেক সাঁওতালি গান শিখে নেব। লেম্বোর গলায় সাঁওতালি গান শুনলে আর অন্য কোনও গান শুনতে মন চায়না। সেই সাধ পূরণ করতে এই বুড়ো বয়সে ভালোপাহাড়ে সাঁওতালি শিশুদের জন্য ইস্কুল খুলে বসেছি। আমার কিন্তু ইচ্ছে ছিল-* এই চাইবাসাতেই...। বক্তৃতা চলেছিল প্রায় দেড় ঘণ্টা। বক্তৃতা শেষ হবার পর, বহু মানুষ ঘিরে ধরেছিল কমলদাকে। মহারাজও বাঙালি সমাজের মাথাদের বলেছিলেন- কমলদাকে চাইবাসায় একটা জমির ব্যবস্থা করে দিতে। কমলদার বাকজাদুতে মুগ্ধ হয়ে বহু মানুষ অনেক অনেক দান করেছেন ভালোপাহাড়ে। এই দানের মাপ একেক সময় এত বেখাপ্পা রকমের অতিরিক্ত হয়ে যেত যে তা বেশ দৃষ্টিকটু হয়ে পড়ত। কিন্তু, কমলদার জীবনে এই দান প্রাপ্তি বেশ এক শ্লাঘার ব্যাপার এবং শেষে অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়ে গেছিল।

কমলদার কথা বলার কয়েকটি বিশেষ আঙ্গিক ছিল। বিনয়ের সময়- চিবিয়ে চিবিয়ে একটু ন্যাকা ন্যাকা শ্লথ, ফচকেমি করার সময়- উচ্চকিত পূর্ববঙ্গীয়, আবহ মেদুর করতে- মিঠে গলায় উত্তর কলকাতা, সংরাগে সম্মোহিত করতে- স্বাভাবিক চিন্ময়। এই শেষোক্ত স্টাইলটি কমলদার স্বাভাবিক ও শ্রোতাসংপৃক্ত। কমলদাকে ছোঁয়া ছিল খুব সহজ। এই সহজিয়া ভাবের জন্য কোনও ভান করতে হত না। বরং, কখনোসখনো জনগণের উপরোধে একটু সেলিব্রিটিদের মতো আচরণ করতে গেলেই তাঁকে অসম্ভব আড়ষ্ট ও মেকি লাগত।

সেবার, আমরা দুইজন বাংলাদেশ যাচ্ছি। সঙ্গে আর কেউ ছিল না। দীর্ঘ ভ্রমণসূচি। একটা ব্যাপারে আমাদের দু'জনের এক বিরাট

মিল ছিল। প্ল্যান প্রোগ্রাম করে কোথাও যেতে খারাপ লাগত। তো, সেবার যাত্রার দিন ঠিক। ভিসাও হয়ে গেছে। আমাদের দু'জনের কাছেই আমন্ত্রণ পত্র ছিল। কিন্তু, থাকার ব্যবস্থা বা কবে কোনদিন কোথায় কিছুই জানা ছিল না আর আমরা দু'জন এ বিষয়ে কোনও আলোচনাও করিনি। কমলদা সরাসরি জামসেদপুর থেকে বিমানবন্দরে, দেরিতে পৌঁছেছিলেন। ফ্লাইটেও এটা সেটা আলোচনায় ঢাকায় থাকার ব্যাপারে কোনও কথা হল না। কারেন্সি পরিবর্তন করে এবার শহরে বের হবার পালা। কমলদা প্রশ্ন করলেন- কোন হোটেল বুক করেছিস? আমি ভ্যাবাচ্যাকা। কমলদাকে অপ্রতিভ হতে কোনও পরিস্থিতিতেই দেখিনি। সেদিনও না। কমলদার মানিব্যাগের মধ্যেই একটা পাতলা শতচ্ছিন্ন টেলিফোন ইনডেক্স থাকত। বিমানবন্দরের বাইরে এসে এসটিডি বুথ থেকে একটা ফোন করলেন কমলদা। আর তারপর ফোন বুথের একটা কাগজ ছিঁড়ে একটা নম্বর লিখলেন। জানলাম, কবি বেলাল চৌধুরির সঙ্গে কথা হল। উনি অসুস্থ। তবে একজন আসছে বিমানবন্দরে। তারই নম্বর লিখলেন কমলদা। আধঘণ্টা চা খেয়ে গল্পো করে সেই বুথ থেকে আর একটা ফোন করতে না করতেই একজন যুবক এসে টিপ করে কমলদাকে প্রণাম করে বলল- চলুন কমলদা। কমলদার জনপ্রিয়তা বাংলাদেশে দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। অথচ, মানুষটার সেই প্রথম বাংলাদেশ ভ্রমণ। আমরা প্রথমে কবি সন্তোষ ঢালির বাড়িতে ও পরে জনাব জাকির হোসেন নামক এক জনদরদী মানুষের আতিথেয়তায় ছিলাম বাংলাদেশে। ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল, বগুড়া হয়ে লালমনির হাট। সঙ্গে কবি জাহাঙ্গীর ফিরোজ, মাহমুদ কামাল। প্রখ্যাত সাংবাদিক আয়ুব হোসেন।

ভালো পাহাড়ের মরাল বাহিনী

আহা, কী অপরূপ স্মৃতি। প্রত্যেকটি জেলা সদরের অতিথিশালায় কমলদার জন্য অপেক্ষা করতেন গুণমুগ্ধ নবপ্রজন্ম। কমলদার জনপ্রিয়তা সেই সময় পশ্চিমবঙ্গেও এতটা দেখিনি। পরে অবশ্য কমলদা হয়ে উঠেছিলেন এক ফেনোমেনন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি নবপ্রজন্মের পাঠকের কাছেও। কমলদা নিজেও বিস্মিত হয়েছিলেন বাংলাদেশে তাঁর এই বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে। রাতে আড্ডার সময় অনেক আলোচনা করেও এই জনপ্রিয়তার উৎস আবিষ্কার করে উঠতে পারিনি। কমলদা বলেছিলেন, একমাত্র কারণ হতে পারে- কলকাতা বইমেলা ও এই মেলায় কমলদার রঙিন উপস্থিতি। বাংলা বাজারের গলিয়াথরা কমলদার জীবনে ও বইমেলায় কমলদার পাগলামিতে ওতপ্রোত ছিলেন। এই তালিকায় ছিলেন- সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, মতি নন্দী, পূর্ণেন্দু পত্রী, গৌরকিশোর ঘোষ, তারাপদ রায়, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎ মুখোপাধ্যায়, উৎপল কুমার বসুর মতো উজ্জ্বল তারকারা। এই তারকাদের সবার সঙ্গেই পরম আত্মীয়তা ছিল কমলদার। এইসব তারকাদের ভিড়েও কমলদাকে উজ্জ্বল হয়ে থাকতে দেখেছি। অথচ, সেইসময়ে জনপ্রিয়তার মানদণ্ড দেশ পত্রিকা বা আনন্দবাজারে কমল চক্রবর্তী লিখতেন না বা লেখার সুযোগ পাননি।

২০০৯ সালের আগস্ট মাসে 'প্রকৃতি ভালোপাহাড়'- নামে একটি পত্রিকা চালু করেন কমলদা। দায়িত্ব বর্তায় আমার ওপর। এটা কমলদার বহুদিনের স্বপ্ন ছিল। চার কালারে ছাপা হতে হবে। পরিবেশের ওপর একটা ব্যতিক্রমী পত্রিকা। প্রথম সংখ্যার উদ্বোধন হয় জামসেদপুরে বারীনদার সোনারির বাসভবনে। বারীনদা ছিলেন কমলদার জীবনে সবচেয়ে বড়ো স্তম্ভ। এই উদ্বোধনে, শেষবারের মতো শঙ্কর লাহিড়ীদা ব্যতীত কৌরবের প্রায় সব কুশীলব একত্র হয়েছিলেন। জামসেদপুরের বহু গুণীজনের সমাবেশে অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল। এই সংখ্যা কীভাবে প্রকাশিত হবে, কে কে লিখবেন- তার একটা আবছা ধারণা দেওয়া ও আমাকে চার্জআপ করা ছাড়া কমলদা যে আর কিছুই করে উঠতে পারবেন না, এটা আমাকে বারীনদা ডেকে বলেছিলেন। বারীনদা আরও বলেছিলেন যে- দ্যাখ বাবাই, কমলের সম্পাদনা করার স্কিলটা শিখে নিবি। কমল এখন অনেক বড়ো টার্গেট নিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ, ভালোপাহাড়। ওর থেকে বেশি সময় পাবিনা। এটা তোকেই চালাতে হবে। তাই, চালিয়ে এসেছি।

এখনও চলছে সেই পত্রিকা। কমলদা শুরু করেন, ধারাবাহিক 'প্রিয় ফরেস্টার'। 'প্রকৃতি ভালোপাহাড়' পত্রিকায় লেখা জোগাড় করতে গিয়েই লেখক সমরেশ মজুমদারের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। পরে, সমরেশদা জানান যে- সম্পাদকের নাম কমল চক্রবর্তী দেখেই উনি উৎসাহিত হয়েছিলেন। যৌবনে, কমলদার সঙ্গে সমরেশদার একবার আলাপ হয়েছিল সাহিত্যসভায়। এরপর, যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। দেখেছিলাম, এক প্রথিতযশা সাহিত্যিকের কমল চক্রবর্তীর প্রতি আগ্রহ। সমরেশদা এরপর হয়ে ওঠেন আমাদের দু'জনেরই অত্যন্ত অন্তরঙ্গ মানুষ। আহা। কত স্মৃতি। সমরেশদা লিখেছিলেন- কমলের গদ্য অসাধারণ। আমাদের সমসাময়িক যে কোনও লেখকের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী। একটা গোটা উপন্যাসও লিখে ফেলেন কমলদার জীবনকে কেন্দ্র করে।

কৌরব ব্যতীত, কমলদা মূলত লিখতেন আজকাল পত্রিকায়। আজকাল পত্রিকা অফিসে কমলদার সঙ্গে কয়েকবার গেছি। সেই সূত্রেই অলোকপ্রসাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় আমার। আজকাল দপ্তরে দেখেছি কমলদার জনপ্রিয়তা। এর পর, এই সময় ও প্রতিদিন কাগজে কমলদা লিখেছেন। কিন্তু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন গলিয়াথরা প্রায় সবাই তখন বিগত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন কমলদাকে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং তদ্বির করেছিলেন, কমল চক্রবর্তীর 'আমার পাপ' উপন্যাস যেন আনন্দ পাবলিশার্স ছাপে। কিন্তু তা হয়নি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কমল

চক্রবর্তীর সখ্য ছিল হোমারিয় পর্যায়ের। অ্যাকিলিস যেমন চেয়েছিলেন পেট্রোক্লাসের দেহের ছাই যেন তাঁর দেহের ছাইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তেমনি কমলদাকেও বলতে শুনেছি শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় কমল চক্রবর্তীকে নিয়ে কয়েকটি পদ্য লিখেছিলেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জবানিতে- কমল মানে জামসেদপুরের পাগল কমল চক্রবর্তী। কৌরব কাগজটা সুন্দরভাবে রক্তপাত শেষে চালিয়ে যাচ্ছে। গদ্যটা লেখে ভালো। ভালো মানে বেশ ভালো। যেমন এলোমেলো, তেমনি গভীর। প্রগাঢ় পদ্য। জীবন যাপনের মধ্যে সাহিত্য ছাড়া, বাকিটুকু উড়নচণ্ডীপনায় ভর্তি। বেশ লাগে ওকে। যেমন এলেই নানাদিকে রহস্যময় পথ খুলে যায়। জল জঙ্গলের ছায়া ওর চোখে মুখে।

১৯৭৮-এ পূরবী দেবীর মৃত্যুর পর কমলদা, বারীনদা সহ কৌরব গোষ্ঠী নিজেদের কবিতা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৯৫-এ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুও কমলদার জীবনে ছিল এক দুঃসহ বেদনা। শিবাজী রায় নামের জনৈক এক কাব্যোৎসাহী মানুষের উৎসাহে আয়োজিত এক আড্ডায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বলতে শুনেছি- কমল, কবিতা লেখা ছেড়ে দিলে। ওটাই ছিল তোমার প্রধান শক্তি। বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে কমলদা উত্তর দিয়েছিলেন- শক্তিদা ছিলেন আমার পদ্যের শক্তি। স্যামসনের চুল। শক্তিদাই আমার পদ্যর শুরু ও শেষ। অন্তিম ও চূড়ান্ত পাঠক। শক্তিদা গেলেন, আমার পদ্যও গেল। আপনি তো আর আমার পদ্য পড়েন না! সুনীল ছিলেন কমলদার সম্বোধনে- আপনি। কিন্তু, শক্তি- তুমি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কমলদার গদ্যরও গুণমুগ্ধ ছিলেন। লিখেছিলেন- সমকালীন সকল লেখকদের মধ্যে কমল একমাত্র লেখক যে তার লেখার ধরন ক্রমাগত ভাঙছে, পরিবর্তন করছে বাক্যবিন্যাসরীতি। কীভাবে এটা সম্ভব হয়?

সত্যি ভাবলে আশ্চর্য লাগে, কীভাবে এটা সম্ভব হয়? এটাই কমল ফেনোমেনন। প্রতিনিয়ত এক্সপেরিমেন্ট করতেন এই লেখক। তিনি সত্যই গদ্য ও পদ্যের মধ্যকার যে অলিখিত নিয়ন্ত্রণ রেখা, তা ভেঙে তছনছ করে দিয়েছেন বারবার। আমার মতে তাঁর স্বীকৃত দীর্ঘতম কবিতা 'মদের দোকানের ছেলেটি'র চেয়েও দীর্ঘতর কবিতাটি উপন্যাস বেশে প্রকাশিত। নাম- 'মারাদোনা'। লেখকের মতে, শিল্প শিল্পই। কেউ কি দেখতে এসেছিল, দা ভিঞ্চি কোকেন খেয়ে মোনালিসা! যদি তাই বা হত, ক্ষতি কী! আর একটা মোনালিসা হোক দেখি!

কমল চক্রবর্তীর মতো রঙিন মানুষের অসংখ্য প্রেমিক-প্রেমিকা থাকবে, এমনটা বিস্ময়ের নয়। কিন্তু, জীবনে ও নির্মাণে কমল অনেকটাই ব্যর্থ প্রেমিকাদের বিষয়ে। মাতৃরূপ ব্যতীত- কী গল্পে, কী জীবনে, কী উপন্যাসে নারীরা কমলের জীবনে নিষ্ঠুর। আপ্রাণ হওয়া সত্ত্বেও কমলকে তছনছ করে দিয়েছে তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্ররা। অসহায় হয়ে দেখতে হয়েছে লেখকের চশমা দু'টুকরো। ছিন্নভিন্ন হয়ে ভালোপাহাড়ের বাতাসে উড়ছে বাংলা সাহিত্যের মারাদোনার স্বপ্নিল নীল পাণ্ডুলিপি। *'জানলার কাঁচে শুকনো জিং জিং ফুলের পাপড়ি। একেকটা উধাও। একেকটা বেদনা-বকুল গাছ, আর কোনোদিন ফুল ফুটবেনা ভাবনায়-শেষবারের মত হাজার হাজার ফুল ঝরিয়ে, শূন্য। মারাদোনা কফিনের ডালা তুলে, ক্রমে ডুবে যাচ্ছে। সে, নিথরে যাচ্ছে, নিশীথে যাচ্ছে, নিশ্ছিদ্র হাহাকারে। কফিনের ডালা, হ্যাঁ-ক্লাউদিয়া-ক্লা-উ-দি... ক্লাউদিয়া, একটা স্বপ্নের ফুটবল শূন্যে ভাসিয়েছি। দুঃখী মানুষের মধ্যে এক আনন্দের আর্জেন্টিনা। তোমার কখনো মনে হয়নি; একটা একরোখা মানুষ, লড়তে লড়তে লক্ষ লক্ষ মানুষকে উত্তাল করেছে; বিহ্বল করেছে... চতুর্দিক, নীরব, চূর্ণ আন্ডিজ। ডাকে বুজুর পাখির ঝাঁক, বাতাস-খাওয়া-মার্টে, দূর দিগন্তের পালক হাওয়ায় উড়িয়ে। ওর চোখ থেকে অনবরত, হেরো মানুষের অসহায়-সমীক্ষা।'*

(সৌজন্য: অবসর, জামশেদপুর)

বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার

(২০১৫-তে কথোপকথনের মাধ্যমে নিয়েছিলেন নাট্যকর্মী ও সংগঠক পূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরণি সেন। তাঁর স্মরণে পুনর্মুদ্রিত)

প্রশ্ন: আপনার নাট্য জগতে কীভাবে আসা। কীভাবে ত্রিতীর্থ এবং প্রযোজনাগুলি গড়ে উঠল?

হরিমাধব বাবু: জন্ম: বালুরঘাট, ১৯৪১ সাল। স্কুল বালুরঘাট হাইস্কুল। কলেজ-কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ক্লাস সিক্সে পড়াকালীন বড়দের সঙ্গে শিশু চরিত্রে অভিনয়। নাটক সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। ক্লাস এইটে পড়ার সময় নাটকের দল তৈরি, নাম 'তরুণ তীর্থ'। এ সময়কার ছোটদের নাটক যেমন 'সিরাজের স্বপ্ন', 'বন্দীবীর', 'কার দোষ' ইত্যাদি নাটক, মাঠে চৌকি, বাঁশ, দিদি মায়েদের শাড়ি দিয়ে মঞ্চ নির্মাণ এবং অভিনয়। ছাপান্ন সালে বন্ধু নির্মলেন্দুকে দিয়ে নাটক লেখানো এবং তাঁর নাটক 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' অভিনয় এবং আরও পরে ওরই লেখা 'পাপ ও পাপী', 'আক্কেল সেলামী' ইত্যাদি অভিনয়। তখন একমাত্র বালুরঘাট নাট্যমন্দির এবং পরে প্রাচ্যভারতী মঞ্চে মাঝে মধ্যে অভিনীত হত সব ধরনের নাটক। যেমন 'মেঘ মুক্তি', 'টিপু সুলতান', 'কেদার রায়', 'তটিনীর বিচার', 'খনা', 'মাটির ঘর'ইত্যাদি।

পড়াশোনার জন্য কলকাতায় গমন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৮ পড়াশোনা এবং নানা চাকরি- প্রফেশনাল এবং গ্রুপ থিয়েটারের নিয়মিত দর্শক। বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষ, মমতা চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, নিলীমা দাস, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমু ভৌমিক, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবা রায় চৌধুরী, সজল রায় চৌধুরী, কালী ব্যানার্জী গ্রুপ থিয়েটারে এদের সবার অভিনয় দেখেছি। তেমনি প্রফেশনাল বোর্ডে ছবি বিশ্বাস, নরেশ মিত্র,

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তম কুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, অনুভা গুপ্তা, বসন্ত চৌধুরী, তরুণ কুমার, কালী ব্যানার্জী, তরুণ রায়, তপতী গুহ, সুপ্রিয়া চৌধুরী, বিকাশ রায়, রবীন মজুমদার- প্রায় সব সুবিখ্যাতদের অভিনয় দেখেছি। এসব অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু শিখেছি এবং মাঝে মাঝে বালুরঘাটে ফিরে নিজের দল 'তরুণ তীর্থে' সে সব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছি। বলা যেতে পারে, কলকাতায় থাকাকালীন এত নাটক এবং ছবি দেখেছি যা অন্যের কাছে বিস্ময় হতে পারে। ওই সময়টা আপনি মানবেন ১৯৫৬ থেকে ৬৭/৬৮; বলা যেতে পারে, 'Heydays of Bengali Culture'। সমস্ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কি নাটক, কি গান, কি নাচ, যুব উৎসব -এ সব হিরণ্য অভিজ্ঞতা, আমি নিজেকে ক্রমাগত শিক্ষিত করে তুলেছিলাম। নাটকের প্রয়োগ রীতি সম্পর্কে পড়াশোনা করছিলাম- বাংলা ও ইংরেজি নাটক পড়ছিলাম, এক কথায় অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে এগোচ্ছিলাম। ঠিক এ রকম একটা অবস্থায়, যখন অনেক স্বপ্ন দেখছি তখন হঠাৎই এক পারিবারিক বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে আমাকে জন্মভূমিতে ফিরতে হল। যাকে বলে ঘরে ফেরা। ১৯৬৮-র কিছু সময় নিজের পুরোনো দল তরুণ তীর্থ নিয়ে কাজ করেছি। অনুরোধের ঢেকি গিলে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের হয়ে কয়েকটি নাটক পরিচালনা ও অভিনয় করেছি কিন্তু যা চাইছিলাম বা যা চাই তেমনটা হচ্ছিল না। ঠিক এরকম একটা তীব্র দূরপনেয় আকাঙ্খা থেকে ত্রিতীর্থের জন্ম ১৯৬৯-এ। আঠাশ থেকে ত্রিশজন থিয়েটার প্রেমীদের নিয়ে ত্রিতীর্থের কাজ শুরু হয় মুক্তাঙ্গনে, এখন যেখানে ত্রিতীর্থের মঞ্চ সেখানে। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৬ মুক্তমঞ্চেই কাজ হয়েছে। প্রথম নাটক শুরু হয় 'পুতুল খেলা' দিয়ে। তারপর 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র', 'শের 'আফগান', 'ছুটির খেলা', এসব চলতে থাকে। দু'শ দর্শকের আসন ছিল, টিকিট দু'টাকা, এক টাকা। ১৯৭০-এ আমার একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও All India Bengali Drama Competition এ লক্ষ্ণৌতে যাই এবং আমাদের প্রযোজনা 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' সমস্ত বিভাগে সেরার পুরস্কার পায়। সে সময় আনন্দবাজার পত্রিকায় এ বিষয়ে লেখা হয়েছিল। ১৯৭১-এ প্রয়াত নীহার ভট্টাচার্য যিনি তখন ম্যাক্সমুলার ভবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁর প্রস্তাব এবং উদ্যোগে জার্মান নাটক ফেস্টিভ্যাল-এ অংশগ্রহণ করবার জন্য আমরা দুটি জার্মান নাটক তৈরি করি। একটি ক্লাইস্টের নাটক 'দ্য ব্রোকেন জারা' এবং আর একটি ড্যুরাণমাটের 'দি ফিজিসিস্ট'। নাটক দুটি অনুবাদ করার পর প্রথমটির নাম হয় 'ভাঙ্গা পট', এটি লেখা হয়েছিল স্থানীয় রাজবংশী ভাষায়। দ্বিতীয়টির নাম হল 'তিন বিজ্ঞানী'। নাটক দুটি কলকাতার কলামন্দির মঞ্চে জার্মান নাটক ফেস্টিভ্যালে অভিনীত হয়। উল্লেখযোগ্য এই যে ওই উৎসবে নান্দীকার, থিয়েটার ইউনিট, অনামিকা এরাও অংশগ্রহণ করে। উল্লেখযোগ্য আরও যে ওই নাটক দুটি কলকাতায় উচ্চ প্রশংসিত হয়। প্রায় সমস্ত পত্রপত্রিকার ব্যাপক সুনাম অর্জন করে। এই নাটক দুটি ত্রিতীর্থের Turning Point বা Milestone যা আমাদের ব্যাপক স্বীকৃতি দেয়। ফলে যথেষ্ট উদ্দীপ্ত হয়ে ত্রিতীর্থ পর পর তার বিখ্যাত প্রযোজনাগুলো করে। 'দেবী গর্জন', 'জল', 'গ্যালিলিও', 'দেবাংশী', 'বিছন' (হিন্দী), 'অনিকেত পণন' 'মাতৃতান্ত্রিক', 'অসমাপিকা', হাল আমলের 'পীরনামা', 'অর্ধচন্দ্র', 'বীজমন্ত্র', 'অগ্নিশুদ্ধি', 'ভগীরথের মূর্তি' প্রভৃতি। ত্রিতীর্থই সর্বপ্রথম ১৯৭৮-এ 'গ্যালিলিও' মঞ্চস্থ করে ম্যাকসমূলার ভবনের সহযোগিতায়। ১৯৭০ থেকেই আমরা ঠিক করে নিয়েছিলাম নিজেদের নাটক করব এবং পরবর্তীকালে এখনও পর্যন্ত এমনটাই চলছে। কলকাতার কোন অনুকরণ নয়, কলকাতার কোন নাটক নয়, আমাদের নিজস্ব নাটক। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বা অঞ্চলে যে লোকভাষায় মানুষ কথা বলে, আমরাই বোধহয় একমাত্র দল যাঁরা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, বগুড়া বা রাজবংশী-এত বিভিন্ন লোক ভাষায় নাটক করেছি। এবং এই সব অঞ্চলের মানুষের যে লোকসংস্কৃতি তা আমাদের প্রযোজনায় প্রদর্শিত হয়েছে।

হরিমাধব মুখোপাধ্যায়

উল্লেখযোগ্য পুরস্কার প্রাপ্তি:

১৯৯৮ এ কাঞ্চনজঙ্ঘা পুরস্কার, (উত্তরবঙ্গ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন); ২০০৮-এ সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার (ভারত সরকার); ২০০৯-এ রবীন্দ্রভারতী স্টেট অ্যাকাডেমি পুরস্কার; ২০১১-এ দীনবন্ধু পুরস্কার (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)
২০১২-এ বঙ্গভূষণ পুরস্কার (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

এছাড়া অসংখ্য দলের সম্মাননা তো আছেই।

প্রশ্ন: নাট্যতীর্থের মন্মথ মঞ্চ উদ্বোধনে আপনার প্রদত্ত ভাষণ দিয়ে শুরু করি। আপনি বলেছিলেন যে নাটক দেখার লোক কমে যাচ্ছে। কেন?

উত্তর: হ্যাঁ ঠিক, নাটক দেখার লোক কমে যাচ্ছে। শুধু মফস্বলে নয়। সর্বত্র। কারণ না বোঝার কিছু নেই। প্রথমত ঘরে ঘরে বোকা বাক্স (TV)। হাজার চ্যানেল হাজার মজা মানুষকে গৃহবন্দি করেছে। নাটক দেখার জন্য যে পরিশ্রম, অর্থাৎ গতর নড়ানো এবং অর্থব্যয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি কমিউনিটি এটিকেটের বাতাবরণ, যা নাটকের দর্শক হিসেবে অবশ্য মান্য এসব বাধ্যবাধকতা বোধহয় খানিকটা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। হতে পারে যে দর্শক যে রকম সোপ অপেরা গোছের প্রদর্শনী দেখতে চায় নাটক তা দেখায় না। বিশেষত গ্রুপ থিয়েটারের সাথে যাঁরা যুক্ত, সেই বাম বা ডানপন্থী যাই হোক না কেন একটি নির্দিষ্ট আদর্শকে সামনে রেখে তাঁরা নাটক করে, এবং এটি করতে গিয়ে হয়তো যথেষ্ট পুরোনো প্রায় বস্তাপচা পদ্ধতি, আবার একই রকম নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা মঞ্চে প্রদর্শিত হয়। যার মধ্যে একটি বিশেষ চিন্তন প্রক্রিয়া, একটি মানসিক জটিলতা নিষ্পত্তির সম্ভাবনা

থেকে যায়। সাধারণ দর্শকরা হয়তো এই জটিল সময়ে নতুন জটিলতায় খুশি হন না। এবং এটি ঠিক যে প্রযুক্তি দুনিয়া যে সব অভিনব সুযোগ সৃষ্টি করেছে আমরা নাটকের মানুষরা তার যথাযথ ব্যবহার জানি না। অথবা জানলেও আর্থিক দীনতার জন্য সেসব ব্যবহার করতে পারি না। পরিশীলিত, সুরুচি সম্পন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন— যারা নাটক করেন এবং দেখেন উভয়ক্ষেত্রেই এর মেল বন্ধন হচ্ছে না। ফলে প্রায় শূন্য প্রেক্ষাগৃহে নাটক চলছে এবং চলবেও। শ্রীরঙ্গমে শিশির বাবুর শেষের দিকে বিখ্যাত অভিনেত্রী প্রভাদেবী প্রথম ঘণ্টা পড়ার পরে ফুটো দিয়ে দর্শক আসন দেখে হতাশ হয়ে শিশিরবাবুকে বলেছিলেন- বড়বাবু, মাত্র ছ জন লোক বসে আছে, আর তো সব চেয়ার, কার জন্য নাটক করবেন? শিশিরবাবু জবাব দিয়েছিলেন, 'তোমার কাজ অভিনয় করা, দর্শকের দায়িত্ব অভিনয় দেখার।' আমিও সেরকমই ভাবি। এর পরিত্রাণ কী, কেমন করে দর্শক বাড়বে, তার জন্য মিডিয়া, টিভি, কাগজ, বিজ্ঞাপন- এসব আমার অধরা। কলকাতায় হলে ভিড় করা দর্শক বাড়ছে বোদ্ধা দর্শক নেই। Housefull হচ্ছে Film Star দের দেখার জন্য। নাটক দেখার জন্য নয়। আমি মনে করি এই কায়দায় নাটক বাঁচবে না—বাঁচাতেও পারবো না।

পীরনামা নাটকে

প্রশ্ন: নবীন প্রজন্মের নাট্যকার সুমন মুখোপাধ্যায়, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়রা নাটকের প্রসারের কথা বলছেন। যদিও বিভাস চক্রবর্তী ও কৌশিক সেনদের ভিন্ন মত। কিন্তু এটা নয় কি যে 'কিং লীয়ার', 'দেবী সর্পমস্তা'-র টিকিট দ্রুত নি:শেষিত হচ্ছে। কাগজে এত বিজ্ঞাপন, নান্দীকার সহ প্রায় সব দলের নাট্যোৎসব ও মেলায় নামী দামী স্পনসর- তারপরও কেন বলছেন?

উত্তর: সুমন বা দেবেশ কি বলেছে আমি জানি না, তবে তাঁদের ঝোঁক যে কর্পোরেট থিয়েটারের দিকে সেটা বুঝতে পারি। নাটককে বাঁচাতে হলে নাটকের শিল্পীদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে হবে অর্থাৎ নাটক যদি একটা চাকুরি হয় বা জীবিকা হিসেবে নেবার কথা ভাবা হয় তাহলে কর্পোরেট থিয়েটার ছাড়া কে এটা করবে? প্রচুর খরচ করে গ্ল্যামার যোগ করে কিং লীয়ার হয়েছে। মিনার্ভায় যখন হয়েছে তখন সাধারণ দর্শকদের সাধ্যের মধ্যে টিকিটের দাম ছিল। কিন্তু মিনার্ভায় যখন লীয়ার বন্ধ হয়ে গেল তখন একটা আধা কর্পোরেট স্টাইলে লীয়ার হতে থাকল। কিন্তু টিকিটের দাম মধ্যবিত্তর সাধ্যের বাইরে। কারণ গ্ল্যামার ও স্টার পোষার খরচ কে দেবে? এতদিন সরকার ভর্তুকি দিচ্ছিল, কিন্তু এখন? এখন আধা কর্পোরেট কোন ফিনান্সার জোগাড় করতে হবে। এবং তিনি তো, আর নিজের পয়সা খরচা করবেন না, সুতরাং নিজের পকেট বাঁচিয়ে, সেই ফিনান্সার কে বা কারা আমি জানিনা। লীয়ার কয়েকটি শো হল। 'দেবী সর্পমস্তা' যতদিন মিনার্ভায় হয়েছে তখন মানুষ দেখেছে, মিনার্ভা থেকে উঠে যাবার পর বোধ হয় একটাই শো হয়েছিল, তাতে টিকিটের দাম বেশি ছিল। নান্দীকার-এর নাট্যোৎসব কয়েকবার দেখার সুযোগ হয়েছে। প্রথম দিকে এবং মাঝেও অসামান্য কিছু নাটক দেখেছি আবার এত পাতি নাটক দেখেছি যে বসে থাকা যায় না। তবু রুদ্রবাবু উৎসব করছেন। আজকাল তো বিদেশ থেকেও দল আসে। কিন্তু নাটক শেষে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দিত করার লোকও উপস্থিত থাকে না। বিভাস ও কৌশিক কি বলেছে আমার স্মরণে নেই তবে তারা যদি এই কর্পোরেট থিয়েটারের বিপরীত কিছু বলে থাকেন তাহলে ব্যক্তিগত ভাবে আমি তাদের সাথে সহমত পোষণ করি। কারণ যে মধ্যবিত্ত মানুষরা থিয়েটার দেখেন, থিয়েটারকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, সহানুভূতি দেখিয়েছেন, তারা যদি থিয়েটার দেখতে না পারে, কর্পোরেট অত্যাচারে অতি উচ্চমূল্যে টিকিট ক্রয় করে, তা তাদের প্রতি ঘোরতর অন্যায় হবে। আমরা তো চাই, তারাই অর্থাৎ মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে থিয়েটার বেশি করে পৌঁছক। আজকে যারা কর্পোরেট থিয়েটারের পক্ষে সওয়াল করছেন তাঁরা এই মধ্যবিত্ত দর্শকদের সমর্থন পেয়েই আজ এই স্থানে পৌঁছেছেন। Performing Art must be within our capacity to Pay, তা না হলে থিয়েটার নিয়ে যত এক্সপেরিমেন্টই হোক তা সফল হবে না।

প্রশ্ন: বলেছিলেন বহুজাতিক কর্পোরেট পুঁজি পারফর্মিং আর্টকে ধ্বংস করছে কীভাবে, পরিত্রাণই বা কি?

উত্তর: দেখুন একজন মানুষ যিনি মনে মনে শিল্পী তিনি নিজেকে তৈরি করেন নানা ভাবে। শিক্ষা দীক্ষা তো আছেই তার সঙ্গে তাঁর এথনিক, অ্যানথ্রোপলজিক্যাল যে ভিত্তি এবং পারিপার্শ্ব- যাঁরা ইতিমধ্যে নাটকে প্রতিষ্ঠিত, তাদের কাজকর্ম দেখে ছাঁটাই বাছাই করে আস্তে আস্তে শিল্পী হয়ে ওঠেন। এবং এটি হয় Own Capital, এই Own Capital যদি ঠিক হয়, তাহলে সে Sellable হয়ে ওঠে। এই Owned বা Aquired Capital তাঁর নিজস্ব ধন। যে মুহূর্তে সে Sellable হয়ে উঠছে ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করছে, তখন তাঁর দিকে নজর পড়ে Media, Critic অন্যান্য মানুষদের, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের কারণ Progressive Politics needs progessive culture; রাজনীতির লোকেরা তখন তাঁকে তোল্লা দিতে দিতে নিজের লোক করে নেয়। মাফ্ করবেন উৎপল দত্ত কি কম্যুনিস্টদের Political Capital ছিলেন না? অবশ্যই ছিলেন Politics-এ। ব্যবহৃত হতে হতে যখন জনপ্রিয়তা তুঙ্গে পৌঁছুল, তখন Corporate Capital তাঁকে কব্জা করতে চেষ্টা করে। Corporate Capital যখন তাঁকে ব্যবহার করবে তখন Corporate Style এই করবে। ফলে টিকিটের দাম পাঁচশো বা হাজার হবে এবং একটা আর্টিফিসিয়াল ডিমান্ড তৈরি করবে। ফলে দর্শকদের মধ্যে

একটা প্রত্যাশা তৈরি হবে এবং শিল্পীদেরও রোজগার বাড়বে। একটা সময় Corporate খোলস ছেড়ে আরও বৃহৎ অর্থে Global Capital হয়ে উঠবে। And he will loose his own character, তাঁর Own Capital অন্যে নিয়ন্ত্রণ করবে। He will be puppet in their hands। তাঁর সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হবে। তিনি নাম, যশ, পুরস্কার পাবেন। বিশ্বব্যাপী, জনপ্রিয়তম শিল্পী হয়ে উঠবেন। তিনি না থাকলে নাটকের দলের টিকিট বিক্রি হবে না কারণ মানুষ তখন তাঁকেই দেখতে চাইবে। এমন উদাহরণ খুঁজে বের করা কি খুব অসুবিধা? ওই যে জজ অরওয়েলের ১৯৮৪-এ আছে না—

"Progress in our world will be progress towards more pain. The old civilizations claimed that they were founded on love & justice, ours is founded upon hatred. In our world there will be no emotions except fear, rage, triumph and self abasement. Everything else we shall destroy…"

Corporate world, corporate theatre-এ কি এমনটাই হতে চলেছে, ভয় হয়।

প্রশ্ন: সাম্প্রতিক অতীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক পালা বদলে 'তীর' থেকে 'পশুখামার' নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তাহলে পুঁজির কব্জা থেকে নিজেই কি নাটক লড়াই করে বেরিয়ে আসতে পারবে না?

উত্তর: তাই। আপনার ধারণা এই রাজনৈতিক পালা বদলে, 'তীর' এবং 'পশুখামার'এর ভূমিকা ছিল- 1 differ, 'তীর' অতি নিম্ন মানের নাটক। আপনি হয়তো দেখেননি, আমি দেখেছি। সবটাই ইমপোজড। চারুবাবু নিজে দেখে বিরক্ত হয়েছিলেন। উৎপলবাবু U turn করে নকশাল থেকে দিব্যি C.P.M হয়ে গেলেন। 'পশুখামার' বিখ্যাত বিদেশি নাটক, কিন্তু রাজনৈতিক পালাবদল যে সম্প্রতি হয়েছে তার সাথে এই নাটকের বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। এই পালাবদল যে কারণে হয়েছে তা আমি আপনি দু'জনেই জানি। চৌত্রিশ বছরের যে ক্ষোভ, অসন্তোষ, ঘৃণা, ক্রোধ এবং সর্বোপরি মস্তানি এই পালাবদলে বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। শুনুন, নাটক করতে টাকা লাগে নাটক চালাতেও টাকা লাগে। আজকাল টাকা উড়ছে। Central Govt. এর সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এত বিভিন্ন সোর্স ও নানান কায়দায় grant দেয় এবং সেই কায়দা যে দাদাদের জানা আছে সে সব দল প্রায় কর্পোরেট স্টেটাস-এর। আপনি কি জানেন- বহু দলের নিজস্ব গাড়ি আছে, ডিরেকটরের গাড়ি আছে। নিশ্চয়ই বিক্রিত হওয়া টিকিট থেকে এই টাকা আসছে না। এমন অনেক দলই আছে তাদের অনেকেরই সংসার চলে salary grant বা অন্যান্য project-এর টাকায়। পুঁজির কবল থেকে থিয়েটারের মুক্তি তখনই সম্ভব যখন অনেক মানুষ থিয়েটার দেখবে এবং নাটক কখনই জীবিকা নির্বাহের বিষয় হবে না। আমরা যে থিয়েটার করি তার জন্মই দারিদ্রে। কিন্তু দারিদ্রের মধ্যে জন্ম নিয়ে অনেক দলই নানা ভাবে নানা কায়দা কানুনে লাখপতি এবং কোটিপতি হয়েছে। এরা প্রায় অনেকেই বিদেশে যান, ভারতীয় কোন্ সংস্কৃতি সেখানে প্রতিফলিত হয়, কোন্ বিশেষ বৈশিষ্ট্যে বা বিশেষত্বে তারা ভারতীয় নাটকের প্রতিনিধিত্ব করেন আমি জানি না। উল্লেখযোগ্য যে পুরো কর্মকাণ্ডটাই কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কারণ কলকাতাই তো পশ্চিমবঙ্গ। আর সব অন্য বঙ্গ বা বঙ্গ নয়।

প্রশ্ন: সমাজ জীবনে নির্দিষ্টভাবে নাটকের উৎস ও ভূমিকা কী? সমাজ পরিবর্তনেই বা তার কোনো ভূমিকা থাকে কিনা?

উত্তর: দেখুন মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের বিভিন্ন ছবি, আনন্দ বিস্ময় দু:খ যাই হোক না কেন, তা মানব চিন্তন জগতে প্রতিফলিত হয়। এবং সে হয় স্বপক্ষে নয় বিপক্ষে ভাবতে থাকে। সে নিজের সঙ্গে ক্রমাগত ছায়াবাজী করে। কোন একটি সূত্র ধরে সে নাটক লেখে এবং আবার সমাজের মানুষের কাছে তা পরিবেশন করে। So taken from society and again giving it back to the society with his imagination, innovations, and ability। সুতরাং সমাজের সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক অতি নিবিড়। আর সমাজ বদলের প্রশ্ন তো শুধু সাংস্কৃতিক প্রশ্ন নয় এর সঙ্গে অর্থনীতি রাজনীতি ইত্যাদি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে। সুতরাং আমি মনে করিনা কোন নাটকই সমাজবদলের একমাত্র হাতিয়ার হতে পারে, It may only inspire the necessity of change, nothing more.

প্রশ্ন: আধুনিক প্রযুক্তির উল্লম্ফন এবং তার ও অন্যান্য আর্থসামাজিক প্রভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আজকের দ্রুতগামী কেজো ব্যক্তি কেন্দ্রিক সমাজে নাটকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কোথায়।

উত্তর: দেখুন Technology একটা দানব। এর চলনকে আমরা বলি জিয়োমেট্রিক প্রোগ্রেশন, যেমন ১-২-৫-৮-১৬ ইত্যাদি। এখন এই উল্লম্ফন নিশ্চয়ই আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাকে সমভাবে না হলেও প্রভাবিত করেই। এমন কিছু পরিবর্তন আনে বা পরিস্থিতি তৈরি হয় যা অতীতে ভাবনার মধ্যে ছিলনা। কিন্তু সংস্কৃতির গতি আমার মতে Mathematical Progression যেমন, ২-৪-৬-৮-১৬ ইত্যাদি। সেই অর্থে আমার মতে এর গতি মন্থর। কারণ সংস্কৃতি এক ধরনের মনন প্রক্রিয়ার রসায়ন যার সঙ্গে অ্যানথ্রোপলজি, পাস্ট হেরিটেজ, প্রোলংড বিলিফ, ফেথ, রেসপেক্ট, এগুলো মিলেমিশে একটা জটিল প্রক্রিয়া। সুতরাং এই প্রক্রিয়াটি এত মন্থর গতিতে কাজ করে যে সেই গতি কখনই technological progressএর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। নাটক সেই অর্থে একবিংশ শতাব্দীর Net Mobile Jet এর ব্যস্ততার যুগে, কোনটাই ভাল না জানার মানসিকতার যুগে, কেমন করে পাল্লা দেবে? প্রযুক্তির কিছু ব্যবহার হয়তো—হয়তো কেন নিশ্চয়ই নতুন ভাবনা, প্রয়াস ইত্যাদি প্রযোজনা সংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্য করেও, কিন্তু লিখিত নাটক (Text এর কথা বলছি), যার মধ্যে গভীর ভাবনা চেতনা দ্বন্দ্ব ইত্যাদি থাকে, তার সাথে, প্রযুক্তির মিলন কেমন করে হবে? আমি জানি না। প্রযুক্তির উল্লম্ফন নাটকের Text হতে পারে, কিন্তু সেই Text-এ অবশ্যই মানসিক দ্বন্দ্ব সামাজিক পরিস্থিতি এবং Universal কিছু Truth এর মুখোমুখি দাঁড় করাবে এমন হতে হবে। নবীন প্রজন্ম যদি শুধু প্রযুক্তিকেই একমাত্র

পরম প্রাপ্তি ভাবে, জানি না তা সত্যিকারের নাটকে কিভাবে ব্যবহার করা যাবে?

প্রশ্ন: তিজনবাঈ বলছেন তার সমাজে মেয়েরা পান্ডবানী গাইতে চাইছে না। কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর: Begger's do not get alms in their own place, from their own people। তিজনবাঈ এর কথা কেন শুধু বলছেন, আমি আমার কৈশোর ও যৌবনে 'কৃষ্ণযাত্রা' রাস রসায়ন এর যে জনপ্রিয়তা দেখেছি Both to the common people and educated literate class অভাবিত। আপনারই কথায় এই প্রযুক্তির উল্লম্ফনের যুগে শুধু তিজনবাঈ কেন সমস্ত লোক শিল্পই ভয়ঙ্কর দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে। বলা যায় At the brink of extinction। এ নিয়ে আফসোস করে লাভ নেই। Media এদের নিয়ে কোনো কোনো সময় Stunt বাজি করে। provoke করার জন্য highlight করেছে। Knowing fully well that they have lost their ground in their own place।

প্রশ্ন: বাংলাদেশ, অসম, মফস্বলের বেশ কিছু ভাল উপস্থাপনা দেখা গেছে। কিন্তু হাবিব তনবীরের 'চরণদাস', বিজয় তেন্ডুলকারের 'ঘাসিরাম কোতোয়াল', রতন থিয়ামের 'চিত্রাঙ্গদা', মনোজ মিত্রের 'সাজানো বাগান', বিভাস চক্রবর্তীর 'মাধব মালঞ্চি কইন্যা' প্রভৃতির মত সর্বজন প্রিয় সাড়া জাগানো উপস্থাপনা দেখা যাচ্ছে না। বহুরূপী, নান্দীকার, এরাও খানিকটা নিস্প্রভ। কেন?

উত্তর: দেখুন, slug তো সবসময়ই যায়- অর্থনীতিতে, সংস্কৃতিতেও। হাবিব তনবীর, বিজয় তেন্ডুলকার চলে গেছেন। কিন্তু রতন থিয়াম, মনোজ, বিভাস এরা বেঁচে আছেন। শম্ভুদার পর থেকে বহুরূপীর graph বা ধরুন অজিতদার পর থেকে নান্দীকারের graph পড়ছে। অবশ্যই গৌতম once or twice held in high but he is no more in নান্দীকার। আসলে কাল তো কাউকে ক্ষমা করে না। প্রতিভাকেও না। সত্যজিৎ রায় একেবারে শেষের দিকে যে সব ছবি করেছেন সেগুলো কি মানের দিক থেকে 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত'র কাছাকাছি, একটা কবিতার লাইন মনে পড়ছে—

"সর্বাঙ্গে বার্ধ্যকের অলঙ্কার পরায়েছে মহাকাল
আমার সবাই অতীত, নেই কোন আগামীকাল।"

প্রশ্ন: বাদল সরকার, সফদার হাসমির পর পর নন্ প্রসেনিয়ামও তো তেমন সাড়া ফেলতে পারছে না।

উত্তর: বাদলবাবু মানুষের কাছে গেছেন তাঁর নাটক নিয়ে, প্রসেনিয়াম ছেড়ে, কিন্তু তাঁর নাটকের Text গুলো কি গ্রামের চাষাভুষো সাধারণ মানুষে বোঝে? তাঁদের ভাষায় কি তাঁর Text কথা বলে? প্রথমে একটা গিমিক ছিল, পরে দেখা গেল বিষয়বস্তু অর্থাৎ নাটক তেমন জোড়ালো নয়। তাই ধীরে ধীরে যা হবার তাই হল। বাদলবাবুর ভক্তরা মাথা ন্যাড়া করে, পৈতে পরে আবার প্রসেনিয়ামে আসছেন। আর সফদর হাসমি তো মূলত Propagrandist। তিনি একটি রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন ফলে তিনি সর্বজনগ্রাহ্য হবেন কি করে? তাঁর রাজনীতি যাঁরা সঠিক বলে মনে করেন না, কেন তাঁকে সমর্থন করবেন? যদিও তাঁর মৃত্যু খুবই দু:খজনক। কুৎসিত Plot করে তাঁকে মারা হয়েছে। But had he been alive till now, 1 doubt he would not be so much popular.

প্রশ্ন: আঞ্চলিক ভাষার ও গ্রামের থিয়েটার....?

উত্তর: মফস্বলের থিয়েটারের যে অবস্থা আঞ্চলিক ভাষা বা গ্রামের থিয়েটার-এর ও একই অবস্থা। নতুন কিছু নয়।

প্রশ্ন: সম্প্রতি আপনি রাজবংশী ভাষা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন, এই ব্যাপারে যদি কিছু বলেন...।

উত্তর: একটু ভুল হল। সম্প্রতি নয় ১৯৭১ সাল থেকে আমি রাজবংশী ভাষা নিয়ে কাজ করছি। হয়তো সেটা unadulterated pure রাজবংশী নয়, কিন্তু রাজবংশী তো বটেই। যাত্রাটা শুরু হয়েছিল 'ভাঙ্গা পট' থেকে তারপর 'দেবাংশী', 'মন্ত্রশক্তি', 'পত্রশুদ্ধি', 'গনেশগাথা', 'খারিজ', সম্প্রতি 'ভগীরথের মূর্তি' প্রভৃতি। তো বলার কথা এই এখানকার এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আমি খুব rich গান, rituals, traditions ও custom দেখেছি। religious aspectও দেখেছি। এগুলো আমার কাছে খুব attractive মনে হয়েছে। আমি নানা নাটকে বিভিন্নভাবে এগুলো ক্রমাগত ব্যবহার করেছি। অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সীমিত পরিসরে কথার বাঁধুনিতে এগুলো গুছিয়ে বলার মত কারুকৃতি আমার নেই।

প্রশ্ন: ত্রিতীর্থ নিয়ে আপনার পরিকল্পনা কি?

উত্তর: হ্যাঁ, ছিলতো। ১৯৭৮ সালে অভিনেতাদের জন্য, নিজের দলের ছেলেদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য স্কুল খুলেছিলাম। স্বরচর্চা, শরীর চর্চা, body language, space, light, make up কত কি? বছর পাঁচেক ছেলেদের দম ছিল আমারও ছিল। ব্যস শেখা হয়ে গেল স্কুলও উঠে গেল। মনে রাখবেন তখনও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমি হয়নি, workshop চালু হয়নি। এখানকার কিছু উৎসাহী অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিযোগ ছিল। আপনি শুধু নিজেদের লোকদের শেখান, আমাদের জন্য কিছুই করেন না। ভাবলাম তাইতো? আবার ১৯৮২-তে সবার জন্য স্কুল, ক্লাস শুরু করলাম। ত্রিতীর্থই ভেনু ছিল। অন্য দলের ছেলেরাও আসত। আমার বন্ধু শমীক বন্দোপাধ্যায় এই স্কুল উদ্বোধন করেছিলেন। একটা Syllabus করে দিয়েছিলেন। প্রথমে পঞ্চাশ/ষাট জন ছাত্র ছাত্রী, জনা আটেক মাস্টারমশাই। ছাত্র কমতে কমতে শিক্ষক সংখ্যাই বেশি হয়ে গেল। স্কুল উঠে গেল। এখন মাঝে মাঝে যারা আসে তাঁদের নিয়ে কোন কোন দিন workshop করি। আপনি নিজে ত্রিতীর্থের মঞ্চ ও অডিটোরিয়ামের দুরবস্থা দেখেছেন, এই রকমই আছে। যেহেতু রাজনীতির সঙ্গে ত্রিতীর্থের কোনো যোগ নেই, তাই কেউ পুনর্নির্মাণের জন্য টাকা দেয় না। যৎসামান্য যা পাওয়া যায় তা দিয়ে repair করি কিন্তু পুরো কাজ করা যায় না। ইচ্ছে ছিল, ইচ্ছেটা এখনও আছে। এ জন্য বলছি যে কলকাতা ছাড়া গোটা পশ্চিমবঙ্গই তো মফস্বল, একেবারে নিভে যাবার আগে কলকাতায় ত্রিতীর্থের কিছু পুরোনো, কিছু নতুন নাটক নিয়ে সাতদিনের একটি উৎসব করার ইচ্ছে আছে। ইচ্ছেটা ফলপ্রসূ হবে না জানি। কে টাকা দেবে, media আমাকে

তোল্লা দেবে কেন? ইত্যাদি। একটা কথা আপনাকে জানানো হয়নি, 'রক্তকরবী' আমি রাজবংশী ভাষায় লিখে খোদার ওপর খোদকারী করেছি। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে একটি নাটক পাঠের আসরে সেটি অনেকেই শুনেছেন।

সম্প্রতি বহুরূপী পত্রিকায় Text with my apology ছাপা হয়েছে। সংগ্রহ করে পড়ে দেখতে পারেন।

প্রশ্ন: নবীন নাট্যকারদের প্রতি আপনার বার্তা কি থাকবে?

উত্তর: নতুন বিষয়, অভিনব, বিস্ময়কর নাটক লিখুন। classic যে সব নাটক, সেগুলো যুগোপযোগী করে পুনর্বার লিখুন। আমাদের Epic এবং লোকনাটকের শক্তি ও তার বৈশিষ্ট্য re-build ও reconstruct করুন, কারণ "Looking deep into the meaning of what has gone before we discover the meaning of future. Looking backward we move forward."

ধন্যবাদ, নমস্কার, ভালো থাকবেন।

সার্ধশতবর্ষের আলোকে আলিপুর চিড়িয়াখানা

সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়

শীতকালের জরিবোনা সোনা রোদ্দুরে আমরা নানাবয়সের মানুষজন কাছে দূরে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে বেরিয়ে পড়ি। বিশেষ করে আমরা যারা কলকাতা বা তার আশেপাশে থাকি তাদের কাছে কলকাতার বেশ কটি দ্রষ্টব্য স্থানে না গেলে মনে হয় কি যেন একটা বাকী থেকে গেল। তেমনই একটি স্থান আলিপুর পশুশালা বা আলিপুর চিড়িয়াখানা। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ যে কটি স্থান নিয়ে অত্যন্ত গৌরবান্বিত তার মধ্যে অন্যতম হল আলিপুর চিড়িয়াখানা। আরও আনন্দের কথা এই যে, এইবছর অর্থাৎ ২০২৫-এ আলিপুর চিড়িয়াখানা ১৫০ বছরে পা দিল। এই রচনায় আমরা তাই ফিরে দেখব আলিপুর চিড়িয়াখানার সেই গৌরবময় অতীতকে। সন্ধান করবার চেষ্টা করব এই চিড়িয়াখানার জন্মবৃত্তান্ত।

আলিপুর চিড়িয়াখানা

কি করে চিড়িয়াখানা হল? সেই ইতিহাস সন্ধান করতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে প্রায় ২২৩ বছর আগে। সালটা ১৮০২ বা ১৮০৩। সেসময় সারা পৃথিবীতে ভিয়েনা, মাদ্রিদ এবং প্যারিসে মাত্র তিনটে চিড়িয়াখানা ছিল। তখন ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ওয়েলেসলি। তিনি মনে করলেন এশিয়ার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে যেসব পশুপাখি পাওয়া যায় তাদের একটা বিবরণী তৈরি করতে হবে। সেখানে তাদের ছবিও থাকবে। প্রথমে এই প্রাণীদের রাখা হল গার্ডেনরিচে। ডা. ফ্রান্সিস বুকানন নিযুক্ত হলেন পশুসংগ্রহশালার তত্ত্বাবধায়ক ও গবেষক হিসাবে। শুরু হল চিড়িয়াখানা তৈরির প্রাথমিক কাজ।

এরপর ব্যারাকপুরের পার্কে অস্থায়ীভাবে তৈরি হল 'ব্যারাকপুর গভর্নমেন্ট হাউস' নামে একখানি দোতলা বাড়ি। মোতায়েন রাখা হল ১০টি হাতি। এই পার্কেই গড়ে উঠল জন্তু জানোয়ারের থাকার জায়গা চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানার বাজেট হল মাসে হাজার সিক্কা টাকা। পশুপাখিদের খাওয়াদাওয়ার জন্য ধরা হল পাঁচশো টাকা। যাঁরা ছবি আঁকবেন তাঁদের মাইনে ধরা হল একশো টাকা, একজন ক্লার্ক নিয়োগ করা হল যাঁকে মাইনে হিসেবে দিতে হবে চল্লিশ টাকা, ছবি আঁকার লোকের রঙ তুলি কেনবার খরচ বাবদ ধরা হল ৫৯ টাকা আর নতুন নতুন জন্তু জানোয়ার কেনার জন্য লাগবে তিনশো টাকা। দেশের নানাস্থান থেকে লোকে দেখতে আসতো এই চিড়িয়াখানা। ১৮১০ সালে চিড়িয়াখানার পশুপাখিদের দেখতে এসেছিলেন মিসেস গ্রাহাম। তিনি এই চিড়িয়াখানায় পেলিক্যান, সারস, ফ্লেমিংগো উটপাখি, ক্যাসুয়ারি, জাভার পায়রা দেখেছেন। এর সঙ্গে বাঘ ও ভালুক তো ছিলই। ওই বছর এসেছেন স্যার স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফেল। তিনি ব্যারাকপুরের এই চিড়িয়াখানায় টেপির দেখেছেন। ১৮৯৪ সালে লেডি নুজেন্ট এসেছেন। তিনি দেখেছেন কালো চিতা, উটপাখি। তখনই কর্তৃপক্ষ ভাবলেন যে আরো কিছু তৈরি করতে হবে। ১৮১৭ থেকে ১৮১৯ এর মধ্যে লর্ড হেস্টিংস ২ অথবা লর্ড ময়রার আমলে এঁরা তৈরি করলেন একটি নতুন পশুশালা। তৈরি হল আর একটি পক্ষীশালাও।

এরপর লর্ড অকল্যাণ্ড ভারতে গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন ১৮৩৬এ। তাঁর দুই বোন এমিলি আর ক্যানি ইডেন-অকল্যাণ্ডের, ভারি প্রিয়। বোনেদের খুশি করতে তিনি আরো সাজালেন চিড়িয়াখানাকে। সেসময় গন্ডার পুকুরে রাখা হল গন্ডার, হরিণ পুকুরে বেড়া ঘেরা জায়গায় এল বহুরকমের হরিণ। বেয়ার পিটে এল ভল্লুক। এছাড়াও চিতাবাঘ, সাদা বাঁদর, বেবুন, জিরাফ—কিছুই তো বাকি নেই। আর দেশবিদেশের পাখি—সে যে কত এল তার ইয়ত্তা নেই। চিন থেকে আনা হল গোল্ডেন ফেজান্ট যার জন্য একটা আস্ত পাখিশালা তৈরি করা হল। এমিলি ইডেন লিখেছেন যে একবার চিড়িয়াখানা থেকে একটা গণ্ডার বেরিয়ে পড়েছিল আর ধাওয়া

করেছিল এক সাহেবের ঘোড়ার গাড়ির পেছনে। লর্ড ক্যানিং যখন বড়লাট হয়ে এলেন তখনও এই চিড়িয়াখানা টিকে ছিল। কাবুলের রাজা দোস্ত মহম্মদ জিরাফ দেখে খুব অবাক হয়েছিলেন। লর্ড লিটনের আমল অবধি এই চিড়িয়াখানার অস্তিত্ব ছিল। ধীরে ধীরে জীবজন্তুর ঠিকানাও বদল হয়ে গেল। ১৮৪২ সালে লর্ড অকল্যাণ্ড দেশে ফিরে গেলেন। টিমটিম করে তাও জ্বলছিল চিড়িয়াখানার আলো। এরপর সব শেষ হয়ে গেল।

রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড ১৮৭৬ সালে উদ্বোধন করলেন বর্তমান আলিপুর চিড়িয়াখানার। সেসময়কার একটি কচ্ছপ যার নাম ছিল আদিত্য সে স্থান পেল আলিপুর চিড়িয়াখানায়। শুনেছি ২০০৬ সাল পর্যন্ত নাকি সে বেঁচেছিল। বলা যায় ব্যারাকপুর আর আলিপুর—এই দুই চিড়িয়াখানার যোগসূত্র ছিল আদিত্য নামের এই কচ্ছপ। ২৫০ কেজি ওজনের এই অ্যালডাবরা বড় কচ্ছপটি বেঁচে ছিল ২৫৬ বছর। ৪৬.৪৮ একর জমিতে স্থাপিত হল আলিপুর চিড়িয়াখানা (Zoological Garden, Alipore)। ক্রমে এই চিড়িয়াখানা বাচ্চা বুড়ো সকলের খুব প্রিয় হয়ে উঠল। এর মধ্যে রেপটাইল হাউস, এলিফ্যান্ট হাউস, প্রাইমেট হাউস, প্যানথার হাউস গড়ে উঠল। খাঁচা বন্দী পশুপাখিদের অনেকটা মুক্ত জায়গায় রাখার ব্যবস্থা হল। দেশবিদেশ থেকে বহুরকম জীবজন্তু এনে চিড়িয়াখানাকে আরও আকর্ষণীয় করা হল। চিড়িয়াখানার মধ্যিখানের ঝিলটি ও সংশ্লিষ্ট গাছপালা শীতে পরিযায়ী পাখিদের আস্তানা হয়ে উঠল। সারা বছর দর্শকদের ভিড় লেগে থাকলেও শীতের মরশুমে বিশেষত বড়দিনের ছুটিতে চিড়িয়াখানা গমগম করে। ২০১৬ সালের একটি তথ্য জানাচ্ছে বছরে ৩০ লক্ষ এবং বড়দিন ও নববর্ষে ৮১ হাজার দর্শক এসেছিলেন।

চিড়িয়াখানার তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে রাম ব্রহ্ম সান্ন্যাল ছিলেন প্রথম ভারতীয়। চিড়িয়াখানায় থাকাকালীন সাদা বাঘ, জিরাফ, ক্যাঙ্গারু, মণিপুরি হরিণ থামিন প্রমুখের প্রজনন সম্ভব হয়। রয়াল বেঙ্গল টাইগার ও আফ্রিকার সিংহের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে টাইগন এবং তাদের সঙ্গে ভারতীয় সিংহের মিলন ঘটিয়ে লিটিগনের জন্ম হলেও পরবর্তীতে এই ধরনের ক্রশ ব্রিডিং নিষিদ্ধ হয়। সেন্ট্রাল জু অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া (CZAI) আলিপুর চিড়িয়াখানার দায়িত্ব গ্রহণ করে। চিড়িয়াখানার বিপরীতে একটি পশু চিকিৎসালয় ও একটি অ্যাকোরিয়াম হাউস গড়ে ওঠে। ২০১৩ থেকে পশুপাখির দায়িত্ব নেওয়ার ও নামকরণ প্রকল্প শুরু হয়। অন্যদিকে চিড়িয়াখানার সীমিত জমি, কলকাতার প্রবল দূষণ, চারপাশে বহুতল নির্মাণ এবং অতিরিক্ত জনসমাগম চিড়িয়াখানার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

ঐতিহ্যে এবং আধুনিকতায় কলকাতার এই আলিপুর চিড়িয়াখানা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। সেদিন থেকে আজ—অনেককিছু বদল তার বহিরঙ্গে কিন্তু অন্তরঙ্গে তার পশুপ্রেম সেই একইরকম। আবহমানকাল ধরে চলছে একই রকমভাবে। সার্ধশতবর্ষে এই চিড়িয়াখানা গৌরবের আলোকে আলোকিত হোক এই আমাদের প্রত্যাশা।

তথ্যসূত্র :
১. কলকাতা—শ্রীপান্থ, আনন্দ পাবলিশার্স
২. রবিবাসরীয় আনন্দবাজার ২০.০১.২০১৯

বিদেশে রেকর্ড

১৯৭০-'৭১ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফর

সুনীল গাভাস্কার

৩য় টেষ্টের ১ম ইনিংস : ১১৬
৪র্থ টেষ্টের ২য় ইনিংস : ১১৭
৫ম টেষ্টের দুই ইনিংস : ১২৪ ও ২২০

২০২৫ ইংল্যাণ্ড সফর

শুভমন গিল

১ম টেষ্টের ১ম ইনিংস : ১৪৭
২য় টেষ্টের দুই ইনিংস : ২৬৯ ও ১৬১
চতুর্থ টেস্ট, দ্বিতীয় ইনিংস ১০৩

গল্প

প্রাচিত্তির

মূল হিন্দি রচনা: ভগবতী চরণ বর্মা

বাংলা রূপান্তর: দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

ভগবতী চরণ বর্মা : জন্ম: ৩০-০৮-১৯০৩; মৃত্যু: ০৫-১০-১৯৮১। হিন্দি সাহিত্যজগতে ভগবতী চরণ বর্মা একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নাম। বর্তমান উত্তর প্রদেশের সফিপুরে তাঁর জন্ম। ঔপন্যাসিক রূপে সমধিক পরিচিত হলেও সাহিত্যের সবকটি ধারায় তাঁর ছিল অনায়াস গতায়াত। সাহিত্য রচনার শুরুতে তিনি কবি রূপেও অত্যন্ত খ্যাতি পেয়েছিলেন। প্রয়োগবাদ এবং প্রগতিবাদ তাঁর কবিতায় যথেষ্ট পরিলক্ষিত হতো। তাঁর ক্ষুরধার ব্যঙ্গাত্মক লেখনি প্রতিভাত হতো তাঁর অসংখ্য ছোটগল্পে। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে বি.এ. ও পরে এল.এল.বি ডিগ্রি লাভ করে একাধিক্রমে ওকালতি, লক্ষ্ণৌ আকাশবাণী ও কলকাতায় চলচ্চিত্র শিল্পে নিজেকে নিয়োজিত করেন। পরে সবকিছু ছেড়ে পূর্ণ সময়ের জন্য সাহিত্যসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। 'চিত্রলেখা' উপন্যাস তাঁকে একেবারে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে দেয়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দু-দুবার এটি চলচ্চিত্রায়িত হয়। ১৯৬১-তে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর 'ভুলে বিসরে চিত্র' উপন্যাসটির জন্য তিনি সাহিত্য অ্যাকাডেমি সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৭১-এ তিনি পদ্মভূষণ সম্মান ও ১৯৭৮-এ তিনি রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে মনোনীত হন। অনুদিত গল্পটি তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প 'প্রায়শ্চিত' এর বাংলা রূপান্তর। গল্পটি রচনাকাল ১৯৫২। গল্পটি 'রাজপাল এ্যান্ড সন্স' প্রকাশনার 'মেরি প্রিয় কাহানিয়া' পেপারব্যাকে মুদ্রিত। গল্পটি বাংলাভাষায় রূপান্তর করার জন্য পত্রিকার তরফ থেকে আমরা একই সঙ্গে প্রকাশনা সংস্থা ও লেখকের পরিবারের কাছে ঋণ স্বীকার করছি।

ভগবতী চরণ বর্মা

প্রাচিত্তির

বাইরে থেকে আসা উটকো হুলো বিড়ালটা যদি এ বাড়ির কাউকে ভালবেসে থাকে তবে সে হলো রামুর বউ। আর রামুর বউ বাড়ির মধ্যে যাকে সবথেকে বেশি অপছন্দ করে সে হলো ওই উটকো হুলো। রামুর বউ সবে দুমাস হলো বাপের বাড়ি থেকে প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি এসেছে। সোয়ামীর খুব সোহাগী। শাশুমার বড় আদরের মাত্র চোদ্দ বছরের বালিকা সে। তাঁর এরই মধ্যে আঁচলে চাবির গোছা ঝুলিয়ে সারা বাড়ি ঝমঝম করে চলা। নৌকর-চাকরদের ওপর চোখ বড় বড় করে হুকুম চালানো দেখে সকলে বড় আমোদ পায়। সে আসতেই তার শাশুমা ঘর-গৃহস্থির যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তার হাতে সঁপে দিয়ে তুলসির মালা হাতে ঘরের ভিতর ভজন-পূজনে মন দিতে চান।

কিন্তু বৌ তো কেবল চোদ্দ বছরের বালিকা, তার এখনো খেলার বয়সই যায়নি। তাই কাজ করতে গিয়ে ও মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কখনো বা ভাঁড়ার ঘরে দরজা খোলা রেখে ভাঁড়ারের মেঝেতেই আঁচল পেতে শুয়ে পড়ে। সেই সুযোগে উটকো হুলোটা ঘরের ভিতর ঢুকে ঘি-দুধ সাবাড় করে দেয়। পরে রামুর বউ পড়ে মহা আতান্তরে আর হুলোটার পোয়া বারো! রামুর বউ ঘি বানিয়ে বোয়েমে রাখতে রাখতে কখন একটু ঝিমিয়ে পড়েছে কি ব্যস পড়ে থাকা ঘি হুলোর পেটে। একদিন ভোরবেলায় রামুর বৌ গরুর দুধ দোহন করতে করতে রাঁধুনি মাসি মিসরাইন তার কাছে কি একটা চাইল। সে দুধের বালতিটা রেখে জিনিসটা দিয়ে আসতে আসতে দেখে বালতির দুধ গায়েব। এই পর্যন্ত হলেও তবু কথা ছিল। রামুর বৌ-এর গতিবিধি হুলোটার এতই পরিচিত ছিল যে সে দু-দণ্ড অসাবধান হলেই হুলোটা কিছু না কিছু লোপাট করে বসতো। হুলোটার আতঙ্কে রামুর বউ-এর খাওয়া দাওয়া প্রায় মাথায় ওঠার জোগাড়।

রামু হাট থেকে ফিরে এলে বৌ একবাটি ঘরে বানানো রাবড়ি তার ঘরে রেখে এল। রামু হাত মুখ ধুয়ে ঘরে এসে দেখে রাবড়ির বাটি চেটেপুটে সাফ। একদিন বাজার থেকে বউ-এর জন্য ঠান্ডা মালাই নিয়ে এসে রামু বউকে ডাকতে গেল। বউ তখন শাশুমার জন্য তার ঘরে বসে পান সাজছিল। পান সেজে শাশুমাকে দিয়ে নিজের ঘরে এসে দেখে মালাইয়ে 'ম' ও নেই, খালি হাঁড়িটা পড়ে আছে।

আর নয়, রামুর বউ মনস্থির করে নেয় হয় সে এই বাড়িতে থাকবে নয়তো ওই উটকো হুলো। দু'জনেই এবার দু'জনকে চোখে চোখে রাখতে লাগল। হাট থেকে বিড়ালটাকে ধরার জন্য ফাঁদ কিনে আনা হলো। তাতে কতবার বিড়ালের পছন্দসই খাবার রাখা হলো। ফাঁদে পা দিলেই তাকে ধরে দূরে কোথাও ছেড়ে আসা হবে। কিন্তু ফাঁদে পা দিতে হুলোটার বয়েই গেছে। এতদিন যদি বা সে রামুর বউকে একটু ভয় পেতো এখন একেবারে পাশে পাশে থাকতে লাগল। কিন্তু ততটাই পাশে যাতে কেউ তাকে ধরতে না পারে।

হুলোটার এহেন আচরণে রামুর বউ আরও মুসকিলে পড়ে গেল। দেখলে মনে হবে এ বিল্লি তার পোষা। পরিণতিতে এখন প্রায়ই তার কপালে জোটে শাশুমার মৃদু গঞ্জনা আর স্বামীর কপালে জোটে রুখা, সুখা ভোজন ব্যঞ্জনা। অবস্থা চরমে উঠল সেদিন, দিনটা ছিল গুরুপূর্ণিমা। রামুর বৌ খুব যত্ন করে পায়েস বানিয়ে তাতে পেস্তা-বাদাম, মাখন, নানারকম মেওয়া, এলাচ-সুগন্ধি দিয়ে তাকে অত্যন্ত উপাদেয় করে একটি বড় সুদৃশ্য চিনামাটির পাত্রে রেখে ঘরের এমন এক উঁচু তাকে

রাখল যে তা যে কোনো বিল্লির নাগালের বাইরে। তারপর শাশুমার জন্য পান সাজতে বসলো। উটকো হুলো গুটি গুটি পায়ে ঘরে ঢুকে এমন একটা আড়ালে চলে গেল যে বৌ তা নজর করার সুযোগ পেলনা। তারপর দরজা বন্ধ করে সে শাশুমাকে পান দিতে গেল।

দরজা বন্ধ হতেই হুলো আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পায়েসের পাত্রটাকে ভাল করে দেখল, নাকটাকে উঁচু করে বার দুয়েক ঘ্রাণ নিল। ''হুম! মাল একদম সরেস মনে হচ্ছে।'' একটু পেছিয়ে এসে তাকটা কতটা উঁচু মনে মনে তার একটা পরিমাপ করে নিল। তারপর দৌড়ে এসে মারল এক জম্পেস লাফ। না, তাকের ওপর উঠতে পারলো না বটে কিন্তু তার থাবা গিয়ে ঠেকল চিনামাটির পাত্রে। ধাক্কা খেয়ে সেটা মেঝেতে পড়ে ঝনঝনিয়ে ছত্রখান হয়ে গেল। অত যত্ন করে বানানো পায়েস ছিটকে গিয়ে পড়ল মেঝেতে পেতে রাখা ফরাসের ওপর।

সে আওয়াজ রামুর বউ-এর কানে পৌঁছাতেই সে পান-খিলি সব ফেলে শাশুমার ঘর থেকে ছুটে এ ঘরে এসে দেখে তার অত সখের ফুলকাটা চিনামাটির পাত্র ভেঙ্গে চৌচির হয়ে সারা ঘরে ছড়িয়ে রয়েছে আর অত যত্ন করে বানানো পায়েস ছিটকে পড়ে আছে ফরাসের ওপর। আর শয়তান হুলোটা তা গরগর করে সাঁটাচ্ছে। রামুর বৌকে দেখামাত্রই সে সেখান থেকে চম্পট।

রামুর বউ-এর মাথায় খুন চেপে গেল। এবার সে একটা হেস্ত নেস্ত করেই ছাড়বে। না থাকবে বাঁশ, না বাজবে বাঁশুরি। সে এবার মেরেই ফেলবে হুলোটাকে। কিন্তু কিভাবে? এমনভাবে কিছু দিয়ে ওটাকে মারতে হবে যেন সে প্রাণে আর না বাঁচে। চিন্তায় চিন্তায় তার রাতে ঘুম হয় না। সকাল হতে দেখে হুলোটা যেন তাকে দেখে হাসছে। রাগে তার মাথা আগুন হয়ে গেল। সে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হুলোটা সেখানে থেকে সরে গেল। রামুর বউ ঘুম থেকে উঠেই প্রথমেই যে কাজটা শুরু করল সেটা হলো একটা উপযুক্ত অস্ত্রের সন্ধান। খুঁজতে খুঁজতে সে পেয়ে গেল কাপড় কাচার একাট জবরদস্ত কাঠের পাটা। তারপর ফিরে এসে একবাটি দুধ চৌকাঠের ওপর রেখে সে চলে গেল, খানিক বাদে দেখে যে হুলোটা দুধের বাটিতে মুখ ঢুকিয়ে দ্রুত কাজ সারছে। রামুর বৌ এ সুযোগ আর হাতছাড়া করল না। গায়ের পুরো শক্তি দিয়ে সে পাটাটা চালিয়ে দিল হুলোটার ওপর। উটকোটা না হিললো, না দুললো, না চ্যাঁচালো, না গোঙ্গালো! ব্যস খালি চৌকাঠের ওপর উল্টে পড়ে স্থির হয়ে গেল।

পাটা পড়ার আওয়াজ যা হয়েছিল তাতে ঝাড়ু ফেলে দিয়ে কাজের মেয়ে মহরী, রসুই ঘর থেকে রাঁধুনি মিসরাইন, পূজা ফেলে রেখে শাশুমা, সকলেই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছাল। দেখে রামুর বউ অপরাধিনীর মতো মুখ করে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সবার আগে মহরী, বলে উঠল—''হায় রাম! বিল্লিটাতো মরে গেছে! এ তো খুব খারাপ হলো!''

মিসরাইন সায় দিয়ে বলল ''মাজি ঘরের মধ্যে বিল্লি হত্যা মানুষ হত্যার পাপের সমান। না বাবা, আমি আর রান্নাঘরে ঢুকছি না, যতক্ষণ না বৌ পাপমুক্ত হয়।''

শাশুমা মাথা নেড়ে বলল সে তো ঠিক কথাই যতক্ষণ না বৌ-এর মাথা থেকে পাপ ধুয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ না কেউ জল খেতে পারবে, না কোনো খাবার।''

মহরী বলল—''তবে আর কি! পণ্ডিতজীকে ডেকে আনি?''

এতক্ষণে যেন মনে বল পেল শাশুমা। বলে ''আরে হ্যাঁ, জলদি যা, পণ্ডিতজীকে ডেকে আন।''

বিড়াল মরার খবর ঝড়ের গতিতে গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। আশেপাশের সব গৃহস্থির মহিলারা লালা ঘাসিরামের বাড়িতে এসে ভিড় করল। এদিক সেদিক থেকে প্রশ্নবাণের যেন বৃষ্টি হতে লাগল রামুর বৌএর ওপর। সে বেচারী অপরাধিনীর মতো মুখ করে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকল।

পন্ডিত পরমসুখের কাছে যখন খবর পৌঁছাল তখন সে পুজোয় বসেছিল। খবর শুনতেই পুজো ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। হাসতে হাসতে গিন্নিকে বলল ''আজ আর দুপুরের খাবার বানিওনা। ঘাসিরামের বেটার বৌ বিল্লি মেরেছে। প্রাচিত্তির করাতে যেতে হবে। সাথে উৎকৃষ্ট ভোজনের ব্যবস্থাও হবে।—

পণ্ডিত পরমসুখ চৌবে ছোটখাটো চেহারায় গোলগাল পুরুষ। লম্বায় চার ফুট দশ ইঞ্চি। কিন্তু তার ভুঁড়িটি বিশাল, প্রায় আটান্ন ইঞ্চি। তার গোঁফ জোড়া বেশ লম্বা আর টিকিটি প্রায় কোমর ছুঁইছুঁই।

শোনা যায় মথুরায় ব্রাহ্মণ ভোজন পর্বে পাঁচ সের খাবার একেবারে খেতে পারে এমন বামুনের খোঁজ পড়লে সে লিস্টে পরমসুখের নাম সবার প্রথমে থাকে।

পণ্ডিত পরমসুখ লালা ঘাসিরামের বাড়িতে ঢুকতেই ঘর পঞ্চায়েতের কোরাম পূর্ণ হলো। আর দেরি না করে তখুনি পঞ্চায়েত শুরু হলো। শাশুমা, মিসরাইন, কিসনুর মা, ছন্নুর দাদি আর স্বয়ং পণ্ডিত পরমসুখ চৌবে। বাকি মহিলারা সাগ্রহে বসে গেল পঞ্চায়েতের রায় শুনতে। কেউ কেউ অবশ্য রামুর বৌ-এর প্রতি সহানুভূতিও দেখাতে লাগল।

কিসনুর মা জিজ্ঞাসা করল ''পণ্ডিতজী বিল্লি হত্যা করলে কোন নরকে গতি হয়?''

পণ্ডিতজী অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পুঁথির পাতা উল্টাতে উল্টাতে গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল ''শুধু বিল্লি হত্যা বললে তো আর নরকের নাম বলা যাবে না। তার আগে দেখতে হবে কখন হত্যাকাণ্ড ঘটেছে? মুহুরত্ দেখে তবে না নরকের ঠিকানা পাওয়া যাবে।''

''এই ধরেন না কেন! মোটামুটি সকাল সাতটা'' মিসরাইন বলে উঠল। পণ্ডিত পরমসুখ পুঁথির পাতা উল্টাতে উল্টাতে ছাপা অক্ষরগুলো আঙ্গুল দিয়ে যেন সাফ করতে লাগল তারপর ন্যাড়া মাথায় খানিক হাত বুলিয়ে চোখে মুখে বেশ খানিকটা উদ্বিগ্নতা ফুটিয়ে গলার স্বর আরো গম্ভীর করে বলল ''হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, বড়ই অশুভ সময় হে, প্রাতঃকালে একেবারে ব্রাহ্মমূহূর্তে মার্জার হত্যা! ঘোর পাপ, একেবারে কুম্ভীপাক নরকের বিধান রয়েছে পুঁথিতে। রামুর মা এ যে মহা অনর্থ হয়ে গেছে।''

রামুর মা-এর চোখে জল এসে গেল পণ্ডিতজীর কথা শুনে। বলল ''তা পণ্ডিতজী এবারে আপনিই বলুন এবার কি হবে? পাপ

কাটানোর উপায় বলুন।''

পণ্ডিতজী মুচকি হেসে বললে ''চিন্তার কিছু নেই রামুর মা। আমরা পুরোহিতরা তবে আছি কি করতে?'' পাপ যেমন আছে তেমনি শাস্ত্রে প্রাচিত্তিরের ব্যবস্থাও আছে। প্রায়শ্চিত্যে সব পাপ কেটে যায়।

''এজন্যই তো আপনাকে ডেকে এনেছি। এখন বলুন পাপ কাটানোর জন্য কি কি করতে হবে?''

''হুম! কি কি করতে হবে? কি আর, একটা সোনার বিল্লি বানিয়ে বউ-এর হাত দিয়ে দান করাতে হবে। যতক্ষণ না এই দানকর্ম হচ্ছে ততক্ষণ ঘর অপবিত্র থাকবে। সোনার বিল্লি দান করার পর একুশ দিন হরিকথা পাঠ।''

ছন্নুর দাদি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে ''বাঃ এতো খুব ভাল বিধান দিয়েছেন পণ্ডিতজী। সোনার বিল্লি আজই দান করে দেওয়া যাক। তাহলে আজ থেকেই পুজো-পাঠ শুরু হয়ে যাবে।''

রামুর মা প্রশ্ন করে ''তা পণ্ডিতজী সোনার বিল্লি কত তোলার (ভরির) বানাতে হবে?''

পণ্ডিত পরমসুখ মুচকি হেসে নিজের ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলে ''বিল্লি কত তোলা সোনায় বানাতে হবে! আরে রামুর মা শাস্ত্রে লেখা আছে বিল্লির ওজন যত, তত ওজনের সোনার বিল্লি বানাতে হবে। কিন্তু এ ঘোর কলিযুগ, ধম্মো কম্মো আর নিয়ম মেনে হচ্ছে কোথায়? মানুষের মনে সেই ভক্তি শ্রদ্ধাই নেই। সে কারণে অত ওজনের বিল্লি আর বানায় কে? আর এই বিল্লিটাও ওজন কম করে কুড়ি-একুশ সের তো হবেই। তা যা হোক অত দিতে হবে না তুমি ওই একুশ তোলা সোনার বিল্লি বানিয়ে দাও। এরপর নিজের নিজের শ্রদ্ধা... বেশি চাইলে দিতেই পারো।''

কথা শুনে রামুর মার তো চোখ কপালে উঠল। বলে—''বাপরে বাপ একুশ তোলা সোনা!! পণ্ডিতজী, এত সোনা পাব কোথায়? এক তোলা সোনার বিল্লিতে কাজ সারা যায় না?'' পণ্ডিত পরমসুখ হো হো করে হেসে উঠে বলে: ''রামুর মা বলে কি? এক তোলা সোনার বিল্লি!! আরে টাকা বড় না তোমার বউ? ওর মাথায় ঘোর পাপের বোঝা। এত টাকার লোভ ভাল নয়।''

অনেক কথাবার্তা দর কষাকষির পর ঠিক হলো এগারো তোলা সোনার বিল্লি দান করা হবে। এরপরে পুজো-পাঠের কথা। পণ্ডিত বলে এ আর বড় কথা কি? আমরা তবে আছি কি করতে? পাঠ আমিই করে দেবো। পুজোর সামগ্রী আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিও।

''পুজোর সামগ্রী কত লাগবে?''

''আরে বাবা যত কম লাগে তাই দিয়েই আমি পুজো সেরে নেবো। এই ধরো দানের জন্য দশ মণ গম, এক মণ চাল, এক মণ ডাল, ওই এক মণ মতো তিল, পাঁচ মণ যব, এক মণ মতো লবণ আর পঁচিশ সের ঘি। ব্যস এতেই আমি কাজ চালিয়ে নেবো।''

''আরে বাপ রে! এত জিনিস! পণ্ডিজী এতেই তো সোয়া-দেড়শো টাকা খরচ হয়ে যাবে।'' রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে বলে রামুর মা।

''এর কমে তো কাজ হবে না রামুর মা। মার্জার হত্যা কত বড় পাপ সে খেয়াল আছে? খরচা দেখার আগে নিজের বউ এর পাপটাতো দেখো। এ প্রায়শ্চিত্য কর্ম আছে, হাসি খেলার জিনিস নয়।''

পণ্ডিত পরমসুখের কথা পঞ্চকে বেশ প্রভাবিত করে ফেলল। কিসনুর মা বলে উঠল ''পণ্ডিতজী তো একেবারে ঠিক কথাই বলেছেন। বিল্লি মেরে ফেলা কোনো এলেবেলে পাপ নয়। বড় পাপ করলে প্রাচিত্তির তো বড় করেই করতে হবে।''

ছন্নুর দাদিও সায় দিল সেই কথায়। বলল ''তা নয় তো কি, দান পুণ্যেই তো পাপ কাটে। দান-পুণ্যে কিপটেমি করা ঠিক নয়।''

মিসরাইনও থেমে থাকল না, বলে ''তা ছাড়া মা' জি আপনারা বড় লোক এইটুকু খরচায় আপনাদের কিইবা এসে যায়।''

রামুর মা বুঝলে সকলেই পণ্ডিতের পক্ষে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ''এখন তো আপনারই দিন পণ্ডিত, যেমন নাচাবেন তেমন নাচতেই হবে।''

কথাটা পণ্ডিত পরমসুখের মোটেই ভাল লাগল না। খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়ে সে বললে ''দেখো রামুর মা, তোমার যদি ভাল না লাগে তো করো না। আমি চললাম।'' এই বলে সে পাঁজি পুঁথি গোটাতে লাগল।

''আরে পণ্ডিতজী রাগ করেন কেন? রামুর মায়ের কিছু খারাপ লাগেনি। কিন্তু ওই বেচারীর দুঃখটাও বুঝুন।'' এভাবে চলে যাবেন না। মিসরাইন, কিসনুর মা, ছন্নুর দাদি সকলে এক সাথে পণ্ডিতজীকে বোঝাতে লাগল।

তবুও পণ্ডিত চলে যেতে চাইলে রামুর মা তার পা আঁকড়ে ধরে।

যুদ্ধজয়ের ভঙ্গিতে পণ্ডিত পরমসুখ এবার জমিয়ে বসল। তারপর বললো ''এরপর...''

''আবার কি?'' আঁতকে উঠল রামুর মা।

''একুশ দিন হরিকথা পাঠের জন্য একুশ টাকা, আর একুশ দিন দু'বেলা একুশ বামুন ভোজনের ব্যবস্থা করতে হবে।'' তারপর একটু থেমে বলল ''যাকগে ওই নিয়ে চিন্তা করতে হবে না আমি একাই দুবেলা ভোজন করে নেব তাতেই তোমার একুশ ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল মিলবে। শুধু সেই পরিমাণ ভোজনসামগ্রী পাঠিয়ে দিও।

''এটা যা বলেছেন, পণ্ডিতজীর ভুঁড়িটাতো দেখো।'' মিসরাইনের ঠাট্টায় সকলে হেসে ওঠে।

পরমসুখে পণ্ডিত পরমসুখ বলে ওঠে ''বেশ তবে এবার প্রাচিত্তিরের ব্যবস্থা করো রামুর মা। এগারো তোলা সোনা ঘর থেকে বার করে এনে দাও। আমি দু'ঘন্টার মধ্যে সোনার বিল্লি বানিয়ে নিয়ে আসি। ততক্ষণে তোমরা পুজো-পাঠের জোগাড় করে ফেলো। আর দেখো পুজো-পাঠের সময়...''

পণ্ডিতজীর কথা শেষ হয়নি হঠাৎ মহরী চেঁচিয়ে উঠল ''আরে দেখো, দেখো বিল্লিটা যে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল।''

উটকো হুলো উঠতে গিয়ে প্রথমে একটু টলে গেল। তারপর একটু সময় নিয়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে সকলকে একবার দেখলো আর তারপরই এক দৌড়ে একেবারে পগার-পার।''

ভ্রমণ

অবহেলায় শশাঙ্কের কর্ণসুবর্ণ

অন্তরা ঘোষ

ঐতিহাসিক শহর মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদের আনাচে-কানাচে অলিতে গলিতে ইতিহাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আকাশে বাতাসে আজও নবাবী আমলের ইতিহাসের মেঘমালা ভেসে বেড়ায়। মুর্শিদাবাদের সালারের নিকটস্থ মালিহাটি স্টেশন সংলগ্ন গ্রামে দেশের বাড়ি হওয়ায় যখনই পুজোর সময় গ্রামের বাড়ি যাই অবশ্যই একদিন লালবাগ ও তার আশেপাশে অতীত ইতিহাসকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ি। লক্ষ্য করেছি যে হাজারদুয়ারি ও খোশবাগ অঞ্চলে রোজ অজস্র পর্যটকদের ভিড়। হয়তো নবাবী আভিজাত্য, গরিমা ও ঘটনা বহুল নবাবী ইতিহাস পর্যটকদের আকর্ষণ করে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের এমন কিছু প্রাচীন জায়গা আছে যা গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে অথচ লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রায় অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে।

কর্ণসুবর্ণের ধ্বংসাবশেষ

এমনই একটি ইতিহাস সমৃদ্ধ স্থান হল কর্ণসুবর্ণ। বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা শশাঙ্কের রাজধানী। কর্ণসুবর্ণকে দেখতে জানতে চিনতে ও ইতিহাসকে অনুভব করতে একদিন বাবা মাকে সঙ্গে নিয়ে মালিহাটি স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে বসলাম। কয়েকটা স্টেশন পরেই কর্ণসুবর্ণ। সাইনবোর্ডে বড় করে লেখা কর্ণসুবর্ণ, এ ছাড়া স্টেশনের বিশেষ কোনো চাকচিক্য বা জৌলুস চোখে পড়ল না। টোটোতে উঠে বসলাম। ঠিক হলো টোটোওয়ালা আমাদের চাঁদিপাড়ায় প্রায় দুশো বছর পুরনো নীলকুঠি, রাজবাড়িডাঙ্গায় রাজা কর্ণের প্রাসাদ বলে পরিচিত ঐতিহাসিক স্থান, উৎখননের ফলে প্রাপ্ত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ এবং রাক্ষসী ডাঙ্গা যেখানে খননকার্যের ফলে প্রাচীরের অংশবিশেষ ও কিছু কিছু মূর্তি প্রাপ্ত হয়েছে এইগুলি দেখাতে নিয়ে যাবে।

প্রথমে চলেছি রাঙ্গামাটি চাঁদপাড়ার উদ্দেশ্যে নীলকুঠি দেখতে। পিচ রাস্তার দু'ধারে কোথাও সবুজ ধানক্ষেত, কোথাও বিভিন্ন রকম সবজির বাগান,আবার কোথাও পুকুরে হাঁসদের জলকেলি। প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি।

নীলকুঠি দেখার আগে চলুন প্রায় আড়াইশো বছর আগের ইতিহাসের পাতা উল্টে একটু দেখি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে বস্ত্রশিল্পে ইংল্যান্ড বাণিজ্যিকভাবে প্রভূত সাফল্য পায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যে এই সময় নীলের চাহিদা বাড়ে। কোম্পানি নীলকর সাহেব নামক ইংরেজ কর্মচারীদের সাহায্যে ভারতের গরিব চাষীদের জোরপূর্বক নীল চাষ করাতো। চাষিরা নীল চাষ করতে রাজি না হলে তাদের ওপর চলত প্রভূত অত্যাচার। মাত্র ২ টাকা দাদন দিয়ে চাষীদের ধান জমিতে জোর করে নীল চাষ করানো হতো। চাষিদের অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরি নীল থেকে মুনাফা লুটতো নীলকর সাহেবরা।

ভারত তথা বাংলা এবং মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায় নীলকুঠি ছিল। নীল চাষিদের উপর অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমাহীন হয় তখন চাষীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয় নীল বিদ্রোহ। তারপর দফায় দফায় দীর্ঘদিন চলে।

চাঁদপাড়ায় ঢুকে স্থানীয় মানুষদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল গলি দিয়ে ঢুকে শেষ প্রান্তে নীলকুঠি। সরু গলি দিয়ে একটু ঘিঞ্জি এলাকায় ঢুকে পড়লো আমাদের টোটো। দু'ধারে বাড়ির চারিদিকে মুরগি ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথাও কোথাও স্তুপাকৃতি আবর্জনা পড়ে। বেশ নোংরা পরিবেশ। গলির একেবারে শেষ প্রান্তে এসে ইঁটের লম্বা চিমনি চোখে পড়ল। স্থানীয় লোকে বলল এই জায়গাটাই নীলকুঠি নামে পরিচিত। যদিও কোন নীল কুঠির অস্তিত্ব আর নেই, সেই সময়কার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে রয়েছে শুধুমাত্র এই নীল জ্বাল দেওয়ার লাল ইটের চিমনিটা। চিমনির মাঝখানে যে বেশ বড় গর্তের মুখ এখানেই নীল জ্বাল দেওয়া হতো। একেবারে কাছে গিয়ে দেখলাম ইটগুলো সংস্কারের অভাবে খসে খসে পড়ছে। কয়েকবার বজ্রাঘাতে এমনিতেই চিমনির উপরের মাথাটা ভেঙে গেছে। প্রায় আড়াইশো বছর আগের গরিব চাষিদের ওপর নীলকরদের নির্মম অত্যাচারের সাক্ষী বহনকারী এই চিমনি আজ নিজেই জরাজীর্ণ, প্রায় ধ্বংসের পথে মৃত্যুর দিন গুনছে। অচিরেই এই ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধটিকে পুরাতাত্ত্বিক বিভাগ থেকে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত বলে আমার মনে হয়। চিমনির পাশ থেকে কিছুটা হেঁটে গেলেই চোখে পড়বে উঁচু ঢিপি। এটাকে নীল পাহাড় বলা হতো। ঢিপির উপর দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালে দেখা যাবে সবুজ সমতল চাষযোগ্য জমি। হয়তো এই গোটা অঞ্চল জুড়েই একসময় নীল চাষ করানো হতো। কোনভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা লাল চিমনি, নীল পাহাড় ও আশেপাশের অঞ্চলগুলি দেখতে দেখতে মনের মধ্যে ভেসে উঠছিল দীনবন্ধু মিত্রের লেখা সেই বিখ্যাত "নীলদর্পণ" নাটকের কিছু বিখ্যাত চরিত্র। নবীনমাধব, তোরাপ, ক্ষেত্রমণি, নীলকর সাহেব আইআই উড... সব চরিত্র যেন চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠছে। বেশ কিছুক্ষণ আড়াইশো বছর

আগের ইতিহাসে বিচরণ করলাম যে ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেক অশ্রুর দাগ, যন্ত্রণা ও অত্যাচারের ক্ষত, অনেক গরীব নীলচাষিদের কান্না ও দীর্ঘশ্বাস।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল রাজবাড়িডাঙ্গা যা রাজা কর্ণের প্রাসাদ নামে পরিচিত। এখানে খনন কার্যের ফলে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ কিছু কিছু মাটির তলা থেকে উঠে আসে। নিতান্ত সাদামাটা ছোটখাটো মফস্বল শহর আজকের কর্ণসুবর্ণ কেমন ছিল রাজা শশাঙ্কের সময় ভাবতে ভাবতে চলেছি। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণতে এসেছিলেন। তার গ্রন্থ 'জিউ জি'-তে তদানীন্তন কর্ণসুবর্ণের একটা রূপরেখা দিয়েছেন। সেই সময় এই নগরীকে "কিলনসুফলন" বলা হত। যথেষ্ট জনবহুল ছিল এই নগর। রাজ্যের পরিধি ছিল ৯০০ মাইল। এখানকার জমি ছিল উর্বর, আবহাওয়া ছিল মনোরম, নাগরিকরা ছিলেন ধনী ও বিদ্যানুরাগী। নগরে বেশ কিছু বৌদ্ধ মঠ এবং মন্দির ছিল। হিউয়েন সাঙ আরও বলেন যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকেও প্রাচীন ও ভারতের সবথেকে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার এই কর্ণসুবর্ণতেই বর্তমান ছিল। ধর্মপ্রচারে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ এসেছিলেন এই কর্ণসুবর্ণতে। এমনকি সম্রাট অশোক এসেছিলেন বলেও জানা যায় হিউ এন সাঙ এর বিবরণ থেকে। সম্রাট অশোক নির্মিত বেশ কিছু বৌদ্ধস্তূপের নিদর্শন পাওয়া যায় এখানে।

কর্ণসুবর্ণের ধ্বংসাবশেষ

বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা মহারাজা শশাঙ্কের রাজধানীর অলিগলিতে ঘুরছি। মনে মনে ভাবছি এক সময় কত সমৃদ্ধশালী ছিল এই রাজধানী শহর, আভিজাত্য ও বৈভবে পরিপূর্ণ ছিল। যার চিহ্নমাত্র আজ আর নেই। মন বারে বারে ঘুরপাক খাচ্ছে ইতিহাসের অলিন্দে প্রায় ১৪০০ বছর আগের অতীতে মহারাজা শশাঙ্কের সময়কালে। শশাঙ্ক প্রথম জীবনে গুপ্ত বংশীয় এক রাজা মহাসেনগুপ্তের অধীনে সামন্ত ছিলেন। পরবর্তীতে গুপ্ত রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে আনুমানিক ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি গৌড়ে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় উত্তর ভারতে যে পাঁচটি বৃহৎ রাজ্যের উত্থান ঘটেছিল সেগুলো হলো মালব, থানেশ্বর, কনৌজ, কামরূপ ও গৌড়। এদের মধ্যে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক তাঁর কূটনৈতিক বুদ্ধি ও রণকৌশল দ্বারা থানেশ্বরের রাজ্যবর্ধনকে পরাজিত ও নিহত করেন ও কনৌজের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। রাজ্যবর্ধনের ভাই ও থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধন ভাতৃহত্যার বদলা নিতে বারবার গৌড় আক্রমণ করলেও শশাঙ্কের জীবদ্দশাতে গৌড় অধিকার করতে পারেননি। শশাঙ্কের রাজ্যের সীমানা উত্তরে তরাই ও দক্ষিণে উড়িষ্যা, দন্ডভুক্তি বা মেদিনীপুর; পশ্চিমে মগধ ও বারাণসী এবং পূবে প্রাগজোতিষপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের ১১ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে, রাঙ্গামাটি ছিল রাজা শশাঙ্কের রাজধানী প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ।

আমাদের টোটো রাজবাড়িডাঙ্গা কর্ণের প্রাসাদের গেটের সামনে থামতেই আমার চমক ভাঙলো। ইতিহাসের পথ পরিক্রমাতে আপাতত বিরতি দিয়ে গেট দিয়ে ঢুকলাম। বিশাল জায়গা জুড়ে মাঠ ঘিরে রাখা হয়েছে। সামনেই রয়েছে পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে লাগানো নীল বোর্ড যেখানে ছোট্ট করে জায়গাটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে এই জায়গাটিকে রাজা কর্ণের প্রাসাদ বলা হচ্ছে। জনশ্রুতি আছে যে মহাভারতের অঙ্গরাজ্যের রাজা কর্ণের রাজত্বের রাজধানী ছিল এটা। প্রায় ৬০ বিঘা জায়গা জুড়ে অবস্থিত এই এলাকাটিতে অনেক জায়গাতেই উঁচু টিপি দেখলাম। ১৮৮২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এস আর দাস এখানে খনন কার্য শুরু করেন। প্রায় কুড়ি বছর ধরে চলা এই খনন কার্যে মাটির তলা থেকে উঠে আসে বৌদ্ধবিহার, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ব্যবহৃত নানা সরঞ্জাম, তামা ও ব্রোঞ্জের বিভিন্ন মূর্তি ও প্রচুর শিলমোহর। খননকার্যের ফলে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের বাসভবন, থাকার বেশ কিছু কক্ষ, পড়ানোর জন্য শ্রেণিকক্ষ, স্নানের জন্য কুয়ো ইত্যাদি ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। হিউয়েন সাঙের বর্ণনা অনুযায়ী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েরও আগে তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর এই বৌদ্ধবিহারই ছিল ভারতবর্ষের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় যার নাম রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার।

ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম মাটির তলা থেকে উঠে আসা বৌদ্ধবিহারের ভগ্নাবশেষ। কোথাও চারদিকের প্রাচীরের অংশবিশেষ, কোথাও ইটের তৈরি গোলাকৃতি বসার স্থান, আবার কোথাও প্রাচীর দিয়ে ঘেরা জায়গা। মনে হয় বৌদ্ধ-ভিক্ষুকদের থাকার কক্ষ ছিল। লম্বা প্রাচীরের একাংশ মাটির তলা থেকে উঠে এসেছে দেখে মনে হচ্ছে যেন রক্ত মৃত্তিকা মহাবিহারের চারপাশে বিশাল জায়গা জুড়ে বাউন্ডারি দেওয়া হয়েছিল। ইটের তৈরি উঁচু বসার জায়গা এক স্থানে দেখলাম। এই উচ্চ স্থানগুলিতে সম্ভবত বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বসে শিক্ষাদান করতেন বলে আমার মনে হল। খননকার্যের ফলে যে ধ্বংসাবশেষ মাটির তলা থেকে উঠে এসেছে সেগুলির স্থাপত্য ও নির্মাণশৈলী একই রকম যার থেকে মনে করা হয় এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার ছিল। কিছুটা দূরে একটা প্রাচীন কুয়ো দেখতে পেলাম। লাল ইটের তৈরি এই কুয়োর নির্মাণশৈলী দেখে মুগ্ধ হলাম। আজও গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। ওর ভেতরে যে রিং লাগানো সেগুলো দেখলাম লোহার। অর্থাৎ তখন নির্মাণ কার্যে লোহার ব্যবহার ছিল। একটা জিনিস দেখে আমার খুব খারাপ লাগল। যে কুয়ো বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের স্নানের অথবা পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত হতো সেই কুয়োর মধ্যে আজ গড়াগড়ি খাচ্ছে জলের বোতল, কাগজের চায়ের কাপ, সিগারেট প্যাকেট আরো কত কি। এখনো

পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় যে উঁচু ঢিপি রয়েছে সেখানে খননকার্য শুরু করলে আরো কত ইতিহাস মাটির তলা থেকে উঁকি দেবে কে জানে? কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বহুদিন আগেই খননকার্য থেমে গেছে। ঢিপিগুলোতে এখন ছাগল চরছে। পুরো জায়গাটা যে রেলিং দিয়ে ঘেরা সেই রেলিংগুলিতে লোকে জামা কাপড় মেলছে। এত গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস আজ এইভাবে অবহেলায় তার গরিমা হারাচ্ছে ভাবতেও কষ্ট লাগছে।

এরপর আমরা গেলাম এখান থেকে পাঁচ সাত মিনিট দূরে রাক্ষসীডাঙ্গায়। জায়গাটার এমন অদ্ভুত নাম কেন বোধগম্য হলো না। সত্যিই কি কোন রাক্ষসীর বসবাস ছিল নাকি!

সামনের বিরাট উঁচু জায়গা জঙ্গলে ভরে গেছে। স্থানীয় লোকেরা জানালো, এই জায়গাটিকেই রাক্ষসীডাঙ্গা বলে । এখানেও খননকার্য হয় ও ভগ্ন প্রাচীর, বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। বেশ কিছুটা হেঁটে উঁচু জায়গায় উঠে দেখলাম জঙ্গলের মাঝে ভাঙ্গা দেওয়াল উঁকি মারছে। স্থানীয় মানুষদের কাছে জানলাম যে বহুদিন থেকেই জায়গাটা এভাবেই পড়ে আছে। প্রথম প্রথম কিছুদিন খননকার্য হয়েছিল তারপর বহু বছর আর সরকার থেকে জঙ্গল পরিষ্কার করা বা খননকার্য শুরু করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। উঁচু ঢিপি থেকে নেমে দেখলাম এক বহু প্রাচীন ঝুড়িযুক্ত প্রায় অথর্ব বটগাছ। বৃদ্ধ বটগাছের গায়ে কান পাতলে হয়তো শশাঙ্কের সময়ের ইতিহাসের অনেক কথাই জানা যাবে। এই বটগাছের পাশেই রয়েছে একটি মাজার। মজারটি কত পুরনো কেউ বলতে পারল না। এখানকার স্থানীয় লোকেরা তাদের জন্ম থেকেই দেখছে। মাজারের অপরদিকে তৈরি হয়েছে, ঈদগা। এটি অবশ্য বেশি পুরনো না , নতুন তৈরি হয়েছে দেখলেই বোঝা যায়।

দিন শেষ হয়ে আসছে, আমাদের এবার স্টেশনের দিকে যেতে হবে বাড়ি ফেরার জন্য। অপরাহ্ণের শেষ আলোটুকু গায়ে মেখে আমরা টোটোতে উঠে বসলাম স্টেশনে যাবার জন্য। মন বিক্ষুব্ধ হয়ে রইল এটা ভেবে যে ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে এবং যে জায়গা বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা শশাঙ্কের রাজধানী সেই গৌরবান্বিত ঐতিহাসিক জায়গার প্রতি পুরাতত্ত্ব বিভাগের এত উদাসীনতা কেন? এখনো যদি রাজবাড়িডাঙ্গার ঢিপি বা রাজা কর্ণের প্রাসাদ বলে অভিহিত ইতিহাসের ধুলো মাখা এই জায়গাটি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা, ও আবার খননকার্য শুরু করা না হয় তাহলে ইতিহাস ধীরে ধীরে অপসৃয়মান হয়ে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। শশাঙ্কের রাজধানী শুধুমাত্র কাপড় মেলা ও গরু ছাগল বিচরণের জায়গা হিসেবে রয়ে যাবে। আগামী প্রজন্ম হয়তো জানবেই না ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার বা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণর কথা। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মহারাজা শশাঙ্কের রাজধানীকে বিদায় জানিয়ে ট্রেনে উঠে বসলাম। মনের কোণে কোথাও ক্ষীণ আশা রইল যে হয়তো আবার খননকার্য শুরু হবে, মাটির তলায় চাপা পড়া ইতিহাসেরা বন্দী দশা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বমহিমায় বিরাজমান হবে। বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা শশাঙ্কের রাজধানী তার যথাযথ মর্যাদা ফিরে পাবে।

- পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রামের জঙ্গল মহল থেকে ৮০০ কিমি দূরবর্তী মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড়ের জঙ্গল থেকে ৪০০ কি.মি দূরবর্তী ঝাড়খণ্ডের পালামৌর জঙ্গল হয়ে একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘ ১৯১৮-র শীতের শেষে ঝাড়গ্রামের জঙ্গল মহলে চলে আসে। বেশিরভাগ সময় সেখানকার বিভিন্ন জঙ্গলে এবং কিছুটা সময় বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে প্রায় দু'মাস থেকে যায়। এই সময় সে কোন মানুষকে আক্রমণ করেনি। বন দপ্তরের ব্যর্থতায় স্থানীয় মানুষ লালগড়ের জঙ্গলে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে।
- এরপর ২০২৪-র ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের তাদোবা অরণ্য থেকে ওড়িশার সিমলিপাল অরণ্যে পুনর্স্থাপন করা একটি তিন বছরের বাঘিনী সিমলিপাল থেকে ২০০ কিমি পথ হেঁটে নদী সাঁতরে ঝাড়গ্রামের জঙ্গল মহলে চলে আসে। তারপর বনদপ্তরের তাড়া খেয়ে বেলপাহাড়ি হয়ে প্রথমে পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের পাহাড়-জঙ্গলে। তারপর বাঁকুড়ার ঝাঁটি পাহাড়ি হয়ে রানিবাঁধের গোসাঁইডির ঝোপে ১০ দিন পর ধরা পড়ে। এই বাঘিনীকে অনুসরণ করে আরেকটি যে বাঘ এসেছিল তাকে নিয়ে কিছু জানা যায়নি।
- সাত বছর পর বাংলা আবার সন্তোষ ট্রফি জিতল। ৭৮ বারের মধ্যে ৩৩ বার। হায়দ্রাবাদ অনুষ্ঠিত জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলা ১-০ গোলে কেরলকে হারায়।
- দিল্লি থেকে জম্মু এবং তারপর উধমপুর—শ্রীনগর হয়ে বারামুলা অবধি রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠল। জম্মু থেকে বারামুল্লা পর্যন্ত এই রেলপথ বহু টানেল ও ব্রিজের উপর দিয়ে গিয়েছে, তার মধ্যে ৩৫৯ মিটার উচ্চতার চেনাব বা চন্দ্রভাগা সেতু এক ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময়। এবার উত্তর রেলের ফিরোজপুর ডিভিশনকে ভেঙ্গে ৬৯ তম ডিভিশন হল জম্মু ডিভিশন।
- ২০২৩-এ শুরু হওয়া আইসিসি অনুর্ধ্ব ১৯ মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০২৫-এ মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টুর্নামেন্টেও ভারত গোঙ্গাজি তৃষার নেতৃত্বে বিজয়ী হয়। সর্বোচ্চ ১৭ উইকেট পান ভারতের বৈষ্ণবী শর্মা।
- 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশানাল' দুর্নীতি নিয়ে যে সমীক্ষা চালিয়েছে তাতে সবচাইতে দুর্নীতিমুক্ত দেশ ডেনমার্ক, তারপর ফিনল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর, নিউজিল্যাণ্ড, লুক্সেমবার্গ, নরওয়ে, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, দ্য নেদারল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া। কানাডা ও জার্মানি ১৫, ভূটান ১৮, জাপান ও যুক্তরাজ্য ১৯। চিন ৭৫, ভারত ৯৬ (গতবার ছিল ৯৩)।
- সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক খননে দেখা গিয়েছে যে দক্ষিণ তামিলনাড়ুর শিবাপালাই, আদিচানাল্লুর, পেরানগালুর প্রভৃতি অঞ্চলে ৩৩৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দের সিন্ধুসভ্যতার সমসাময়িক যে সভ্যতার নিদর্শনগুলি পাওয়া যাচ্ছে তাতে লোহাগলানোর ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন লোহার তৈরি সরঞ্জাম পাওয়া গেছে।
- তিস্তার হড়পা বানে অক্টোবর ২০২৩-এ সিকিমের প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেইসময় তিস্তা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত তিস্তা-৩ বাঁধটি প্রবল জলের তোড়ে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ধুয়ে মুছে যায়। ভাল করে খতিয়ে না দেখে এবং কোন জনশুনানি না করে কেন্দ্র সরকার ঠিকাদার সংস্থাকে সেখানে পুনরায় বাঁধ নির্মাণের ছাড়পত্র দিল।
- ভারতীয় বন সর্বেক্ষণ ২০২৩-র দ্বিবার্ষিক রিপোর্টে জানিয়েছে যে ২০২১ এর তুলনায় 'বন আচ্ছাদন' বা 'ফরেস্ট কভার' ১৫৬ বর্গ কিমি বেড়েছে এবং 'ট্রি কভার' বা 'বৃক্ষ আচ্ছাদন' ১২৮৯ বর্গ কিমি বেড়েছে। অথচ ৩৯১৩ বর্গ কিমি ঘন জঙ্গল ধ্বংস হয়ে গেছে। ইনডিজেনাস ফরেস্ট নষ্ট করে মনোকালচার ফরেস্ট কভার করা হচ্ছে।

চিঠিপত্র, রিপোর্ট

তিলোত্তমার প্রতি অত্যাচার ও হত্যার বিচার চাই: নাগরিক মঞ্চ

"অন্যায় যখন নিয়ম হয়ে যায়
প্রতিবাদ তখন কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়"

"যখন জনতা অত্যাচারিত হয়, যখন নিজেরা ছাড়া তাদের আর কেউ থাকেনা; তখন যে অভ্যুত্থানের ডাক দেয় না, সে ক্লীব। যখন আইন লঙ্ঘিত হয় এবং স্বৈরাচার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখনই জনতার অভ্যুত্থানের সময়। সেই মুহূর্ত এসেছে"

রোবেসপিয়ার ২৬ মে ১৭৯৩

কলকাতার আর জি করে তিলোত্তমা বা অভয়া কে ৮-৯ আগস্টের মাঝরাতে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়।

সারা দেশে ধর্ষণ করে হত্যার ঘটনা একেবারে অপরিচিত নয়। তথ্য বলছে (এন সি আর বি) নারীর প্রতি অপরাধ, ২০১১ (২ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৫০) থেকে ২০১৫ পর্যন্ত (৩,০০,০০০)। বেড়েছে প্রায় ৩০ শতাংশের বেশি! ২০২০ তে (৩ লক্ষ ২১ হাজার ৫০৩) ও ২০২১ (৪ লক্ষ ২৮ হাজার ২৪৮), ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি!

এন সি আর বি তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালে দেশে ৩১ হাজার ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, এর মধ্যে ধর্ষণ ও খুন একসঙ্গে হয়েছে ২৪৮টি। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ৮৫টি, প্রতি ঘণ্টায় ৪টি। এই তথ্যটি কেবলমাত্র পুলিশের কাছে নথিবদ্ধ অপরাধ। এর বাইরে বাস্তবটা আরও কত ভয়ানক।

ধর্ষণের কোনো সাক্ষী সাধারণত থাকে না। ধর্ষিতা নারী নিজেই কেবল তার সাক্ষী, তাই তার মুখ যদি চিরদিনের মতো বন্ধ করা যায়, তাহলে ধর্ষকের সুবিধা। তাই ধর্ষিত নারীর হত্যার সংখ্যা বাড়ছে। কলকাতার ঘটনাতেও সেটাই হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে বলতে হবে তিলোত্তমার ঘটনা বিরল থেকে বিরলতম! অনেকে তিলোত্তমার ঘটনার সঙ্গে দিল্লির বারো বছর আগে ঘটে যাওয়া নির্ভয়া কান্ডের তুলনা করছেন, যদিও নির্ভয়া থেকে তিলোত্তমার ঘটনা অবশ্যই অনন্য। "তিলোত্তমা"কে কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা দিতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ ছিলো।

তিলোত্তমা একজন চিকিৎসক, স্নাতকোত্তর স্তরে আর জি কর হাসপাতালে ছিলেন তিনি। সরকারি হাসপাতালের আওতায় কর্তব্যরত অবস্থায় ধর্ষিত হয়ে খুন হতে হলো তাঁকে! হাসপাতাল প্রথম থেকেই টালবাহানা করছিলো। মা বাবাকে মিথ্যা খবর দেয় তারা। প্রথমে অসুস্থ তারপর আত্মহত্যা, পরে অস্বাভাবিক মৃত্যু, তারপর হত্যার কেস দায়ের করে। মা বাবাকে কয়েক ঘণ্টা বসিয়ে রেখে মেয়ের কাছে যেতে না দিয়ে অনেকে ভিড় করে থাকেন সেমিনার রুমে, এটাই অভিযোগ। পরে তিলোত্তমার গাড়িটি ভাঙচুর এর চেষ্টা করা হয়। প্রশ্ন উঠেছে সেটা প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা কিনা। আরো প্রশ্ন উঠেছে ধর্ষণ ও হত্যা সেমিনার হলেই কি সংঘটিত হয় নাকি অন্যত্র? পুলিশ তাড়াহুড়ো করে পোস্টমর্টেম করে তিলোত্তমাকে পুড়িয়ে দেয়। পোস্টমর্টেম প্রক্রিয়াতে অনেক ফাঁক থেকে যায় বলেই মনে করা হচ্ছে। অকুস্থলে অনেক জরুরি আসল প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে। মৃতার শরীর থেকে মেটেরিয়াল এভিডেন্স সংরক্ষণ করা হয়নি। মৃতার বাবার অভিযোগ তাঁকে টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেন দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার। কোর্টের নির্দেশে ঘটনার পাঁচ দিন পর সিবিআই কেসটি গ্রহণ করে। সন্দেহ, ততক্ষণে পুলিশ আরো প্রমাণ লোপাট করতে পেরেছে।

তিলোত্তমার ধর্ষণ ও হত্যা মেয়েদের অধিকার, বিশেষ করে নিজের শরীরের ওপর অধিকারকে সামনে আনলো। তাঁরা রাত দখলের সিদ্ধান্ত নিলো। ১৪ আগস্ট রাত দখল হলো। বেরোলো মিছিলের পর মিছিল। স্বাধীনতা দিবসের আগের রাত মেয়েদের অধিকারের দাবিতে মুখরিত করলো গোটা রাজ্যের শহর, শহরতলীকে। শুধু চিকিৎসকরা নন সাধারণ মানুষের স্বরও মিশে গেলো আর জি কর এর সঙ্গে। 'We want justice' স্লোগান শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো। পুলিশ একজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া কিছুই করে উঠতে পারেনি। পরবর্তীকালে সিবিআই গ্রেফতার করতে শুরু করে। আর জি কর কলেজের সুপার, টালা থানার ওসি গ্রেপ্তার হন। হাইকোর্ট থেকে কেসটি এখন সুপ্রিম কোর্টে চলে গেছে, শুনানি চলছে।

সিবিআই কোর্টকে জানিয়েছে এটি একটি 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র'। ইতিমধ্যে সাতজনের পলিগ্রাফ টেস্ট হয়েছে, তার ভেতর তিনজন জুনিয়র ডাক্তার। অভিযোগ সুপার অনেক কায়দায় টাকা তুলতেন। ফেল করা ছাত্রদের পাশ করিয়ে দিয়েও টাকা নিতেন। সন্দেহ, তিলোত্তমার কাছেও টাকা চাওয়া হয়েছিলো, সেটা না দিতে চাওয়ায় আর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এই দুর্নীতির খবর জানিয়ে দেওয়ার ভয় দেখানোয় এই পরিণতি।

গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গের মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থা সহ গোটা স্বাস্থ্য প্রশাসন অনেক নিচে নেমে গেছে। একজন চিকিৎসক এর পর্যবেক্ষণ, প্রথম বছর থেকেই মেডিক্যাল ছাত্র ছাত্রীদের হুমকি দেওয়া, মদ, র‍্যাগিং এর সংস্কৃতি হস্টেলে হস্টেলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বলা হয় (কাজেও করে দেখানো হয়) পড়াশোনার দরকার নেই, স্ফূর্তি লোটো, টুকলি করো। প্রাকটিক্যাল ও ভাইবায় ৫/১০ পেলেও পাশ করিয়ে দেওয়া হবে। ভর্তির সময় ছাত্রদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা আদায় করা হয়। যে পরীক্ষক শিক্ষক মেরুদন্ড সোজা করে কাজ করতে চেয়েছেন তাঁদের জন্য আছে হুমকি, কাজ না হলে দূরবর্তী স্থানে বদলি করা। অভিযোগ কয়েক মাস আগে ডিএম ই (ডাইরেক্টর অফ মেডিক্যাল এডুকেশন) পরীক্ষক-শিক্ষকদের ফোন

করে ছাত্রদের নামের তালিকা দেন এবং বলেন ৭৫ শতাংশ নম্বর দিতে। আরো অভিযোগ হলো হাউস স্টাফশিপ নিয়েও টাকার খেলা চলেছে, হেলথ সার্ভিস ও মেডিক্যাল এডুকেশন সার্ভিসে নিয়োগ, বদলি, প্রমোশন নিয়ে 'মাৎস্যন্যায়' এর মতো অবস্থা চলছে। অভিযোগ এই বিষয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়।

রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সহ সদস্যেরা সিন্ডিকেট করে এই দুর্নীতিতে যুক্ত। আর জি কর এর ঘটনা এই হিমশৈলের চূড়া মাত্র (প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী জুনিয়র ডাক্তারদের স্বাস্থ্য ভবনের ধর্না অবস্থানে গিয়ে জানিয়েছেন তিনি সমস্ত হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙ্গে দিলেন। এবং আগামী দিনে সুপারদের চেয়ারম্যান করে ডাক্তার সহ সব স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতিনিধি এবং পুলিশ প্রতিনিধিদের নিয়ে এই রোগী কল্যাণ সমিতি গঠন করা হবে)।

১৪ আগস্ট রাত দখলের পাশাপাশি বিশেষ ঘটনা হল আর জি করে সন্ত্রাস চালানো। যার উদ্দেশ্য ছিল হত্যার অকুস্থলে সমস্ত প্রমাণ মুছে ফেলা ও আন্দোলনকারীদের সন্ত্রস্ত করা। যেমন সেমিনার হলের দেওয়াল ভেঙ্গে দেওয়া। আর জি করে যেমন জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি চলছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শুরু করেছেন অভয়া ক্লিনিকও। জেলাতেও হাসপাতালগুলিতে জুনিয়র ডাক্তাররা কর্ম বিরতিতে আছেন। রাস্তায় মিছিল বেরোচ্ছে রোজ। সরকারি বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক কর্মীদের, বিভিন্ন পেশার মানুষের, জনসাধারণের। বলা যায় জনজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। সবই হচ্ছে 'তিলোত্তমা' বা 'অভয়ার' বিচার চেয়ে।

এদিকে কয়েকটি সমীক্ষার ফলাফল আমাদের একই সঙ্গে বিস্মিত ও বিমর্ষ করে, আই এম এর সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতের ২২টি রাজ্যের মহিলা চিকিৎসক মনে করছেন তাঁরা রাতের শিফটে নিরাপদ নন, মহিলা চিকিৎসকদের নিয়ে করা ২০২২ এর একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ৭০ শতাংশ মহিলা চিকিৎসক কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার শিকার হন। ৮৯.৫ শতাংশ কর্মক্ষেত্রে নিজেদের নিরাপদ বোধ করেন না। ৩১ শতাংশ অপারেশন থিয়েটারে যৌন হেনস্থার শিকার হয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নবান্ন থেকে দশ দফা দাওয়াই দিয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছে রাতের ডিউটি থেকে মহিলাদের যথা সম্ভব বিরত রাখার কথা, প্রশ্ন উঠেছে রাতে বা দিনে কাজ করাটা মেয়েদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। রাতে কাজ বন্ধ করার মানে মেয়েদের কাজ চলে যাওয়া।

সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মেনে বিশাখা কমিটি গঠনের কথাও বলা আছে। সরকারের ন্যূনতম জ্ঞান নেই যে বিশাখা কমিটির অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। ২০১৩ সালে এটি POSH আইনে রূপান্তরিত হয়েছে। ICC এবং LCC গঠন করা বাধ্যতামূলক হয়েছে। এগারো বছর আগের আইন এই রাজ্যে হাসপাতাল, সংস্থায়, কারখানা, চা বাগান কোথাও কার্যত বলবৎ হয়নি। আর এক্ষেত্রে বলতেই হয় যে রাতে মহিলাদের কাজ না দেওয়ার ঘোষণা লিঙ্গ বৈষম্যের পক্ষে এবং নারী স্বাধীনতার বিরোধী। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একজন নারী হওয়া সত্ত্বেও এই ঘোষণা আমাদের বিস্মিত করে।

যদিও সুপ্রিমকোর্ট সম্প্রতি এক শুনানিতে নির্দেশিকার এই দুটি বিষয়কে বাতিল ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী, ও মুখ্যসচিবের সঙ্গে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের আলোচনায় দাবিগুলির আংশিক কয়েকটি মিটেছে, কিন্তু এখনও তিলোত্তমার বিচার হয়নি। থ্রেট সিন্ডিকেট হাসপাতালে যে বা যাঁরা চালাচ্ছেন তাদের উপযুক্ত সাজা হয়নি, শুধুমাত্র আশ্বাস পাওয়া ছাড়া। সরকারের কাছে হাসপাতালে সুরক্ষা ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা কায়েম করার দাবি ছিলো। এক্ষেত্রে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, কমিটি তৈরি হবে, ইত্যাদি। এই সব নিয়েই আংশিক দাবি পূরণ হয়েছে জানিয়ে আংশিক কর্ম বিরতি তুলে নিয়ে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে জুনিয়র ডাক্তাররা হাসপাতালে কাজে ফিরছেন। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, স্বাস্থ্য ভবনের সামনে থেকে ধর্না তুলে নিলেও হাসপাতালে অবস্থান চলবে। অভয়া ক্লিনিক দুর্গত অঞ্চলে করা হবে। সুপ্রিম কোর্টে আইনি লড়াই চলবে। রাস্তার আন্দোলন জারি থাকবে।

প্রশাসন কখনও নিপীড়কের ভূমিকা নিচ্ছে, কখনও ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছে কিন্তু পারছে না। বলা যায় প্রশাসন বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। তিলোত্তমার ধর্ষণ ও হত্যা অনেক কিছু বুঝিয়ে দিয়ে গেলো। অন্যায় যখন নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়, প্রতিবাদ তখন কর্তব্য হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ বাংলার মানুষ জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, পেশা নির্বিশেষে জনগর্জন সৃষ্টি করলেন, যা বাংলা বহু দশক প্রত্যক্ষ করেনি।

এটা পরিষ্কার আর জি কর কাণ্ড সাধারণ অপরাধীদের দ্বারা সংগঠিত হয়নি, ধর্ষণ খুন কোনো ব্যক্তিকে নয়, রাষ্ট্র সমাজকে করেছে।

আরও বলতে হয় এই ঘটনা সমাজের সর্বস্তরে যে গণজাগরণ ঘটিয়েছে বিশেষ করে মেয়েদের অংশগ্রহণ, তাকে শান্তিপূর্ণ গণঅভ্যুত্থান বলতে দ্বিধা নেই।

নাগরিক মঞ্চ

২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

- কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ঈশান চট্টোপাধ্যায় থিওরেটিকাল কম্পিউটার সায়েন্সে যৌথভাবে ২০২৫ সালের গোডেল পুরস্কার পেলেন
- ভারতীয় বংশোদ্ভুত ৩৩ বছর বয়সী বামপন্থী মার্কিন রাজনীতিক জোহরান মামদানি নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনের প্রাথমিকে জিতে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন
- বিশ্বকাপ দাবার ফাইনালে দুই ভারতীয় মহিলা দাবাড়ু দিব্যা দেশমুখ ও কানেরু হাম্পি উঠে নজির সৃষ্টি করলেন

সীমাহীন অন্যায়, দুর্নীতি আর অপরাধের চক্রটিকে উপড়ে ফেলুন

DOCTORS FOR DEMOCRACY

অভয়া আন্দোলন দৃঢ়ীকরণের উদ্দেশ্যে আহূত গণ-কনভেনশন

২৩শে জানুয়ারি ২০২৫ মৌলালী যুব কেন্দ্র, কলকাতা

এখনও পর্যন্ত মানুষ জানতেই পারল না সত্যিটা কী। তবু বিচার সম্পন্ন হয়ে গেল। এবং ঘটনার প্রায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে বহু অসঙ্গতি রেখে কলকাতা পুলিশের দ্বারা গ্রেফতার হওয়া যে সঞ্জয় রাইকে কোনো তদন্ত ছাড়াই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ফাঁসিতে চড়িয়ে দিতে বলেছিলেন প্রায় তাতেই সিলমোহর দিতে বিচারের বাণী ঘোষণা নিশ্চিত করল কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত দেশের সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে এই অভূতপূর্ব গণ-আন্দোলন সত্ত্বেও

- কেন দেশের প্রধানমন্ত্রী কোনো উদ্বেগও ব্যক্ত করলেন না?
- কেন রাষ্ট্রপতি একবার উদ্বেগ ব্যক্ত করেও পরে চুপ!
- কেন হাই কোর্টের হাত থেকে সুপ্রিম কোর্টে সুয়ো মোটো করে কেসটা তুলে নিয়ে যাওয়া হল?
- কেন সিবিআই-র প্রাথমিক স্ট্যাটাস রিপোর্ট পড়ে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন মাননীয় প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় স্তম্ভিত হলেন! কিন্তু প্রতিকারে উদ্যোগী হলেন না?
- কেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যে এসেও অভয়ার বাবা মার দেখা করার আবেদনে সাড়া দিলেন না?
- কোন মন্ত্রবলে সিবিআই-র এতো করুণ দশাপ্রাপ্তি ঘটলো?

আর, সর্বোপরি একটা খুন ধর্ষণের অতি সংবেদনশীল কেসকে রাজ্য প্রশাসন কেন প্রকৃত ঘটনা উন্মোচনের পরিবর্তে সর্বশক্তি নিয়োগ করলো প্রমাণলোপের কাজে?

আমরা সত্যিই জানিনা কী করে সঞ্জয় একাই মুখ চেপে, গলা টিপে, সারা দেহে ২৫টির বেশি মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি করে, খুন ও ধর্ষণ করে ফেললো, কেনই বা সঞ্জয় নিজের সপক্ষে বারবার কিছু বলবে বলেও চুপ করে রইলো।

ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের সমাধান, অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর অজানা রয়ে গেল; অনেক বিস্ময়ের নিরসন হল না। বরং আজ জনমানসে জলের মত পরিস্কার হল যে হতভাগিনী বা তাঁর মা-বাবা বড়ই দুর্বল; বিপরীতে প্রকৃত অপরাধীরা ব্যাপক প্রভাবশালী। অথবা তাদের কান টানলে টলে যেতে পারে অনেক বড় প্রভাবশালী মাথা। তাই যে ভয়ঙ্কর দুর্নীতির চক্রজাল আজ সর্বত্র বিরাজমান, ''থ্রেট কালচার'', আর প্রমাণ-লোপাটে যারা সিদ্ধহস্ত তাদের অতি দূর অবধি বিস্তৃত হাত সবটুকুই সাজিয়ে নিয়েছে। আদালতের চোখ বাঁধা কালো কাপড় খুলে দিলে কী আর হবে।

তবে সমস্ত চূড়ান্ত অস্বচ্ছতার মধ্যে আরও যেটা মানুষের কাছে আজ প্রখর দিবালোকের মতো পরিষ্কার তা হলো, এ সমস্ত কিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে এক বিশাল দুর্নীতিচক্র, যাকে কোনোভাবেই বিন্দুমাত্র বিচলিত করা সম্ভব হয়নি কেন্দ্র বা রাজ্যের কোনো সংস্থার দ্বারা। খুন, জখম, জাল/ নিম্নমানের ওষুধ, তদন্তে গুরুতর হস্তক্ষেপ, ব্যাপক থ্রেট কালচার, ট্রান্সফার-পোস্টিংয়ে সম্পূর্ণ অরাজকতা: সমস্ত কিছুর উৎসমুখ একটাই, এক ব্যাপক অনন্ত ক্ষমতাশালী সংগঠিত দুর্নীতিচক্র। অভয়া'র মৃত্যু, হাসপাতালে ওষুধ ও সরঞ্জামে বিশাল দুর্নীতি, মেডিকেল শিক্ষায় অভূতপূর্ব নৈরাজ্য সবই তাই একসূত্রে বাঁধা। স্বাস্থ্যদপ্তরকে পরিণত করা হয়েছে প্রায় মাফিয়াদের মুক্তাঞ্চলে!

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসকদের শাস্তিপ্রদানের এক ও একমাত্র কারণ হলো, প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনা ধামাচাপা দিতে না পারা। এই ধরনের ঘটনা আগেও বারেবারে ঘটলেও কেন এবারে তা প্রকাশ্যে এলো। স্বাস্থ্য দপ্তরের এখন মূল কাজই হলো যাতে কখনো কোনো সত্যই সামনে আসতে না পারে। সমগ্র প্রশাসনের বর্তমানে একটাই লক্ষ্য, দুর্নীতির কোনো তথ্যই যেন প্রকাশ্যে না আসে।

সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে নিজেদের মত করে সাজিয়ে নিতে পেরে উল্লসিত প্রভাবশালীরা এবার স্বমহিমায় নেমেছে প্রতিবাদী সংহারে। হাসপাতাল ডিউটি রুমে তরুণী চিকিৎসক খুনের পর সংশ্লিষ্ট প্রিন্সিপাল পদত্যাগ করতে চাইলেও যেখানে তাকে সম্মানজনক বদলিতে পুনর্বাসনের আদেশনামা জারি হয়, সেখানে সন্দেহজনক 'স্যালাইন' রোগীর মৃত্যুতে কাঠগড়ায় ওঠা সত্ত্বেও তাকে আড়াল করে আসামী বানানো হয় চিকিৎসকদের। যাঁরা নিজেদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন বলেই পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে প্রমাণিত।

আসলে রাষ্ট্রযন্ত্র ভয়ঙ্কর শক্তিশালী। স্বৈরাচারী, আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত শাসকের হাতে তা আরও ভয়াবহ। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে বনের বাঘ ভয়ঙ্কর শক্তিশালী হলেও (যদিও দুরভিসন্ধিমূলক কুটিল ষড়যন্ত্রী কখনই নয়) ক্ষুদ্র প্রাণী ভীমরুলকে বড় ভয় পায়। কারণ, ভীমরুল যখন তেড়ে আসে কখনোই একা আসে না, ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। দিকে দিকে ভীমরুলের মত চাক তৈরি করে আমাদের মত 'এককভাবে শক্তিহীন' এই জনগণকেও তেমনই এই প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে তেড়ে যেতে হবে। মতামতের ভিন্নতায় শত সহস্র শব্দ উঠুক, কিন্তু মিলিত ভাষ্য যেন ভীমরুল পালের 'ভোঁ ভোঁ'' শব্দের মত একই হয়-সত্যের প্রকাশ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।

দুর্নীতির অপনোদন ও প্রতিহিংসার নির্বাসন।

শিয়ালদহ কোর্টে মামলার ফয়সালার পরে এই প্রশ্নটাই তাই অতি তীক্ষ্ণভাবে উঠে এসেছে, 'What's next'? 'এর পরে কী? আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে? 'অভয়া'র বিচারের দাবিতে এযাবৎ আমাদের আন্দোলন, পথচলা সবেতেই আমরা প্রাণপণ একটাই

চেষ্টা করেছি, সেটা হলো ঘটনার প্রকৃত সত্যের উদ্‌ঘাটন। আর, প্রকৃত সত্যের উন্মোচন সম্ভব না হলে সুনির্দিষ্টভাবে আসল অপরাধীদের চিহ্নিতকরণ ও বিচার তো চিরকালই রয়ে যাবে অধরা।

বস্তুত, এ ছাড়া কোনো পথ বা বিকল্পও আমাদের জানা নেই।

যতদিন না এই দুর্নীতির মূলচ্ছেদ করা যাবে, যতক্ষণ না গ্রিক পুরাণের হাইড্রার আসল মাথাটাকে অপসারণ করা যাবে, ততদিন এই লড়াই-এর কোনো বিরতি নেই, বিরামের অবকাশও নেই।

মার্টিন লুথার কিং এর একটা প্রিয় কবিতার লাইন ছিল Truth crushed to earth will rise again. ভূলুণ্ঠিত সত্যকে তুলে ধরা, এটাই চিরকাল সব প্রতিবাদীদের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য।

এই মুহূর্তে এই কনভেনশন থেকে আমাদের দাবি,

১) 'অভয়া'র মৃত্যুর জন্য দায়ী সমস্ত অপরাধীদের চিহ্নিতকরণ ও শাস্তি

২) সমস্ত ধরনের দুর্নীতির মূলচ্ছেদ

৩) জাল ও নিম্নমানের সমস্ত ওষুধের উপর নিষেধাজ্ঞা

৪) সমস্ত ধরনের 'থ্রেট কালচার' এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

৫) মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদের উপর থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে সমস্ত বিষয়টা নিরপেক্ষ/বিচার বিভাগীয় তদন্তের আওতায় নিয়ে আসা।

একসময় বিশালাকার এই গণ আন্দোলনে কখনও কোনও ভাবে অংশগ্রহণকারী একজনও সঙ্গী বা সমষ্টি কোনও রকম মনোমালিন্যে যাতে আন্দোলন ছেড়ে না যান তা সুনিশ্চিত করতে এবং এক সময় প্রবলভাবে আলোড়িত হওয়া অতিদরিদ্র, দীন-হীন মানুষও যাতে নিজের মত করে তাঁদের সুবিধা অনুযায়ী নানাভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারেন তাও নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই কনভেনশন। স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিতে নিমজ্জিত শাসক এবং তাদের মদতদাতা ছাড়া সকলকে বন্ধু করে যেন আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারি, সেই আহ্বানেই এই গণ-কনভেনশন।

আমাদের জাগ্রত চেতনা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, একনিষ্ঠতা, সততা, অচ্ছেদ্য সংঘবদ্ধতার সম্মিলিত রূপেই আসবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। এই গণ-কনভেনশন হোক সেই সত্যের ও বীর্যের অগ্নিশুদ্ধ অভিষেকের মাহেন্দ্রক্ষণ।

আজি ''অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে...''

সার্বিক সহযোগে নবপর্যায়ে উত্তুঙ্গ আন্দোলনের মহাসূচনা করুক এই গণ-কনভেনশন।

শুধু আজকেই নয়, আগামী দিনেও মানুষের মনের গহীন অন্তর থেকে উঠে আসা আন্দোলনে সর্বাত্মক অংশগ্রহণের আন্তরিক আহ্বান জানায় এই গণ-কনভেনশন।

A Concept Paper on 'Break The Nexus of Rampant Corruption and Crime.'

[On the auspicous day of Netajee's Birthday on 23.01.2025 this was submitted to the convention organised by the Doctors for Democracy]

Preamble: ECONOMY is a pivotal force of a state and its society. When the state and its society and their economy have been languishing in poverty, dearth, disparity, mal-distribution, melt down, slump, slackening, depression etc.; when demand surpasses supply and at the time of crises like war, endemic, political unrest and anarchy, communal and ethnic clashes, major partition and displacement, ethnic cleansing, overcrowding, natural and man made disasters, pandemic, ill governance et al, CORRUPTIONS INCREASE. AND CORRUPTION ALWAYS INVITES CRIMES, ITS NATURAL ALLY. It happens in INDIA and it's constituent province WEST BENGAL by transferring its inbuilt corruptions and crimes from the Imperialist British Rulers to its successors, the big crony capitalist industrialists, businessmen, brokers, upper caste land lords, bureaucrats and their political representatives from INC to BJP to Regional Ruling Political Parties and Forces through the 77 years after transfer of power, from Nehru's 'Independence' up to Modi's 'Amritkal'. HEALTH is a crucial component of a society and state and naturally the all pervading corruptions and crimes have grabbed it.

Present Situation: Though the Indian state is spending around meager 1.8% of its GDP in **health budget** but including private health business it is around 6% of GDP. Out of the government budget most of the exchequer was lost by unnecessary cut-money centric construction and by procurement of cut-money centric spurious medicines, equipments, consumables and logistics. Out of private expenditure most are wasted on

inflated bills and over treatment, shares of brokers, insurance companies, health businessmen and doctor sharks resulting **highest out of pocket expenditure and pauperization from treatment among the world population**. And the whole system and mechanism, the governments and the administrations, the community and the individuals, the course curriculum training grooming and practice are running behind them. In the Nehruvian Socialist Mixed Economy the monster was nascent, it woke up in Indira regime. It flies freely at the time of Narashimha - Manmohan liberalization and sways at the time of Modi-Mamta. The transformation of **Government Based Free Health System for All** after the **massive privatization, commercialization and corporatization** became **Private Based Costly Treatment Business for Few vis a vis rampant corruptions and crimes spread. Dr. Amal Sardar, Dr. Tilottoma** and others are victims of this nefarious corrupted health system.

Now where and how to break the chain?

(1) **The Health System** should be revoked and reorganised into the **Government Controlled Expert Managed Free Health System for All** and just spending 0.5% more GDP with judicious utilizations **Universal Health Coverage** can be implemented emphasizing **Basic and Primary Health**.

(2) For all **constructions and procurement** the existing dishonest politicians health mafias— government agencies - contractors nexus are to be demolished and transparent, digital, nation / state wise, judicious processes are to be introduced with **people's surveillance** (actually who gives the money) and monitoring by the experts.

(3) From entrance to final **all examinations should be free and fair**.

(4) **Government Health and Medical Education Services must be strictly non - practicing including private tutoring**.

(5) There should be **scientific, judicious and rational Transfer and Promotion Policies** and no one will be allowed to stay in a post and place more than three years.

(6) Removing all adhocism and nepotism **all engagement processes will be through PSC with regular basis and adequate replenishment of vacant posts**.

(7) **Adequate facilities and remunerations are to be provided for all categories of health personnel**.

(8) Dumping the partisan corrupted **'Rogi Kalyan Samity'** models of Left Front and Trinamul Congress the RKSs from the Sub-centres to the Apex Hospitals and Medical Colleges will be reconstituted **comprising representation of all categories of health personnel of that institute/unit and local community by democratic election**.

(9) The **entire courses and curriculum from doctors to health workers should be reorganized as scientific, proper and as per our community need**, not for big pharmas and corporate profit. From doctor to health workers they are to be deployed rotationally in the villages and among the community in their courses.

(10) **Scientific and indigenous researches are to be encouraged and strengthened** along with revamping of STM, IPGMER, IDBGH, Pasteur Institute, IHFW, IPH, Medical Colleges etc.

23.01.2025

- ভারতে ওষুধে ভেজাল মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে। ডিসেম্বর ২০২৪ ও জানুয়ারি ২০২৫-এ 'সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যাণ্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (সিডিএসসিও) বাজার থেকে ওষুধের বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে ১১টি রাজ্যের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে। তাতে কিছু বড় ওষুধ কোম্পানির ও পশ্চিমবঙ্গের ওষুধ সংস্থার ১৪৪ রকম ওষুধ গুণমান পেরোতে পারেনি।
- ২০২৪-'২৫ বর্ষে ইণ্ডিয়ান সুপার লিগ ও শিল্ড দুটিই জয়লাভ করল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট।
- অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ওয়েল বিয়িং রিসার্চ সেন্টার, গ্যাল আপ ও রাষ্ট্রপুঞ্জের সাসটেনবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশন নেটওয়ার্ক প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইনডেক্স ২০২৫এ পরপর আটবার ফিনল্যাণ্ড প্রথম হল। প্রথম দশ : (১) ফিনল্যাণ্ড, (২) ডেনমার্ক, (৩) আইসল্যাণ্ড, (৪) সুইডেন, (৫) দ্য নেদারল্যাণ্ডস, (৬) কোস্টারিকা, (৭) নরওয়ে, (৮) ইজরায়েল, (৯) ল্যাক্সমবার্গ, (১০) মেক্সিকো। অন্যদের মধ্যে কানাডা (১৮), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (২৩), জার্মানি (২২), ব্রিটেন (২৪), ফ্রান্স (৩৩), চিন (৬৮), রাশিয়া (৭২), পাকিস্তান (১০৯), ইউক্রেন (১১১), ভারত (১১৮)।
- গুইঝাও প্রদেশের বেইপান নদীর গিরিখাতের উপর বিশ্বের উচ্চতম ৬২৫ মিটার উঁচু এবং ২৮৯০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করল চিন।
- ২৭ মে '২৫ এ ৩১ বার এভারেস্ট শীর্ষে উঠে নিজেই নিজের রেকর্ড ভাঙ্গলেন পর্ব্বতারোহীদের পথপ্রদর্শক নেপালের শেরপা কামি রিটা।